ইসলামী শিক্ষা ও বিধান

[প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে দ্বীনিয়াত ও নামাযের
নিয়ম সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ ইসলাম পরিচিতি গ্রন্থ]

এস. এম. আখতার হোসেন এম. এ.
আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
হজ্জ কমিটি প্রকাশিত হজ্জ সংবাদ ইত্যাদি বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

॥ বাণীপ্রকাশ ॥
এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭

প্রকাশিকা :
সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তাফা
নারকেলডাঙ্গা গভঃ হাউসিং এস্টেট
কলিকাতা-৭০০০১১

প্রকাশন স্বত্ব : সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তাফা
প্রথম প্রকাশ—ডিসেম্বর ১৯৬১

মুদ্রক :
গৌর মান্না
করুণাময়ী প্রেস
৯/৭বি, প্যারীমোহন স্থর লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

আমার শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে
আজও যাদের ত্যাগ ও স্মৃতি
প্রতি মুহূর্তে প্রতি অনুভবে আমার
হৃদয় মনে ভরে আছে সেই
জান্নাতবাসী আব্বা ও আম্মাকে

উপহার

কে

নিদর্শন স্বরূপ

ইসলামী শিক্ষা ও বিধান

উপহার দিলাম—

॥ লেখকের কথা ॥

করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার অসীম অনুগ্রহে 'ইসলামী শিক্ষা ও বিধান' বইখানি লেখা শেষ করতে পেরে আমি ধন্য। এই বইটিতে মানবজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় ইসলামী বিধান আলোচিত হয়েছে।

'ইসলামী শিক্ষা ও বিধান' স্কুল মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মূল্যবান, যথোপযুক্ত ও অপরিহার্য গ্রন্থ। কিন্তু তার চেয়েও বড় পরিচয় হলো গ্রন্থটি সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়, বিদ্যালয়-উত্তীর্ণ যুবক-যুবতী ও অমুসলমান অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণকে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হতে ও ইসলাম ধর্মের বিধি বিধানকে জানতে সাহায্য করবে। এটি সঠিক ইসলামী তথ্য নির্ভর আদর্শ বাংলা পুস্তক। এতে ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ থেকে আল্লাহ্, রসুল, ফেরেশতা, বেহেশত, দোযখ, চার ইমাম, ইসলামী শরীয়ত, ফেকাহ্, হাদিস ও হানাফি মতবাদ অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্মাচরণ পদ্ধতির মাসলা-মাসায়েল ইত্যাদি সহ নৈতিক জীবনবোধের যাবতীয় নীতি ও নিয়ম 'প্রশ্নোত্তর শিক্ষা পদ্ধতি'র মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রন্থে সমস্ত রকম অনুকরণ ও অনুসরণ পরিহার করে ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থ পবিত্র কোরআন, হাদীস, ফেকাহ্ শাস্ত্র ইত্যাদি থেকে সরাসরি উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। যে সকল অনুকরণধর্মী দ্বীনিয়াত বই এদেশে বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে সে বইগুলির কোনটাই ইসলাম ধর্মকে জানার ও তার নীতি নিয়ম শেখার জন্য যথেষ্ট নয়। দীর্ঘদিন এ নিয়ে অনুশীলন, অনুসন্ধান ও চিন্তাভাবনার পরে এমন একটি শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছি।

ইসলামী জীবনবিধানে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ব্যবহারিক নীতি ও পথ সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত। প্রচলিত বেদাআত ধ্যানধারণার জালে আড়াল হয়ে যাওয়া ইসলামের শুচিসুন্দর জীবনব্যবস্থার প্রকৃত পরিচয় এবং দৈনন্দিন জীবনে তা প্রতিফলনের পদ্ধতি এ বই থেকে জানা প্রত্যেকের জন্যই সহজ হবে। সুনিশ্চিতভাবে এটি সর্বস্তরের মানুষের কাছে ইসলামকে জানার একটি আদর্শ ও নির্ভরযোগ্য বই।

বইটিতে আমি কিছু অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছি। যেমন আমাদের কাছে নামায শব্দটি পরিচিত। এটি আসলে ফার্সী শব্দ। কোরআন শরীফের ভাষা হলো সালাত। সালাত অর্থ বিশেষ পদ্ধতির আরাধনা, যা আল্লাহ্র

নির্দেশে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) মুসলমান জাতির জন্য প্রচলন করেছেন। যেহেতু আমাদের দেশে সাধারণ মুসলমানগণ সালাত শব্দের সঙ্গে পরিচিত নন সেজন্য সালাত ও নামায দুটি শব্দই এই বইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। বহু আরবী শব্দের বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে মূল আরবী উচ্চারণের সঙ্গে সমতা রেখেই বাংলায় তা লেখা হয়েছে। যেমন 'মোহাম্মাদ' (সাঃ) 'কোরআন' প্রভৃতি বানানগুলি আমাদের দেশে নানানভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে—যেমন 'মুহাম্মদ', 'মহম্মদ' 'কুরআন', 'কোরাণ' ইত্যাদি। মূল আরবী উচ্চারণের সঙ্গে এদের কোন সাদৃশ্য নেই। গ্রীক এবং ইংরেজী ভাষার অনুকরণে এই সকল বিকৃতিগুলি বাংলা ভাষায় চলে আসছে। তাই মূল আরবী উচ্চারণের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বানান অনুসরণ করতে গিয়ে বহুক্ষেত্রে উ-কার ঊ-কার ইত্যাদির গণ্ডগোল হয়ে গেছে। ছাপাখানাগুলি এই সকল আরবী উচ্চারণের সঙ্গে পরিচিত না থাকায় বহু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিও থেকে গেছে। মুদ্রণ ত্রুটিও কোথাও কোথাও পীড়াদায়ক ভাবেও থেকে গিয়েছে। এগুলিও পরবর্তী সংস্করণে দায়িত্ব সহকারে সংশোধিত হবে।

আরবী বর্ণের উচ্চারণগুলিকে বাংলা বর্ণদ্বারা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ আরবী বর্ণ উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী সঠিকভাবে উচ্চারিত হয়। উচ্চারণের পার্থক্যের জন্য সেখানে অর্থের পার্থক্যও ঘটে। এক্ষেত্রে পাঠকগণের আরবী ভাষার সঙ্গে পরিচিত কোন ব্যক্তির সহায়তায় উচ্চারণ ঠিক করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই গ্রন্থে আরবী বর্ণের উচ্চারণের ভিন্নতা নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলা বর্ণের সমোচ্চারিত পৃথক পৃথক বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রমও থেকে গিয়েছে।

এ গ্রন্থ মুদ্রণে সর্বাধিক সহযোগিতা করেছেন আমার স্ত্রী সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তাফা। প্রুফ সংশোধন ও পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশ নতুনভাবে উপস্থাপনা সম্ভব হয়েছে তাঁর সহায়তাতেই।

সবশেষে বইটি সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষক বন্ধুর উপদেশ যত্ন সহকারে গৃহীত হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ বিষয় যে কোন উপদেশ ও নির্দেশ সাদরে গৃহীত হবে।

বিনীত—

আখতার হোসেন

১২.১২.৬০

নারকেলডাঙ্গা গভঃ হাউসিং এস্টেট
ব্লক কে, ফ্ল্যাট— ৭
৪৯ নং নারকেল ডাঙ্গা নর্থ রোড
কলকাতা—৭০০০১১

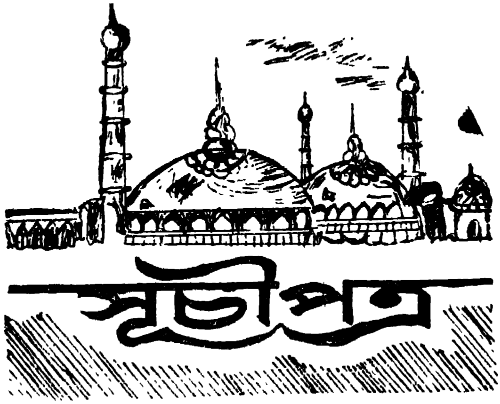
দ্বিনীয়াত ও নামাযের নিয়ম সম্বলিত

ইসলামী শিক্ষা ও বিধান

আলহাজ এস.এম. আখতার হোসেন এম.এ.



বাণী প্রকাশ
এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলি-৭



প্রথম বিভাগ

ইসলাম ধর্মের পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম ধর্মের স্বরূপ

দ্বিতীয় বিভাগ

ইসলামের ধর্মাচরণ বিধি

প্রথম অধ্যায়

তাহারাত বা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা

তৃতীয় অধ্যায়

সালাতুল জামাআত বা সমবেত নামায

চতুর্থ অধ্যায়

কতিপয় সামাজিক কাজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ

ইসলামী শিক্ষা ও বিধান

[দ্বীনিয়াত ও নামাযের নিয়মকানুন সম্বলিত]

প্রথম বিভাগ

ইসলাম ধর্মের পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম ধর্মের স্বরূপ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম ধর্ম

ইসলাম ধর্ম কি ?

ইসলাম একটি আরবী শব্দ। ইসলাম অর্থ সমর্পণ, শান্তি। এক আল্লাহ্‌র নিকট নিজেকে সমর্পণ করা, এক আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত থাকার বিধানকে একাগ্রতার সঙ্গে মেনে চলার জন্য আত্মোৎসর্গ করে আত্মসমর্পণ করাই হলো ধর্মীয় অর্থে ইসলাম। ইসলাম ধর্মের বিধানে আল্লাহ্‌ এক ও অদ্বিতীয় তিনি কারও দ্বারা সৃষ্ট নন, কোন কিছু থেকে সৃষ্ট নন, তিনি নশ্বর নন, অবিনশ্বর। ইসলাম ধর্মে নিরাকার এক আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর শেষ পয়গম্বর, কোরআন বিশ্ব-মানবের জন্য শেষ ঐশী গ্রন্থ। ইসলাম সত্য ধর্ম। পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) ও প্রথম মানবী হযরত হাওয়া। হযরত আদম

(আঃ) শুধুমাত্র প্রথম মানব নন, তিনি ইসলাম ধর্মের প্রথম নবীও। তিনিই পৃথিবীতে প্রথম নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করেন। তিনিই পৃথিবীর বুকে প্রথম আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব করেন ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করেন যে এক আল্লাহ্ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা আর মানুষ তাঁর সৃষ্ট জীব। আল্লাহ্‌ই তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি কৌশলে সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্বজগৎ, আকাশ, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদী সমুদ্র সহ সমগ্র প্রকৃতি জগৎ ও প্রাণীজগৎ। এক কথায় তিনি বিশ্বস্রষ্টা। সেই বিশ্বস্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণই হলো ইসলাম। পৃথিবীর প্রথম মানব আল্লাহ্‌র সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব 'আদম' (আঃ) নিজেকে স্রষ্টার কাছে সমর্পণ করে পৃথিবীর বুকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করলেন 'ইসলাম' বা আত্মসমর্পণের ধর্ম। এরপর যুগে যুগে বহু নবী ও রসূল এসেছেন পৃথিবীর মানুষকে সৎপথ দেখাতে। তাঁরাও এক আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করার অমিয়বাণী প্রচার করে গেছেন। বিভিন্ন ভাবে তাঁরা আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইসলাম ধর্মকে সংস্কার ও সুদৃঢ় করে গেছেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এই ইসলাম ধর্মেরই একজন পয়গম্বর। তিনিই ইসলাম ধর্মের শেষ পয়গম্বর। তিনি ইসলাম ধর্মের শেষ সংস্কার করে যে নীতি বিশ্বমানবের জন্য নির্দিষ্ট করে গেছেন তা পৃথিবীর মহাপ্রলয় পর্যন্ত অপরিবর্তনীয়। তাঁর কাছেই বিশ্ববাসীর জন্য শেষ ঐশীগ্রন্থ কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যে ভাবে ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ সংস্কার করে গেছেন তার মূল মন্ত্র হলো—"আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল (প্রেরিত পুরুষ)।" এই ধর্মের মূল শিক্ষা হলো কোরআনকে আল্লাহ্‌র শেষ বাণী বলে স্বীকার করে তা পালন করা, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বাণী হাদিসকে মান্য করা, ঝগড়া, বিবাদ, বিচ্ছেদ, অত্যাচার, অনাচার, শোষণ, পীড়ন না করে মানুষকে ভালবাসা। প্রেম, প্রীতি, সৌহার্দ্য শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা। মৃত্যুর পর পরকালকে বিশ্বাস করা ; যাবতীয় পাপ, অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখে এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা আল্লাহ্‌র নিকট নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করা। পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা ও পৃথিবীতে ভাল ও

সৎ কাজ করা সাধারণভাবে এগুলিই হলো ইসলাম ধর্মের মূল কথা। ইসলাম ধর্ম পাঁচটি বিশেষ স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা—১. কালেমা, বা বাক্য ২. সালাত বা নামায, ৩. যাকাত, ৪. সিয়াম বা রোজা এবং ৫. হজ্জ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঈমান বা বিশ্বাস

ঈমান বা বিশ্বাস কি?

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। প্রত্যেক মুসলমানকে কতকগুলি বিষয় বিশ্বাস করতে হয়। যেমন, (১) আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস, (২) রসূলের উপর বিশ্বাস, (৩) আখেরাত বা পরকালের উপর বিশ্বাস। (৪) মালায়েকাত বা ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস, (৫) আল্লাহ্‌র বাণীর (ঐশীগ্রন্থের) উপর বিশ্বাস, (৬) কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের উপর বিশ্বাস, (৭) তকদির বা ভাগ্যের উপর বিশ্বাস অর্থাৎ ভাল-মন্দ সবকিছুই একমাত্র আল্লাহ্‌র নির্দেশে ঘটে বলে বিশ্বাস করা। (৮) মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও শেষ বিচারের দিনের উপর বিশ্বাস করা।

এই সকল বিষয়গুলির উপর সুদৃঢ় বিশ্বাসই মুসলমানকে এক পরিপূর্ণ, সুস্থ ও চিরসুন্দর জীবন দান করে, জীবন সম্পর্কে মানুষের সঠিক ও সুন্দর ধারণা জন্মায়। এই অর্থে ঈমান বা বিশ্বাসকে বলা যায় জীবন সম্পর্কে জ্ঞান। কোন বিষয়ে কেবলমাত্র জ্ঞানার্জনই যথেষ্ট নয়—তাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে হয়। এই বিশ্বাসগুলির সূত্রাকার রূপই হলো 'কালেমা'।

আল্লাহ্‌র উপর ঈমান (বিশ্বাস) কি?

আমাদের সামনে রয়েছে বিশাল বিশ্ব আর কতশত জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ,

গাছপালা, জলস্থল, পাহাড়-পর্বত, গ্রহ-নক্ষত্র, সূর্য-চন্দ্র। আর সেগুলি সুদূর অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে চলেছে একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম মেনে। দিন-রাত্রি, জোয়ার-ভাঁটা, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, বৃষ্টি, প্রকৃতি জগতে সৃষ্টি-ধ্বংস সবই নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে চলেছে। আমরা জানি গাড়ি-বাড়ি, অফিস-আদালত, প্রাসাদ সবকিছুরই একজন স্রষ্টা আছে। সবকিছুই কেউ না কেউ তৈরী করে ও পরিচালনা করে। তাহলে এই বিরাট বিশ্বের স্রষ্টা কে? কেই-বা তার পরিচালক, কেই-বা তার মালিক! এসব কি আপনা-আপনি হচ্ছে, আপনা-আপনি পরিচালিত হচ্ছে? না, এগুলিরও একজন স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক আছেন। তিনিই হচ্ছেন এক আল্লাহ্। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি—তিনি সৃষ্ট জীবের মত নন। তাঁর কোন জন্মদাতা নেই। তিনিও কাউকে জন্ম দেন না। তিনি সৃষ্টি করেন। আমরা তাঁরই অনুগ্রহে বেঁচে আছি। তিনিই আমাদের আহার্য দেন। যা-কিছু ঘটেছে, ঘটছে ও ঘটবে সবই তিনি জানেন। এ কথাগুলি স্বীকার করা, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, এক আল্লাহ্কে প্রভু ও স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করা, তাঁর নির্দেশিত পথে চলা, সেইমত কাজ করা হলো ঈমান বা বিশ্বাস। ঈমানের পথে চলতে হলে অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে হবে যে মানুষের জীবনে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনই একমাত্র সত্য। মনুষ্যসৃষ্ট কোন আইনের সামনে মাথা নত করা চলবে না।

কোন সমস্যা সমাধানের জন্য বা কোন কিছু প্রাপ্তির জন্য কোন শক্তি বা ব্যক্তির দ্বারস্থ হওয়া মানুষের জন্য ঘোরতর অন্যায়। আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে শক্তি বলে মানা বা আল্লাহ্‌র শক্তির সঙ্গে কাউকে ভাবা বা অংশীদার করাই হলো 'শেরেক'। 'শেরেক' করা সবচেয়ে বড় পাপ। দেব-দেবী, সূর্য-চন্দ্র, সমুদ্র-পর্বত, গাছ-পালা কোনকিছুই কোন শক্তি নয়। সবই নশ্বর, ভঙ্গুর। তাই জীবনপথে মানুষকে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত সরল পথ বেছে নিয়ে—আল্লাহ্কে এক ও সর্বশক্তিমান বলে দৃঢ় বিশ্বাস করাই প্রকৃতপক্ষে ঈমান।

রসূলের উপর ঈমান আনা বলতে কী বোঝায়?

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে হাজারো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। সঠিক কিংবা বেঠিক বেছে নেওয়া তখন বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। পার্থিব ব্যাপারে সকলের সমান জ্ঞান নেই। পৃথিবীর সমস্যা সমাধানের

পথ মানুষ দেখাতে পারে না। সেগুলির সুষ্ঠু সমাধানের পথ দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। তাই আল্লাহ্ যুগে যুগে কিছু মানুষকে বিশ্বজগতের সকল রহস্য জানিয়ে মানুষের মাঝেই পাঠিয়েছেন। বিশ্বজগতের সকল রহস্য, সমস্যা সমাধানের পথ সবই আমাদের জেনে নিতে হবে ঐ সকল প্রেরিত পুরুষদের কাছ থেকে। পৃথিবীবাসীর জন্য শেষ যিনি আল্লাহ্‌র বাণী বয়ে এনেছেন, মানুষকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য সুমহান দায়িত্ব নিয়ে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন তিনি হলেন শেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)। মুসলমানগণ সকলেই তাঁর উম্মত বা অনুসারী শুধু তাঁর উপর বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট নয় বরং নিজের জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁকে নেতা ও উপদেশক বলে বাস্তবায়িত করা উচিত। রসূলের শিক্ষার উপর দৃঢ়তা সহকারে বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চলতে হবে। তাঁকে শেষ ও শ্রেষ্ঠ রসুল বলে বিশ্বাস করতে হবে। তিনি মানবের সর্বশেষ মুক্তিদাতা, মানবতার মুক্তিদাতা। আল্লাহ্‌র বাণী কোরআন তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বিশ্বাস করতে হবে। তিনি কখনও মিথ্যা বলেননি, তিনি নিষ্পাপ। জীবনে তিনিই একমাত্র আদর্শ। তাঁর অনুসৃত পথই পালনীয় বলে বিশ্বাস করা হলো রসুলের উপর ঈমান আনা।

আখেরাত বা পরকালের উপর ঈমান বা বিশ্বাস বলতে কী বোঝায়?

পৃথিবীতে মানবজীবনের সমাপ্তিই শেষ কথা নয় তারপর আরও একটি জীবনের সম্মুখীন হতে হবে। সে জীবন পার্থিব জীবনের ক্রিয়াকলাপের পরিণতি স্বরূপ প্রাপ্ত হবে। মানুষ পৃথিবীতে ভাল বা মন্দ যা করে তার ফল বা পরিণতি পৃথিবীর জীবনেই সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রত্যেকটি কাজের জন্য মৃত্যুর পর পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। ইহজগতে ভাল কাজ করলে পরকালে ভাল পুরস্কার পাওয়া যায় এবং এই জগতে পাপ ও অন্যায় কাজ করলে পরকালে সেজন্য কঠিন শাস্তি পেতে হয়। অর্থাৎ ভাল কাজের বিনিময়ে আল্লাহ্ মানুষকে দান করেন জান্নাত বা স্বর্গ; আর মন্দ কাজের জন্য দেবেন জাহান্নাম বা নরকের কঠিন শাস্তি। এইগুলির উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা

প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। এই বিশ্বাসকেই বলে আখেরাতে বিশ্বাস রাখা বা ঈমান আনা। মানুষের মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করে পার্থিব কাজকর্মের নিরিখে তার বিচার হবে—এই সত্যের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসই আখেরাতের উপর বিশ্বাস।

ঐশী গ্রন্থ বা আসমানী কেতাব সমূহের উপর বিশ্বাস বলতে কী বোঝায়?

বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্ পৃথিবীর মানুষের জীবনযাত্রার বিধান নির্ধারিত করার জন্য তাঁর রসূলগণের নিকট ওহী (প্রত্যাদেশ) পাঠিয়েছেন। সেই ওহী বা প্রত্যাদেশ যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেই গ্রন্থকেই বলে ঐশীগ্রন্থ বা আসমানী কেতাব। যেমন হযরত মূসা (মোজেস। আঃ-এর কাছে আল্লাহ্ যে সকল ওহী (বাণী) পাঠিয়েছেন তা হলো 'তাওরাত' গ্রন্থ। হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে 'জাবুর', হযরত ঈসা (যীশু) আঃ-এর কাছে 'ইনযিল' নামক ঐশীগ্রন্থ বা আসমানী কেতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। সর্বশেষ আসমানী কেতাব আল-কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কাছে। পৃথিবীর ধ্বংসের সময় পর্যন্ত মানুষের জীবনযাত্রার, মানুষের পার্থিব সমাজ গঠনের নিয়ম নির্দেশ কোরআনে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ নিয়ম আল্লাহ্ নির্ধারণ করেছেন। এই নিয়ম-নীতি অলঙ্ঘনীয়—তা মানবসৃষ্ট নয়। কোরআনের নীতিকে সমাজ জীবন ও ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেনে চলা ও কোরআনকে পরিপূর্ণ ও নিঃসন্দেহভাবে বিশ্বাস করাই হলো কোরআনের উপর ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা।

মালায়েকাত বা ফেরেশতার উপর ঈমান আনা বলতে কী বোঝায়?

মালায়েকাত আল্লাহ্‌র এক বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধকে অমোঘ জেনে তা পালন করে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর যাবতীয় নির্দেশ বাণী আকারে ফেরেশতাদের দ্বারা নবীদের নিকট পাঠিয়েছেন। যে ফেরেশতা আল্লাহ্‌র বাণী বয়ে আনেন তাঁর নাম জিব্রাইল (আঃ)। এছাড়া অসংখ্য ফেরেশতা আছেন যাঁরা আল্লাহ্‌র আদেশে বিভিন্ন কাজ করে থাকেন।

আল্লাহ্‌র এই সকল ফেরেশতা ও ফেরেশতাদের কার্যকলাপের উপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা।

কেয়ামতের উপর ঈমান আনা বলতে কী বোঝায় ?

আল্লাহ্‌র নির্দেশে এক সময় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তার মধ্যকার যাবতীয় জীবজন্তু ও পদার্থ ধ্বংস হবে। কেয়ামতকে মহাপ্রলয় ও শেষ বিচারের দিনও বলা হয়। এই ধ্বংস, মহাপ্রলয় ও শেষ বিচারে বিশ্বাস করাই হলো কেয়ামতের উপর ঈমান আনা।

তকদিরের উপর ঈমান আনা বলতে কী বোঝায় ?

মানুষের জীবনে ভালমন্দ, শুভ-অশুভ, ধনসম্পদ, মান-ইজ্জত যেভাবে যা ঘটে তাই তার জন্য আল্লাহ্‌র বিধান। এ বিধান অনুযায়ী জীবন মৃত্যুও সংঘটিত হয়। এগুলিতে কোন সৃষ্ট জীবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হাত নেই। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো তকদিরের উপর ঈমান আনা।

পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস বা ঈমান কাকে বলে ?

মানুষের মৃত্যুর পর তার পাপপুণ্যের বিচারের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এজন্য আল্লাহ্‌ মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন বলে বিশ্বাস করা হলো পুনরুত্থানে বিশ্বাস করা বা ঈমান আনা।

এককথায় আল্লাহ্‌র একত্ব, অস্তিত্ব, গুণাবলী এবং তাঁর রসূল, ফেরেশতা, ঐশীগ্রন্থ, তকদির, কেয়ামত ও পুনরুত্থান অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা হলো ঈমান। আর আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসূলের আদেশ নিষেধ পালন করা হলো ঈমানদারি। বাধ্য হয়ে নয় বরং নিজের ইচ্ছায় আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে নবীর শিক্ষা বেছে নিয়ে, জেনে বুঝে নিজেকেই এই ঈমানের ঘোষণা করতে হয়। ঈমান দু-প্রকার। যথা :

১। ঈমানে মোযমাল বা সাধারণ বিশ্বাস

آمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِهٖ

আমানতো বিল্লাহে কামা হোয়া বে আসমায়েহী ও ছেফাতেহী অ কা'বেলতো জামীআ আহকামেহী।

বাংলায়ঃ আমি আল্লাহ্‌র উপর এবং যেভাবে তিনি নাম ও গুণ-বিশিষ্ট তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তার সমূহ নির্দেশকে মঞ্জুর (কবুল) করলাম।

২। ঈমানে মোফাসসাল বা বিশেষ বিশ্বাস্

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ۝

আমানতো বিল্লাহে ওয়া মালায়েকাতেহী ওয়া কোতোবেহী ওয়া রোসোলেহী ওয়াল ইয়াওমিল আখেরে ওয়াল কাদরে খায়রেহী, অ শাররেহী মেনাল্লাহে তাআলা অয়াল বাআসে বাআদাল মাউতে।

বাংলায়ঃ আমি আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রসূলগণ, তাঁর শেষ বিচারের দিন (কেয়ামত), আল্লাহ্ কর্তৃক ভাগ্যের ভালমন্দের পূর্বনির্ধারণ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ

ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ বা ভিত্তি কি?

পৃথিবীর সব কিছুই কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়মের উপর নির্ভরশীল। এই সকল নিয়ম আবার কতকগুলি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল নীতির স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন বিশেষ ভিত্তির। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

না হলে কোন নীতিই দীর্ঘস্থায়ী, সঠিক ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। পৃথিবীতে প্রথম মানব আদম (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় থেকে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র উপাসনা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ প্রতিটি কাজের জন্য একটি নীতি নির্দ্ধারিত হয়েছে এবং তা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলাম ধর্মের সবশেষ সংস্কারক হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) পাঁচটি সুনির্দ্দিষ্ট ভিত্তির উপর ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "ইসলাম ধর্ম পাঁচটি মূল স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা—

(১) ঈমান ও 'কালেমা—অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য দেবতা নেই। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল (দূত) এটি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা ও মুখে উচ্চারণ করা।

(২) 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' অর্থাৎ দিনে রাতে মিলিয়ে পাঁচবার সালাত (নামায) আদায় করা এবং জুমআ ও দুই ঈদের সালাত প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) 'যাকাত' প্রদান করা অর্থাৎ জীবন ধারণের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ও সম্পদের জন্য নির্দিষ্ট হারে কর দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দেওয়া।

(৪) 'সিয়াম' পালন করা অর্থাৎ রমজান মাসের সিয়াম বা রোজা পালন করা।

(৫) 'হজ্জ' আদায় করা: আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন ও ধনশালীদের জীবদ্দশায় একবার কাআবা ঘরে গিয়ে শরীয়তের নিয়মানুসারে হজ্জ করা।

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ

কালেমা বা বাক্য

আমরা জানি যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হলে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস ও সেইমত পালন করে মুসলমান হতে হয়। ইসলাম ধর্ম যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তার প্রথম স্তম্ভ হলো 'কালেমা'। এই

কালেমার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কত হাজার হাজার মনীষী, বীর মুসলমান প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। যে এই কালেমায় বিশ্বাস করে সে মুসলমান, আর যে বিশ্বাস করে না সে কাফের বা অবিশ্বাসী। এ কালেমায় যে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে যে বিশ্বাস করে না তার কোন মিল থাকতে পারে না। তাদের কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা সবই পৃথক হয়ে যায়। তাই কাফের আর মুসলমানের জীবনযাত্রা ভিন্ন ধরনের। কিন্তু কোন কাফের বা অবিশ্বাসীর সঙ্গে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণের বিধান ইসলামে নেই। ইসলাম ধর্মের বিধানে--যে যার ধর্ম তার জন্য। তবে যারা ইসলামে বিশ্বাসী নয় তারা বিপথগামী। ইসলামে বিপথগামীর অনুকরণ নিষিদ্ধ। এ কালেমাকে বিশ্বাস করলেই হবে না একে বুঝতে হবে। শরীয়তবিদগণ কালেমাকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন যথা-- (১) কালেমা তাইয়্যেবা (২) কালেমা শাহাদাৎ (৩) কালেমা তাওহীদ (৪) কালেমা তামজীদ ও (৫) কালেমা রাদ্দেকুফর।

১। কালেমা তাইয়্যেবা বা পবিত্র বাক্য

কালেমা তাইয়্যেবা কাকে বলা হয়?

কালেমা তাইয়্যেবা হল :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌।

বাংলায় : আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহা বা উপাস্য নেই। মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর প্রেরিত পুরুষ বা রসুল।

এই কালেমা মুখে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে এবং এর মূল আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে। আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গেই কোরআন প্রদর্শিত পথে চলতে হবে, রসুলের পথের অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ্‌ ছাড়া কাউকে

ভয় পেলে চলবে না। আল্লাহ্‌র পথে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই শুধু মুখে কালেমা পড়লে চলবে না, আল্লাহ্‌ ও রসুলের আইনও মেনে চলতে হবে। তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো' কথাটির তাৎপর্য কি?

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো' অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহা বা উপাস্য নেই কথাটির তাৎপর্য হলো: এই বিশ্ব এবং বিশ্বমানবের একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ্‌। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌। এই বিশ্ব ও বিশ্ববাসী মানবের সঠিক পরিচালনার আইন একমাত্র আল্লাহ্‌ই নির্ধারণ করতে পারেন। আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান। এ বিশ্বের সকল প্রাণীর অন্নদাতা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্‌। সংকটকালে একমাত্র আল্লাহ্‌ই মানুষের আবেদন ও প্রার্থনা শ্রবণ করেন। আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউই মানুষকে বিপদমুক্ত করতে পারে না। আল্লাহ্‌ অসীম ক্ষমতা দিয়ে সামান্য 'হও' শব্দ দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আবার 'ফাইয়াকুন' শব্দ দ্বারা সবকিছু ধ্বংস করে দেবেন। এক কথায় এর তাৎপর্য হল—

"আমরা আল্লাহ্‌কেই একমাত্র স্রষ্টা বলে জানব, একমাত্র তাঁকেই ভয় করে তাঁর কাছে সেজদাবনত হব, আর কারও বান্দা হব না, আল্লাহ্‌র আইন মানব এবং এক আল্লাহ্‌রই আরাধনা ও উপাসনা করব।"

'মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌'র তাৎপর্য কি?

আল্লাহ্‌ তাঁর যাবতীয় নিয়মকানুন আদেশ নিষেধ সবই হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দ্বারা আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্‌ তাঁর বাণী কোরআন-কে তাঁরই কাছে আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) অশেষ দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করেও আল্লাহ্‌র বিধান সমূহকে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যে নিয়ম ও নীতি আমাদের জানিয়েছেন তা পালন করতে হবে। তার বিপরীত সব কিছুকেই অস্বীকার ও ত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের নীতি ও নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠিত না থাকলে তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্‌

ও রসূলের বিধান ও আদর্শ মেনে চলার জন্য কোন শক্তি বা ব্যক্তিকে ভয় পেলে চলবে না।

২। কালেমা শাহাদাৎ বা সাক্ষ্য বাক্য

কালেমা শাহাদাৎ কি ?

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

محمدا عبده ورسوله *

আশহাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু অ-আশহাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদোহু অ-রাসুলাহু।

বাংলায় : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল।

৩। কালেমা তাওহীদ বা একত্ববাদ বাক্য

কালেমা তাওহীদ কি ?

কালেমা তাওহীদ হল :

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير

وهو على كل شيء قدير ۝

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকো অ লাহুল হামদো ইয়োহয়ী ওয়া ইয়োমিতো, অ হোওয়া হাইউন লা ইয়ামুতো বে ইয়াদেহীল খায়রো, ওয়া হোয়া আলা কুলে শাইয়ীন ক্বাদীর।

বাংলায়ঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহা (উপাস্য) নেই, তিনি এক ও তাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই। তিনি সমগ্র বিশ্বের মালিক। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরজীবী, অমর। তাঁর হাতেই মঙ্গল আর তিনি সর্বকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

৪। কালেমা তামজীদ বা গুণান্বিত বাক্য

কালেমা তামজিদ কি?

কালেমা তামজিদ হলো—

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ○

সোবহানাল্লাহে ওয়াল হামদো লিল্লাহে ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো আল্লাহো আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কু'য়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়ীল আযীম।

বাংলায়ঃ আল্লাহ্ পবিত্র এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। আল্লাহ্ মহান। মহীয়ান, গরীয়ান আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কারো কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই।

৫। কালেমা রাদ্দেকুফর

কালেমা রাদ্দেকুফর কাকে বলে?

এছাড়া আরও একটি কালেমা বা বাক্যের উল্লেখ আছে যাকে রাদ্দেকুফর বলে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّنُؤْمِنُ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ مَا اَعْلَمُ وَمَا لَااَعْلَمُ بِهٖ وَاَتُوْبُ وَاٰمَنْتُ وَاَقُوْلُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ *

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজোবেকা মিন আন ওশরেকা বেকা শাইয়্যাওঁ ওয়ানুমেনো বিহি ওয়াসতাগফেরোকা মা আ'লামো বিহি অমা লাম আ'লামো বিহি ওয়াতুবো, ওয়া আমানতো ওয়া আকুলো আঁন-লা এলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাতুর রাসুলুল্লাহ।

বাংলায় : হে আল্লাহ্! অবশ্যই আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, যেন কাউকে তোমার শরীক গণ্য না করি আমার অজানা সকল বিষয় ঈমান (বিশ্বাস) আনছি। আমার জানা অজানা সমূহ পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং অনুতপ্ত হচ্ছি। আর আমি তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করছি। আরও বলছি আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহা (উপাস্য প্রভু) নেই। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত দূত।

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ

সালাত বা নামায

'সালাত' বলতে কী বোঝায়?

আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ এবং অনুক্ষণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করাই হলো ইসলামের মূল আদর্শ। যে বিশ্বাস করে আল্লাহ্ আছেন, তিনি প্রতিমুহূর্ত

আমাদের লক্ষ্য করছেন আমাদের অন্তরের গোপন কথাটিও জানতে পারছেন সেই মুসলমান। একজন মুসলমান এইভাবেই আল্লাহ্‌কে স্মরণ রেখে তাঁর নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করে।

এ পৃথিবীতে প্রলোভনের হাজারো উপকরণ রয়েছে। তারা সব সময় মানুষকে সেদিকে আকর্ষণ করছে। এই প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়ে হাজারো কাজের মাঝে আল্লাহ্‌কে মনে করতে হবে। আল্লাহ্‌র নির্দেশমত চলতে হবে। মুসলমানরা যাতে এই সঠিক পথে চলতে পারে সেজন্য আল্লাহ্ মুসলমানদের জন্য কয়েকটি ফরজ (অবশ্যপালনীয়) কাজ নির্ধারণ করেছেন। সেগুলি হলো কালেমা, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত। প্রত্যেক মুসলমানকে বিশ্বাস করতে হয়—"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।" অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহা (উপাস্য) নেই হযরত মোহাম্মাদ (সা:) আল্লাহ্‌র রসূল। বছরে একমাস রোযা রাখতে হয় ও যাকাত দিতে হয় এবং সারা জীবনে সামর্থ্য থাকলে একবার হজ্ব করতে হয়। আর সালাত আদায় করতে হয় দিনে পাঁচবার। এই পাঁচটি জিনিষ হলো ইসলামের ভিত্তি।

এই সবক'টি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য কাজগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী পালন করতে হয় সালাত। পাঁচবার সালাত পালন করার নিয়মের পিছনে জোরালো কারণ আছে। সারাদিন মানুষকে নানান পার্থিব কাজে মশগুল থাকতে হয় ফলে কারো পক্ষে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে।। তাই পাঁচবার সালাতের মধ্যে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্‌র প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে—যারা বিশ্বাস করে পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী, এ জীবনের শেষে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে—তাদের কাছে দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করাটা কোন কষ্টের কাজ নয়। আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন :

> 'তোমরা ধৈর্য এবং সালাতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও। এটি (সালাত) সত্যি একটি কঠিন কাজ। কিন্তু তাদের জন্য কঠিন নয়, যারা

মনে রেখেছে যে একদিন আল্লাহ্‌র সঙ্গে দেখা
হবে এবং তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

—সুরা বাকারাহঃ ৪৫-৪৬ আয়াত

আমাদের মনে রাখতে হবে সালাতের মধ্যে আমাদের নিজেদের মঙ্গল নিহিত। এর দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার কোন উপকার আমরা করিনা বরং আমরা নিজেদের উপকার করি। আল্লাহ্‌কে মনে রাখতে ও আল্লাহ্‌র আদেশমত চলতে সাহায্য করে সালাত।

'সালাত' প্রতিষ্ঠা করার আগে আমাদের বিশেষ পদ্ধতিতে পরিচ্ছন্ন হতে হয়। এর নাম ওজু। ওজু দ্বারা আমাদের মনও পবিত্র হয়। পার্থিব চিন্তাভাবনা ছেড়ে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়ানোর জন্য মন তৈরী হয়। সালাতে আমরা আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সাহায্য চাই। আল্লাহ্‌র পথে ক্ষমতা অর্জনের জন্য সাহায্য চাই। 'সালাত'-এর মধ্যে কোরআনের কিছু অংশ পাঠ করতে হয়। এর দ্বারা আমাদের বিশ্বাসের ভিত, অর্থাৎ ঈমান মজবুত হয়। আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান, মহান। পার্থিব জীবন শেষে তাঁর সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে। রুকু, সিজদার মধ্য দিয়ে বিনয়ের সঙ্গে সেকথা আমরা স্মরণ করি।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে আরবীতে কতকগুলি কথা বললে ও নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করলেই সালাত হয় না। সালাত তখনই পরিপূর্ণ হয় যখন মানুষ বিনয় ও নম্রতা নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সালাতের জন্য দাঁড়াতে পারে। সবসময় এরকম একাগ্র না হতে পারলেও সালাত আদায় করতে হবে।

সালাতের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সমতা জাগ্রত হয়। সালাত আদায়ের জন্য মুসলমানদের দিনে পাঁচবার মসজিদে জমায়েত হতে হয়। সালাতে ধনী, দরিদ্র, আমীর, ফকির সকল শ্রেণীর মানুষ এক সারিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়।

সালাত মানুষের মধ্যে বহু ভাল গুণ ও অভ্যাস তৈরী করে ঠিকই কিন্তু অর্থ বুঝে না পড়লে এই গুণগুলি তৈরী হতে পারে না ফলে সালাত শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হয়ে যায়। সালাতে আমরা আল্লাহ্‌র সামনে হাজির

হই এটি কখনই ভুললে চলবে না। সালাত শেষ করেই আমাদের আবার পার্থিব কাজে ডুবে যেতে হয়। সালাতের পর সে কাজ করতে গিয়ে আল্লাহ্ নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে হবে। কারণ সালাতে বলা হয়—হে আল্লাহ্। আমাদের তোমার পথে চালাও। এইভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে আল্লাহ্‌র কাছে যে আরজি আমরা পেশ করি সেই বাক্য অনুযায়ী জীবনে সব কাজ করতে পারলে তবেই সালাত সার্থক হবে।

সালাত সম্পর্কে আমাদের যে মূল কথাকটি মনে রাখতে হবে তা হলো :—

(১) সালাত একটি সাধনা বা আল্লাহ্‌র আরাধনা। তাই সুন্দরভাবে সালাত কায়েম করা উচিত।

(২) সালাতের মধ্যে যা কিছু পড়া হয় তার সঠিক অর্থ জানতে হবে।

(৩) আযান, একামত, ওজু, তায়াম্মুম, দোওয়া, কেবলা, কাবা—সালাতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত এই শব্দগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(৪) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ছাড়াও আছে বেতর, জুমআ, তারাবিহ্, ঈদ ইত্যাদি সালাত। এগুলি পড়ার নিয়ম শিখতে হবে।

(৫) সালাতকে জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে নিতে হবে।

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ

যাকাত

যাকাতের তাৎপর্য কি?

পৃথিবীতে মানুষকে প্রচুর কাজ করতে হয়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এসব কাজ করতে হয়। কিন্তু যে প্রকৃত মুসলমান সে সব কাজই আল্লাহ্‌র নির্দেশিত নিয়মে করে। সে সব কাজই এমন নিয়মে করে যাতে তার স্রষ্টা আল্লাহ্ খুশী হন।

মানুষকে পৃথিবীতে অর্থোপার্জন করতে হয়। কারণ অর্থ ছাড়া

পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু অর্থের লোভ এবং অর্থের জন্য অহংকার অত্যন্ত অন্যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই ধনী হয়ে উঠলে আরাম আয়েশের মধ্যে ভুলে যায় আল্লাহ্‌র সকল নির্দেশ। তাই অর্থোপার্জন, ব্যয় ও অর্থসঞ্চয়ের ব্যাপারে নির্দিষ্ট নিয়ম আল্লাহ্‌ মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। সেই নিয়মে সম্পদ সঞ্চয় করতে হয়।

প্রত্যেক সম্পদশালী মুসলমানকে তার সম্পদ থেকে নির্দিষ্টহারে কিছু অর্থ দরিদ্রের দিতে হয়। এরই নাম যাকাত। মনে রাখতে হবে যাকাত দান কিংবা ট্যাক্স কোনটাই নয়। এটি সেই কর্তব্য যা আল্লাহ্‌ পালন করতে বলেছেন। যাকাত ফরজ এবাদাতের একটি অঙ্গ।

এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌। পৃথিবীর সব কিছুর মালিক তাই একমাত্র আল্লাহ্‌। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি মাত্র। এই সত্য যে দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস করে সেই মুসলমান। তাই মুসলমানরা যা করে সবই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য। টাকা পয়সা অপ্রয়োজনীয় ও বাজে কাজে খরচ করা, অন্য লোকের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অর্থ ব্যয় করা, অর্থ-ক্ষমতা লাভ করে মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার করা, শোষণের জন্য অর্থকে ব্যবহার করা ইত্যাদি অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য নয়। মানুষের অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য হবে পবিত্র জীবন যাপন।

কিন্তু মুষ্টিমেয় মানুষ যখন অবাধ ভাবে অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ পায়, সমাজের সব অর্থ যখন কিছু লোকের কুক্ষিগত হয় তখন সেই মুষ্টিমেয় মানুষ আরাম-আয়েশের মধ্যে ভুলে যায় ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য—ভুলে যায় আল্লাহ্‌কে—তখনই সমাজে নেমে আসে জুলুম, অত্যাচার, অবিচার ও উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ।

তাই আল্লাহ্‌ এমন একটি ব্যবস্থার বিধান দিয়ে দিয়েছেন যাতে কোথাও কারও হাতে অন্যায়ভাবে অর্থ জমা থাকতে পারবেনা। তাই আল্লাহ্‌ 'যাকাত'-কে করেছেন ফরজ (অবশ্যকরণীয়)। যাকাতের মাধ্যমে ধনী লোকদের কিছু সম্পদ দরিদ্রদের হাতে চলে যায়। যাকাতের মধ্য দিয়ে অর্থ সমাজে বন্টিত হয়ে যায়। অর্থ মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অর্থ বাদ দিয়ে সমাজ গঠিত হয় না। ইসলাম শুচিসুন্দর সমাজ গঠনের

উৎসাহ দেয়। তাই ইসলাম অর্থের দিকটাকে সমান গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্য ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত অন্যতম ও সমান গুরুত্বপূর্ণ এবাদাত।

যাকাত আরবী শব্দ। অর্থ হলো পবিত্রতা। যাকাত অর্থের প্রতি লোভ লালসা থেকে মানুষের মনকে পবিত্র রাখে। হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহো ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের বাকি ধনদৌলতকে পবিত্র করার জন্যই আল্লাহ্ যাকাত ফরজ করেছেন।"

'যাকাত কথাটির অর্থই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে অর্থোপার্জন পবিত্র পথে করা দরকার। যাকাত দ্বারা সমাজে একটা শৃঙ্খলা আসে। সে শৃঙ্খলা অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা।

সালাত ও রোযার মত যাকাতের মূল লক্ষ্য আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সমর্পণ করা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান করা। কখনই মনে করা উচিত নয় যে যাকাত দিয়ে কাউকে অনুগ্রহ করা হলো। এরকম মনে করলে যাকাতের মূল লক্ষ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। যাকাত দেওয়া অনুগ্রহ করা নয়। যাকে যাকাত দেওয়া হয় তার পাওয়ার অধিকার আছে বলেই দেওয়া হয়। যাকাত যে পায় সেটা তার অধিকার এবং যে দেয় সেটা তার কর্তব্য। যাকাত দিতে পারার মধ্যে নিজের কোন মহত্ত্ব নেই—এটা কোন অহংকারের ব্যাপার নয়। এটাও একটি এবাদাত—তা যেন ভুল না হয়।

যাকাত কি কি উপকার করে?

যাকাত যে দেয় তার মন থেকে অর্থের লোভ ও মোহ দূর হয়ে যায়। যাকাত যে নেয় তার মন থেকে ধনীর ধনদৌলতের প্রতি হিংসা ঈর্ষা দূর হয়। প্রতি বছর যাকাত দিতে দিতে সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হয়ে যাবে এই আশংকায় মানুষ গোপনে অর্থ জমিয়ে না রেখে তা বিনিয়োগের দ্বারা সঞ্চিত অর্থকে বাড়ানর চেষ্টা করে। আর এই বিনিয়োগ দেশ ও দেশবাসীর জন্য অপরিহার্য।

যাকাতের মাধ্যমে ধনীরা দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। আর দরিদ্রের মনের ঈর্ষার কালিমা দূর হয়। যে ভাইয়ের আর্থিক অবস্থা খারাপ তার যে ভাই ভাল অবস্থায় আছে তার প্রতি ভাল ধারণা হয়। যে সমাজে

যাকাত ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সে সমাজে ধনীরা অযথা টাকা জমানোর ইচ্ছা দমন করতে পারে। সমাজে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, সমতা, সহানুভূতি সৃষ্টি করতে যাকাতের অবদান অপরিসীম। ইসলামী সমাজে ধনী মুসলমানদের যাকাত আদায় করে সমাজের কল্যাণের জন্য তা ব্যয় রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। হযরত আবুবকর (রাঃ) যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। যাকাত এমনভাবে দেওয়া প্রয়োজন কিংবা যাকাতের অর্থের এমনভাবে বিলিবণ্টন দরকার যাতে সমগ্র সমাজ উপকৃত হয়—দরিদ্রের অর্থকষ্টের মুক্তি ঘটে।

কি কি সম্পদের যাকাত দিতে হয় ?

নগদ টাকা, অলংকার, গবাদি পশু এবং ক্ষেতের ফসলের জন্য যাকাত দিতে হয়। যাকাতের নিয়ম হলো বছরের শেষে সব খরচের পর যার কাছে কমপক্ষে সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপোর মূল্যের সমান টাকা থাকে তাকে যাকাত দিতে হবে। যাকাত দিতে হবে নগদ টাকায়, কমপক্ষে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে।

কাদের যাকাত গ্রহণের অধিকার আছে?

কোরআনে বলা হয়েছে, "যাকাত তো কেবল তাদের জন্য যারা নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত, যারা তা সংগ্রহ করে (কর্মচারী) যাদের মনকে আকর্ষণ করা হলো (নও-মুসলিম), ঋণগ্রস্থদের ঋণ মুক্ত করার জন্য, আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্‌ সবকিছু জানেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী।"

অতএব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত লোক হল: (১) গরীব (২) মিসকিন (৩) নও মুসলিম অর্থাৎ যারা ধর্ম ত্যাগ করে নূতন মুসলমান হয়েছে। (৪) দাস-দাসী (৫) রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত যাকাত সংগ্রহকারী (৬) মুসাফির (৭) যারা আল্লাহ্‌র পথে কাজ করে।

সর্বোপরি কোরআনের এই বাণীটি প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে সদাজাগ্রত রাখা উচিত—

'যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা কখনও দুঃখ পাবেনা।' (সূরা বাকারা : ২৭৭ নং আয়াত।)

ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ

সিয়াম বা রোযা (উপবাস)

রোযাকে কোরআনে বলা হয়েছে 'সওম'। সওম অর্থ বিরত থাকা বা বিরত রাখা। রোযার দিনে মুসলমানগণ কোন জিনিস খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকেন। এই সওম বা সিয়াম পালন করা হয় রমজান মাসে।

সিয়াম বা রোযা রাখার লক্ষ্য কি ?

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে রোযা রাখতে বলেছেন। এটি একটি আল্লাহ্‌র এবাদত। একমাস রোযা রাখা মুসলমানের জন্য ফরজ বা অবশ্যপালনীয়। এমন রোযা রাখার নিয়ম আরও কয়েকটি ধর্মে প্রচলিত আছে। আমরা বিশ্বাস করি শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর আগে যেসব নবী-রসূল এসেছিলেন তাঁদের জন্য রোযা রাখা ফরজ ছিল। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন : "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্যে রোযা রাখা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরজ করা হয়েছিল। আশা করা যায় এর মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পরহেযগারীর গুণ সৃষ্টি হবে।" এই আয়াতের মধ্যেই রোযার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। আন্তরিকতার সঙ্গে রোযা রাখলে 'পরহেজগারীর গুণ সৃষ্টি' হয়। পৃথিবীর সকল রকম লোভ লালসা থেকে নিজেকে দূরে রাখাকেই বলে পরহেজগারী।

আল্লাহ্‌প্রেম ও আল্লাহ্‌ভীতি জাগ্রতকারী হিসেবে রোযা :

রোযা মানুষের মনের মধ্যে জাগ্রত করে আল্লাহ্‌প্রেম—নিয়ে আসে

আল্লাহভীতি। রোযার সময় মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি নিষ্ঠা তৈরী হয়। দ্বিতীয় কারও জানার সম্ভাবনা না থাকলেও একমাত্র আল্লাহ্‌কে ভয় করেই মানুষ কোন কিছু আহার থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষ ভাল কাজ করে—মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকে।

রোযার অন্যান্য গুণগুলি কি ?

রোযা মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। মানুষ স্বভাবতঃ আয়েশী ও সুখপিয়াসী। রোযার মধ্য দিয়ে মানুষ এগুলিকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। মানুষের স্বভাবের উপরে তার ইচ্ছাশক্তি জয়লাভ করে।

রোযা দরিদ্রের ক্ষুধার যন্ত্রণার স্বরূপ উপলব্ধি করায়। যে মানুষ অন্ন কষ্টের মুখোমুখি হয়নি সে বুঝতে শেখে ক্ষুধার কষ্ট কেমন। ফলে সে দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারে।

রমজান মাসে সারা বিশ্বের মুসলমানগণ রোযা রাখেন। এর ফলে পৃথিবীর সকল মুসলমানদের একে অপরের সঙ্গে একটা একাত্মতাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে উঠে।

স্বাস্থ্যের জন্যও রোযা উপকারী। রোযা রাখলে শরীরের অপ্রয়োজনীয় বাড়তি চর্বি জাতীয় উপাদান কমে যায়। দেহের পক্ষে ক্ষতিকর জীবাণু ও নানারকম রাসায়নিক পদার্থের উপাদান কমে যায়। রোযার এত গুণ থাকলেও মনে রাখতে হবে রোযার প্রধান উদ্দেশ্যে—আল্লাহ্‌কে স্মরণ। আল্লাহ্‌ রোযা রাখার বিধান দিয়েছেন বলেই রোযা রাখতে হবে। আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা হওয়াই আমাদের রোযার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

রোযার সময়কাল কতটা ?

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অর্থাৎ ফজরের আযান থেকে মাগরিবের আযান—এ সময়টুকু পর্যন্ত রোযার সময়। রোযার সময় শুরুর আগে শেষ রাতে যে খাবার খাওয়া হয় তাকে সেহেরী বলে। রোযা রাখার আগে রোযার নিয়ত করতে হয়। সেহরী খাওয়ার পরপরই এই নিয়ত করতে হয়—

'নাওয়াইতো আন আসুমাগাদাম মিন শাহরে রামাজানাল মুবারাকে ফারজা লাকা ইয়া আল্লাহো ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলীম।'

বাংলায়ঃ—হে প্রভু! তোমার হুকুম মত, তোমার সন্তুষ্টির জন্য আগামীকাল রোযা রাখার নিয়ত করছি। তুমি আমার কাছ থেকে একে গ্রহণ কর। তুমি শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।

মাগরিবের আযান পর্যন্ত রোযা রাখার নিয়ম। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মাগরিবের আযান হলে রোযাদার সামান্য আহার করে উপবাস ভঙ্গ করে। একে ইফতার বলে। ইফতার শুরু করার আগে পড়তে হয়ঃ

'আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া আলা রিযকেকা আফতারতো বিসমিল্লা হিররাহমা নিররাহিম।

বাংলা অর্থ—'হে আল্লাহ! আমি তো তোমার জন্য রোযা রেখেছিলাম এবং তোমাকে বিশ্বাস করি। এখন তোমার দেওয়া রিযক দিয়ে রোযা শেষ করছি—ইফতার করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে আমি আহার শুরু করছি।

তারাবিহ্ঃ রমজান মাসে যত বেশী নফল ও সুন্নত এবাদাত করা যায় ততই ভাল। পাঁচ ওয়াক্তের সালাত ছাড়াও 'তারাবিহ্' পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সুন্নত এবাদাত। আট, দশ বা কুড়ি রাকাতে এই সালাত আদায় করতে হয়। রমজান মাসে পুরা কোরআন শরীফ পাঠও অত্যন্ত ভাল। (তারাবিহ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

রমজান মাস কি ভাবে গণনা করা হয়?

রমজান মাস ইসলামী বর্ষের একটি আরবী মাসের নাম। মুসলমানগণ চন্দ্রের নিয়মে মাস ও বছর গণনা করেন। একটি চান্দ্র বছরে থাকে ৩৫৪ দিন এবং সৌর বছরে ৩৬৫ দিন। অর্থাৎ সূর্য বছর অনুযায়ী চান্দ্রমাস প্রতিবছর একই সময়ে পড়ে না। ১১ দিন (লিপইয়ার হলে ১২ দিন এগিয়ে আসবে। ফলে কোন বছর শীতকালে, কোন বছর গরমকালে অর্থাৎ বিভিন্ন ঋতুতে রমজান মাস আসে। এর একটা বিরাট সুযোগ হলো পৃথিবীর সব দেশের মানুষ বিভিন্ন ঋতুতে রোযা রাখার অভ্যাস করতে

পারে। চান্দ্র বছরের আর একটা সুবিধা হলো পৃথিবীর সব স্থানের মানুষ চাঁদ দেখেই মাসের হিসাব করতে পারে।

রমজান মাসের গুরুত্ব কি ?

রমজান মাসের প্রধান মহিমা ও গুরুত্ব হলো এ মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়। কোরআন যে রাত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল সেই রাত্রিকে বলা হয় 'লায়লাতুল কদর'। এই রাত্রি অত্যন্ত পবিত্র। হাজার মাসের চেয়েও বেশী মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এ রাতকে। কিন্তু কোন্ রাতটি লায়লাতুল কদর তা সঠিকভাবে জানা যায় না। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী রমজান মাসের শেষ দশদিনের যে কোন বিজোড় রাতই লায়লাতুল কদর হতে পারে। তাই এই দশদিন অধিক পরিমাণ এবাদত করলে পুণ্যলাভ হয়। বয়স্কদের অনেকে রমজানের শেষ দশদিন মসজিদে এবাদতে রত থাকেন। একে বলা হয় 'এতেকাফ'।

রমজান মাসের ১৭ তারিখে সংঘটিত হয়েছিল ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ। এটিই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম জেহাদ।

ফিতরা ঃ ইসলাম মুসলমানদেরকে প্রতিবেশী দরিদ্র ভাইবোনদের জন্য ভালোবাসার হস্ত প্রসারণের নির্দেশ দিয়েছে। মুসলমানদের উৎসবের আনন্দ একা ভোগ করার জন্য নয়। তাই ধনী ও সামর্থ্যবানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঈদের আগেই দরিদ্র ভাইবোনদের জন্য কিছু দিতে। এরই নাম 'ফিতরা।'

ঈদুল ফিতর ঃ রমজান মাসের পরের মাস হলে শাওয়াল। শাওয়াল মাসের প্রথম দিনটি হলো ঈদুল ফিতর। রমজান মাসে আল্লাহ্ নির্দেশিত পথে কাজ করার আনন্দ নিয়ে ঈদের আগমণ। তাই সে কাজ যে ঠিকমত করতে পেরেছে তার আনন্দই সবার চেয়ে বেশী। ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর এবং দুপুরের আগে দুরাকাআত ওয়াজেব সালাত জামায়াতের সঙ্গে পড়তে হয়। ঈদের নামাযের এই জামাআতের আনন্দ অপরিসীম। আল্লাহ্‌র দরবারে আল্লাহ্‌র রহমতের আশায় সবাই একত্রিত হয়ে প্রার্থনা জানায়। সর্বস্তরের মানুষের একত্রে এইভাবে মিলনের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ্ তাআলার এক অপার রহমত।

রমজান মাসের কর্তব্যকর্ম কি ?

১। অধিক পরিমাণে সালাত কায়েম করা। ২। তারাবিহ্‌র সালাত পড়া। ৩। কোরআন পাঠ। ৪। বেশী পরিমাণে দান করা। ৫। দরিদ্রদের ইফতার খাওয়ানো। ৬। ক্রোধ সংবরণ করা ও সংযমী হওয়া। ৭। বাজে কথা বলা থেকে বিরত থাকা। ৮। অন্যের কুৎসা করা থেকে বিরত থাকা। ৯। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকা। ১০। বাজে কাজে সময় নষ্ট না করে সবসময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা।

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ

হজ্ব

হজ্ব বলতে কী বোঝায় ?

'হজ্ব' আরবী শব্দ। হজ্ব অর্থ বিশেষ উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হওয়া। ইসলাম ধর্মে হজ্ব বলতে বোঝায় যিলহজ্ব মাসে আরব দেশের মক্কা নগরে অবস্থিত কাআবা ঘরে পৌঁছানো। সেখানে যাওয়ার পর কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান করতে হয়। এই সব কাজগুলি কোরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী করা হয়। নবী হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর স্ত্রী হাজেরা এবং পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্মরণ করে এইসব আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়। আল্লাহর প্রতি ভক্তি, ত্যাগ ও কোরবাণীর জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নাম আজও ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। হজ্ব পালনের উদ্দেশ্য হলো সেই ত্যাগ ও কোরবাণীর মহত্ত্ব স্মরণ করে আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেওয়া।

পৃথিবীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসব্যসন, সম্পদের প্রতি লোভ, সন্তানসন্ততির প্রতি স্নেহমমতা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে দূরে রাখে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে এসব বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। তিনি আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্য নিজ স্ত্রীপুত্রকে নির্জন স্থানে রেখে এসেছিলেন। নিজের পুত্রকে কোরবাণী দিতে চেয়েছিলেন। আজ থেকে চার হাজার বছর আগে

এই ঘটনা ঘটেছিল। এতদিন বাদেও এই ত্যাগের দৃষ্টান্ত আমাদের প্রেরণা দেয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ), তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রের আল্লাহ্ ভক্তির কথা স্মরণ করে হাজীগণ আল্লাহ্‌র পথে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রেরণা পান।

হজ্বের সময় বিভিন্ন ভাষা, গোত্র ও বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা জমায়েত হন। বংশ-গৌরব, অর্থ-কৌলিন্য কিংবা শিক্ষার আভিজাত্য – এসবের ভেদাভেদ ভুলে আল্লাহ্‌র আহ্বানে সকলে একত্রিত হন। সকলের পরিধানে একই পোশাক। সকলে একই আচার অনুষ্ঠানে কর্মরত। সকলেই আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্য এসেছেন। সকলেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। সকলেরই মনে একটি সত্য জাগরুক কেয়ামতের দিন এমনি ভাবে সকল মানুষকে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হতে হবে।

হজ্ব কাদের জন্য ফরজ ?

হজ্ব ইসলামের পাঁচটি মূলনীতির একটি। যাঁদের সামর্থ্য আছে এমন মুসলমানের জন্যে জীবনে একবার হজ্ব করা ফরজ। সামর্থ্যবান বলতে বুঝায় —যাঁর স্বাস্থ্য ভাল এবং যাঁর কাছে হজ্বের জন্য পথ খরচ ও অন্যান্য খরচ আর হজ্বে চলে গেলে তার পরিবারের সকলের ভালভাবে দিন কেটে যাবে এমন সম্পদ আছে।

এমন সামর্থ্যবান মুসলমান যদি একবার হজ্ব না করেই মারা যান তবে তার বদলে অন্য কেউ হজ্ব পালন করতে পারেন। অসুস্থ লোকদের বদলে অন্য কেউ হজ্ব করতে পারেন।

কাআবা কি ?

কাআবা অর্থ এমন একটি জিনিস যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা সমান। ইসলাম ধর্মে কাআবা বলতে বোঝায় মক্কার সেই গৃহকে যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। ঘরটি পাথর দিয়ে তৈরী। এ পর্যন্ত ঘরটির অনেকবার সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমানে এটি দৈর্ঘ্যে ৫০ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট এবং উচ্চতায় ৯৫ ফুট। সব সময় এ ঘরকে দামী কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে

রাখা হয়। কাপড়ের উপর সোনার অক্ষরে লেখা থাকে কোরআনের আয়াত। একে বলা হয় গেলাফ। কাআবার আরও কয়েকটি নাম আছে যথা—আল-মসজিদুল হারাম (পবিত্র মসজিদ), বায়তুল আতিক (পুরানো ঘর), বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র ঘর)। পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমানগণ এই কাআবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। যে দেশের যেদিকে কাআবা অবস্থিত সেদেশের সেই দিককে কেবলার দিক বলে।

আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্য এ ঘর তৈরী হয়েছিল। কালক্রমে মানুষ আল্লাহ্‌র কথা ভুলে গেল। ফলে একসময় কাআবা ঘরে মূর্তি জমা করল মানুষ। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সব মূর্তি ভেঙে ফেলেন। আবার শুরু হলো কাআবা ঘরে একমাত্র আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দেওয়া—তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়া। তাই হাজীগণ আল্লাহ্‌র ঘর কাআবা দৃষ্টিপথে আসার সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন—'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক।'—হে প্রভু, আমি হাজির হয়ে গেছি।' হজ্জের সময় ছাড়াও অন্য সময়ও কেউ কাআবায় যেতে এবং হজ্জের অনুষ্ঠানগুলি পালন করতে পারেন। একে বলা হয় ওমরাহ্ ।

হজ্জের সময় কি কি নিয়ম পালন করতে হয়।

হজ্জ যাত্রার সময় মক্কা প্রবেশের আগে নির্দিষ্ট দূরত্বে ও কাআবায় পৌঁছে কতকগুলি নিয়ম পালন করতে হয়। এগুলি হলো (১) এহরাম (২) তাওয়াফ (৩) সায়ী (৪) মিনায় রাত্রি বাস (৫) আরাফাতে অবস্থান—দিন ও রাত্রির কিছু অংশে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত থেকে সালাত পাঠ ও প্রার্থনা। (৬) মুযদালেফায় ফিরে রাত্রি কাটানো। (৭) কোরবাণী করা ও মিনায় শয়তানকে কাঁকর মারা। (৮) সবশেষে কাআবাঘর তওয়াফ করা ও সাফা মারওয়ায় সায়ী করা।

এহরাম বলতে কী বোঝায়?

মক্কার নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌছানোর পর প্রত্যেক হাজীকে এহরাম বাঁধতে হয়। এহরাম বাঁধার অর্থ হলো হজ্জ পালনের ইচ্ছা ঘোষণা করা অর্থাৎ

নিয়ত করা। এহরামের পরই শুরু হয় প্রকৃত হজ্জ যাত্রা। এহরাম বাঁধতে হলে প্রথমে গোসল করে নিতে হয়। তারপর পুরুষদের বিশেষভাবে ছুটকরা সাদা কাপড় পরতে হয়। মহিলাগণ নিয়ত করে নিজেদের পোষাক পরিধান করেন।

এহরাম বাঁধার অর্থ আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ। এহরাম বাঁধার পর কোন খারাপ কাজ বা খারাপ চিন্তাই হাজীগণ করেন না। হৃদয়ে সকল সময় শান্ত, সুন্দর, পবিত্রভাব রাখতে হয়। এহরাম অবস্থায় কোন খারাপ কথা বলতে নেই, ঝগড়া করতে নেই, কোন প্রাণীকে আঘাত বা হত্যা করতে নেই।

কেবলমাত্র বাইরের নিয়মকানুন নয় মনে মনেও একমাত্র আল্লাহ্‌র কথা চিন্তা করতে হয়। নিজের ভুলত্রুটিগুলো স্মরণ করে আল্লাহ্‌র কাছে মাফ বা ক্ষমা চাইতে হয়। হজ্জের অনুষ্ঠানগুলি সম্পর্কে পড়াশোনা করে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হয়। শুরু থেকে নিয়ে মিনায় পৌঁছে প্রথম পাথর মারা পর্যন্ত হাজীগণ উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ করেন—"লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বায়েক লা শারিকা লাকা লাব্বায়েক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান্নিমাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারিকা লাক।" একে 'তালবিয়াহ' বলে।

বাংলায়ঃ আমি উপস্থিত। হে প্রভু, আমি উপস্থিত হয়েছি তোমার দরবারে। তোমার কোন শরীক নেই। আমি তোমার সামনে উপস্থিত হয়েছি। সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই জন্য এবং সমস্ত কিছুর মালিকানা ও কর্তৃত্ব তোমারই। তোমার কোন অংশীদার নেই।

তাওয়াফ কি?

কাআবা শরীফের কাছে পৌঁছেই হাজীগণ নির্দিষ্ট দোয়া পড়েন ও কাআবার চারদিকে সাতবার ঘুরে আসেন একেই বলা হয় তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ। কালো পাথর (হাজরে আসওয়াদ) থেকে এই প্রদক্ষিণ শুরু হয়। ঐতিহাসিক কালো পাথরকে চুমু দিয়ে অথবা তা স্পর্শ করে কিংবা তার দিকে হাত তুলে এই প্রদক্ষিণ শুরু হয়।

সায়ী বলতে কী বোঝায় ?

সায়ী অর্থ জোরে হাঁটা। হাজীগণকে কা'আবার পূর্বদিকে উত্তর দক্ষিণের দুই পাহাড় সাফা ও মারওয়ার পথে জোরে হাঁটতে হয় সাতবার। একেই বলে সায়ী। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী বিবি হাজেরা ও পুত্র ইসমাইলকে আল্লাহ্‌র হুকুমে মক্কার ধূসর মরুভূমির বুকে রেখে গিয়েছিলেন। খাবার ও পানি শেষ হয়ে গেল। মরুভূমির তীব্র সূর্যকিরণে দগ্ধ পাথুরে মৃত্তিকায় শায়িত শিশু পিপাসায় ছটফট করছে। মাতা হাজেরা পাগলিনীর মত পানির সন্ধানে একবার সাফা পাহাড়ে উঠছেন—আবার নেমে দৌড়ে মারওয়ায় উঠছেন একটু পানির সন্ধানে। কোথাও পানি নেই। এই রকম সাতবারের পর ফিরে এসে দেখেন পুত্র ইসমাইলের পায়ের কাছে তৈরী হয়েছে এক ফোয়ারা। এই হলো যমযম। পরে এই যমযম বালুর নীচে চাপা পড়ে যায়। হযরতের দাদা মুত্তালিব একদিন স্বপ্নে এই যমযমের সন্ধান পান। পরে এই যমযমের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়।

পানির জন্যে বিবি হাজেরার এই দৌড়াদৌড়িকে স্মরণ করে হাজীগণকে সায়ী করতে হয়। প্রত্যেক হাজী সাফা পাহাড়ের উপরে ওঠেন। তালাবিয়া উচ্চারণ করে নামেন এবং মারওয়ায় গিয়ে আবার উপরে ওঠেন এবং তালাবিয়া উচ্চারণ করেন।

১০ই যিলহজ্জ সকালে মিনায় পৌঁছতে হয় হাজীগণকে। মিনায় তিনটি 'জায়গা' আছে। সেখানে শয়তানকে উদ্দেশ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারেন হাজীরা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে কোরবাণীরর জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শয়তান ধোঁকা দেওয়ায় তিনি পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলেন তাকে। এ কথা স্মরণ করেই পাথর মারেন হাজীগণ।

আরাফাতে অবস্থান বলতে কী বোঝায় ?

৯ই যিলহজ্জের সকালে হাজীরা মিনা থেকে আরাফাতে পৌঁছান। সকলে তালাবিয়া উচ্চারণ করেন। সেখানে যোহর আসরের সালাত একসঙ্গে আদায় করতে হয়। সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত এখানে নামায ও প্রার্থনা করার

পর তাঁবু উঠিয়ে মুযদালেফায় পৌঁছতে হয়। সেখানে মাগরিব ও এশার নামায একসঙ্গে আদায় করতে হয়।

মিনায় শয়তানকে কাঁকর মারা ও কোরবাণী করা বলতে কা বোঝায় ?

এরপর হাজীরা কোরবাণী দেন। তারপর হাজীগণ মাথার চুল কামান। ১০ই যিলহজ্ব অথবা পরের দিন হাজীদের আর একবার কাআবা তাওয়াফ করতে হয়। মিনাতে কমপক্ষে দুদিন থাকতে হয় হাজীদেরকে।

প্রায় সকলেই এরপর মদিনায় যান। যেখানে রয়েছে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর রওযা মোবারক। বহু দুর থেকে হজ্বের সময়ের আগেই যাঁরা পৌঁছেছেন তাঁরা হজ্বের আগেই মদিনা ঘুরে আসেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্রষ্টা ও সৃষ্টির পরিচয়

আল্লাহতাআলা কে এবং কী তাঁর পরিচয় ?

আকাশ, গ্রহনক্ষত্র, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, জীব-জন্তু, জ্বিন-মানবের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ্ তাআলা। আমরা সাধারণভাবে দেখি আমাদের প্রত্যেকটি ব্যবহার্য দ্রব্য যেমন চেয়ার, টেবিল, কাগজ-কলম, ঘড়ি-রেডিও, জামা-কাপড়, ঘর-বাড়ি সবকিছুরই একজন সৃষ্টিকর্তা বা নির্মাতা আছে। এসব দ্রব্যের সৃষ্টিকর্তা হলো মানুষ। তাহলে মানুষের সৃষ্টি নয় এমন যেসকল জিনিষ আমরা দেখি তার সৃষ্টিকর্তা কে ? সৌরজগৎ, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-নদী, জীবজন্তু ইত্যাদি কি করে সৃষ্টি হলো। এসবেরও তো একজন স্রষ্টা আছে। সেই মহাস্রষ্টাই হলেন আল্লাহ্ তাআলা। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় ; তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি কারও উপর নির্ভরশীল নন। তিনি আদি

ও অনন্ত। পৃথিবী ও সৌরজগৎ সৃষ্টির আগে থেকে তিনি আছেন এবং সবকিছু ধ্বংস হওয়ার পরেও তিনি থাকবেন। তিনি অভাবশূন্য। তিনি সকল সৃষ্ট জীবের আহার্যদাতা। বিশ্বজগতের যাবতীয় গতিবিধিই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

আল্লাহ্‌তাআলা পৃথিবী ও আকাশের তেজোময় জ্যোতি। তাঁর যা ইচ্ছা হয় তাই করেন। শুধু 'কুন' (হও) শব্দ দ্বারা তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করার ও 'ফাইয়াকুন' শব্দ দ্বারা যা-কিছু ধ্বংস করার শক্তির অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী।

পৃথিবীতে মানুষ প্রাণীকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষকে জ্ঞান বিবেক বুদ্ধিদীপ্ত করে শুষ্ক মৃত্তিকা দিয়ে সৃষ্টি করে প্রাণদান করেছেন। বিশ্বজগৎ ও সৌরজগতের সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের ক্ষমতাসম্পন্ন করে আল্লাহ্‌ এই ধরণীতে মানুষকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্‌ পৃথিবীর সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা মানুষের জন্য অসীম দয়া ও ক্ষমার আধার। আবার অহংকারী, পাপী ও উদ্ধতের জন্য চরম শাস্তি বিধানকারী। আল্লাহ্‌তাআলা মানুষ ও অন্যান্য জীব ও উদ্ভিদকে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তাঁর আরাধনা ও উপাসনা করার জন্য। তাই প্রতিটি মানুষকে প্রথমে তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তারপর পারস্পরিক কল্যাণচিন্তার ভিত্তিতে বিশ্বস্রষ্টার আরাধনা ও উপাসনা করতে হবে। এক, অদ্বিতীয় ও নিরাকার আল্লাহ্‌তাআলার কাছে আত্মসমর্পণ করাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য।

মুসলমান কাকে বলা হয় ?

আল্লাহ্‌ এক ও নিরাকার, হযরত আদম (আঃ) থেকে সকল মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌ প্রেরিত শেষ নবী এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন আরাধ্য ও উপাস্য প্রভু নেই বলে যারা বিশ্বাস করেন সেই মানবসম্প্রদায়কে বলা হয় মুসলমান। মুসলমান শব্দের অর্থ আত্ম-সমর্পণকারী।

আমাদের পরিচয় কি ?

আমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট মানুষ। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী আমরা

আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ এই সত্যে আস্থাবান। আমরা এক আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণকারী বা মুসলমান এই হল আমাদের পরিচয়।

তোমার ধর্মের নাম কি ?

আমার ধর্মের নাম ইসলাম বা আত্মসমর্পণ ও শান্তির ধর্ম।

কে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

বিশ্বজগতের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর প্রথম মানব আদম (আঃ) ও প্রথম মানবী হাওয়া আমার পূর্বপুরুষ। আমার স্রষ্টা আল্লাহ্‌তাআলা, বেহেশত, দোয্‌খ, আকাশ, পৃথিবী সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন।

কিভাবে আল্লাহ্ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন ?

আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ সৃষ্টি কৌশল দ্বারা মাত্র 'কুন' শব্দ উচ্চারণ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সৌরজগৎ, নদনদী সমুদ্র পর্বত, প্রাণী, উদ্ভিদ ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্ কিভাবে মানুষ সৃষ্টি করেছেন ?

তিনি প্রথমে হযরত আদম (আঃ)-কে শুকনো মাটি থেকে তৈরী করেন। তারপর তাঁকে প্রাণদান করে সজীব করেছেন। তাঁর দেহের উপরিভাগের সামান্য অংশ (পাঁজরা ?) থেকে তাঁর জীবন সঙ্গিনী হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এই দুজন থেকে জন্ম দিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ভাষার মানব সম্প্রদায়কে। মানবজাতিকে তিনি সকল প্রাণীর মধ্যে করেছেন শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন করে।

কে বিশ্বমানবকে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন বর্ণের করে সৃষ্টি করেছেন ?

আল্লাহ্‌তাআলা বিশ্ব মানবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন জাতির করে সৃষ্টি করেছেন এইজন্য যে তারা পরস্পর কল্যাণের জন্য প্রতিযোগিতা করবে, একে অপরের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকবে। তাদের

একটি মাত্র বর্ণ ও জাতি করে সৃষ্টি করলে পৃথিবীতে সভ্যতার ক্রমোন্নতির জন্য প্রতিযোগিতা ঘটতনা।

কি জন্য মানবসম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে ?

মানুষ পৃথিবীতে ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত হয়ে এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা আল্লাহ্‌তাআলার উপাসনা করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে।

বিপথগামী মানুষদের কি বলে ?

যারা সৎপথ ছেড়ে নানারকম অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়, এক আল্লাহ্‌কে ভুলে বহু দেবদেবীকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরিক করে, তাদের উপাসনা করে তাদের 'কাফের' বা অবিশ্বাসী বলে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ক. ফেরেশতা বা মালায়েকাত

ফেরেশতা কারা ?

আল্লাহ্ ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা নূর (জ্যোতির্ময় আলো) থেকে তৈরী। ফেরেশতাগণ মানবদৃষ্টির অন্তরালে থাকেন। তাঁরা সকল সময় আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত কাজে আত্মলিপ্ত হয়ে থাকেন।

ফেরেশতাদের সংখ্যা কত ?

ফেরেশতাদের সংখ্যা একমাত্র তাঁদের স্রষ্টা আল্লাহ্‌তাআলাই জানেন। আমাদের শুধু এটাই জানতে হবে যে ফেরেশতাদের সংখ্যা অসংখ্য। তাঁদের মধ্যে চারজন ফেরেশতা আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নৈকট্যের অধিকারী এবং বিশ্বমানবের সর্বাধিক পরিচিত। অবশিষ্ট অন্যান্য ফেরেশতাগণ সমমর্যাদা সম্পন্ন নন। আল্লাহ্ এঁদের বিভিন্ন স্তরের করে সৃষ্টি করেছেন। কেউ

বিশেষ উচ্চ স্তরের আর কেউ সাধারণ। আল্লাহ্‌র সঙ্গে কারও সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ, কারও সম্পর্ক সাধারণ।

ফেরেশতাগণ কি কাজ করে থাকেন ?

অসংখ্য ফেরেশতা আকাশ পৃথিবী এবং তার মধ্যেকার সব কিছু কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিযুক্ত। আল্লাহ্‌ ফেরেশতাদের উপর সব বিষয়ের দায়িত্ব ভার অর্পণ করে তা পালনের আদেশ দান করেন।

সর্বজনবিদিত ফেরেশতা কতজন ও কে কে ?

সর্বজনবিদিত ফেরেশতা চার জন। প্রথম হলেন হজরত জিব্রাঈল (আঃ)। ইনি আল্লাহ্‌র যাবতীয় বিধিনিষেধের বাণী বহন করে এনেছেন নবী ও পয়গম্বরদের কাছে। দ্বিতীয় হলেন ইস্রাফিল (আঃ)। ইনি শিঙ্গা হাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় সদাপ্রস্তুত হয়ে দণ্ডায়মান। যখনই আল্লাহ্‌ নির্দেশ দেবেন তখনই তিনি এই শিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন। শিঙ্গা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত হবে—অর্থাৎ কেয়ামত সংঘটিত হবে। তৃতীয় জন হলেন হযরত মিকাইল (আঃ)। ইনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে বায়ু ও বৃষ্টির এবং আল্লাহ্‌তাআলার সকল সৃষ্ট জীবের আহার্যের তত্ত্বাবধান করেন। চতুর্থ হলেন হযরত আযরাইল (আঃ)। আযরাইল (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে সমগ্র সৃষ্ট জীব ও মানুষের জান কবজ (প্রাণ সংহার) করেন। অর্থাৎ সকল সৃষ্ট জীবের দেহ থেকে তার প্রাণ বের করে নিয়ে তার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন। এই চারজন ফেরেশতার অধীনে অসংখ্য ফেরেশতা আল্লাহ্‌র নির্দেশগুলি পরিপূর্ণ করার কাজে সদা নিয়োজিত।

আর কোন সর্বজনবিদিত ফেরেশতা আছেন কি ? থাকলে তাঁদের নাম ও কাজ কি ?

উপরোক্ত চারজন ছাড়াও আরও বেশ কিছু ফেরেশতা বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত আছেন। যেমন: (১) প্রত্যেক মানুষের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্য দুজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন। তাঁদের একজন মানুষের ভাল কাজগুলি লিপিবদ্ধ করেন এবং অপরজন মন্দ কাজগুলি লিপিবদ্ধ করে

রাখেন। এই দুই ফেরেশতা 'কেরামন কাতেবিন' বা সম্মানীয় লেখক নামে পরিচিত। (২) একশ্রেণীর ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন মানব সম্প্রদায়কে দুর্যোগ ও বিপর্যয় থেকে রক্ষার নির্দেশের অপেক্ষায়। আল্লাহ্ যখন কোন সম্প্রদায়কে বিপদাপদ থেকে রক্ষার বিধান জারি করেন তা এঁদের দ্বারা কার্যকরী করে থাকেন। এঁরা বৃদ্ধ, শিশু, অনাথ আতুরদেরও আল্লাহ্‌র নির্দেশে রক্ষা করে থাকেন। (৩) কিছু ফেরেশতাকে আল্লাহ্ নিযুক্ত রেখেছেন মৃত্যুর পর কবরে মানবাত্মাকে তার পার্থিব কৃতকর্মের বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য। এঁরা মুনকার ও নেকির নামে অভিহিত। (৪) আরও অনেক ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন মানুষের পার্থিব জীবনে বিভিন্ন ভাল কাজ, আল্লাহ্‌র একাগ্র আরাধনা, আল্লাহ্‌র নবীদের উপর দরূদ, ধর্মালোচনা, জ্ঞানসাধনা, কোরআন পাঠ ইত্যাদি বিষয় প্রত্যক্ষ করার জন্য। পৃথিবীতে দিবারাত্রি পালাক্রমে এভাবে ফেরেশতা বা দেবদূতগণ মানুষের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করছেন। (৫) কিছু ফেরেশতা বেহেশতের আবার কিছু ফেরেশতা দোযখের বিষয়াদি প্রত্যক্ষ করার কাজে নিযুক্ত আছেন। (৬) অনেক ফেরেশতা দিবারাত্রি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার কাজে রত আছেন। (৭) অনেক ফেরেশতা আল্লাহ্‌র আদেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছেন। ফেরেশতাদের এই ক্রিয়াকলাপ কোরআন ও হাদিস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

খ. রসূল ও নবী

রসূল বা প্রেরিত পুরুষ কাকে বলে?

রসূল শব্দের অর্থ প্রেরিত পুরুষ বা আল্লাহ্‌র দূত। রসূল বা আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষগণ মানুষ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বান্দা। আল্লাহ্ মানবজাতিকে কুপথ থেকে রক্ষা করে সুপথে আনার আহ্বান জানানোর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন রসূলগণের উপর। সকল রসূলগণ সত্যভাষী। তাঁর মিথ্যা বলেননি। কোন পাপ করেননি। রসূলগণ বিপথগামী মানুষকে সৎপথে আনার জন্য

আল্লাহ্‌র মহিমায় নানারকম অলৌকিক কার্যকলাপ প্রদর্শন করেছেন। রসূলগণ আল্লাহ্‌র সমূহ নির্দেশ ও উপদেশ বিশ্বমানব গোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা কখনও আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ গোপন বা পরিবর্তন করেননি। আল্লাহ্‌ যেভাবে মানুষকে সৎপথে আহ্বান জানানোর নির্দেশ রসূলগণের উপর দিয়েছেন তাঁরা সেইভাবেই তা পালন করেছেন। তাঁরা নিজ ইচ্ছায় কিছুই করেননি। সবকিছুই আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ইচ্ছানুযায়ী সুসম্পন্ন করেছেন। যেমন হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠিকে সাপে পরিণত করা। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অঙ্গুলিসংকেতে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা।

নবী বা পয়গম্বর কাদের বলা হয় ?

নবী অর্থ হলো পয়গম্বর। সকল পয়গম্বরই আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষ ও তাঁর বান্দা বা দাস। সকলেই মানুষের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী ও নির্দেশাবলী পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকে সত্যবাদী। কখনও মিথ্যা বলেননি। কখনও কোন অন্যায় বা পাপ করেননি। কখনও আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ ও বাণীকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা সংক্ষেপে করেননি। কখনও কোন কিছু গোপন করেননি।

রসূল ও নবীর মধ্যে পার্থক্য কি ?

রসূল ও নবীগণের মধ্যে সাধারণভাবে কিছু পার্থক্য আছে। যাঁদের উপর আল্লাহ্‌র ওহী বা প্রত্যাদেশ এসেছে ও মানুষকে সেইমত সৎ ও সুপথে আহ্বান জানিয়েছেন—তাঁরা রসূল বা প্রেরিত পুরুষ আর আল্লাহ্‌র ওহী (প্রত্যাদেশ) যাঁদের উপর অবতীর্ণ হয়নি কেবলমাত্র পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশ মত মানুষকে সৎপথে আহ্বান জানানোর নির্দেশ পেয়েছেন তাঁরা নবী বা পয়গম্বর। অর্থাৎ সকল রসূলই নবী ও রসূল দুইই কিন্তু সকল নবী রসূল নন। রসূল ও নবী সকলেই মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। মানুষকে অত্যাচার, অনাচার, উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করেছেন। মানুষের মধ্যে সাম্য সৌহার্দ্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রচার করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই রসূল ও নবী উভয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। যেমন হযরত মোহম্মাদ (সাঃ) রসূল ও নবী দুইই ছিলেন।

চেষ্টা করলেই নবী বা রসূল হওয়া যায় কি ?

আল্লাহ্ যাঁকে রসূল বা নবী অথবা উভয়ই করেন তিনি ছাড়া কেউ নিজের চেষ্টায় রসূল বা নবী কিছুই হতে পারেন না। মানুষ চেষ্টা করলে তাপসশ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ ওলীর মর্যাদা লাভ করতে পারেন কিন্তু আল্লাহ্ যাঁকে রসূল বা নবী করে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেননি তিনি কখনই নিজ চেষ্টায় বা সাধনা দ্বারা রসূল বা নবী হতে পারেন না।

পৃথিবীতে রসূল ও নবীগণের সংখ্যা কত ?

পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তাদের সৎপথে রাখার ও কুপথ পরিহার করার আহ্বান জানানোর দায়িত্ব দিয়ে অসংখ্য রসূল বা নবী পাঠিয়েছেন। কোরআন শরীফে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন প্রত্যেক জাতির জন্য সুপথনির্দেশক পৌঁছেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশেও নিশ্চয়ই কোন বাণী বাহক বা নবী এসেছিলেন। তবে এ সম্পর্কে আজও কিছু জানা যায়নি।

পৃথিবীর প্রথম ও শেষ নবী কে ?

হযরত আদম (আঃ)-ই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রথম নবী ও দূত এবং হযরত মোহম্মাদ (সাঃ) পৃথিবীতে আল্লাহ্ সর্বশেষ নবী ও রসূল। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পর পৃথিবীতে আর কোন রসূল বা নবী আসবেন না। পৃথিবীর মহাপ্রলয় বা কেয়ামত পর্যন্ত হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) প্রচারিত বাণী ও আল্লাহ্‌র বাণী কোরআন মেনে চলার নির্দেশ আল্লাহ্ পয়গম্বর হযরত মোহম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) রসূল ও নবী হিসাবে পৃথিবীতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নবুয়ত বা নবী প্রেরণ পদ্ধতির সমাপ্তি ঘটেছে। কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। যে কেউ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরে কেয়ামত পর্যন্ত সময় কালে নবীত্বের দাবী করবে সে প্রবঞ্চক, প্রতারক ও মিথ্যাচারী বলে গণ্য হবে।

সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত রসূল ও নবী কে ?

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) শেষ যুগের নবী। পৃথিবীতে আল্লাহ-প্রেরিত যত দূত, পয়গম্বর বা নবী এসেছেন তিনি তাদের সকলের ঊর্ধ্বে ও

সর্বাধিক মহিমান্বিত। আল্লাহ্‌র পরে তিনিই সর্বাধিক সম্মানীয় ও মহিমান্বিত। ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে তিনি প্রাচীন ও পবিত্র শহর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তার নাম কোরায়েশ বংশ। তিনি ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন। ৫৩ বছর বয়স পর্যন্ত পবিত্র মক্কাতে বসবাস করেছেন ও ধর্মপ্রচার করেছেন। তারপর আল্লাহ্‌র আদেশে মদিনা শহরে প্রস্থান করেন এবং অবশিষ্ট জীবন মদিনাতেই অতিবাহিত করেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর ১৩ বছর তিনি মক্কা শহরে এবং ১০ বছর মদিনাতে অতিবাহিত করেন। স্বল্পকালের মধ্যে তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্মের নীতিগুলি বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের একের পর এক জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। একের পর এক দেশে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এক আল্লাহ্‌র উপাসনা প্রচলিত হয়। অতঃপর তিনি ৬৩ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি পবিত্র শহর মদিনাতে তাঁরই তৈরী মসজিদে নাবাবী সংলগ্ন নিজ বাসগৃহে সমাহিত আছেন। তাঁর মাধ্যমেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ যাতে সমাজ-সংসার, রাষ্ট্র পরিচালনাসহ এক আল্লাহ্‌র উপাসনার যাবতীয় বিধিনিয়ম নির্দেশিত হয়েছে সেই মহাগ্রন্থ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। কেয়ামত পর্যন্ত এই গ্রন্থে উল্লিখিত বিধানই মানবজীবনের একমাত্র বিধান বলে গৃহীত হবে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূর্বপুরুষগণের মধ্যে আরও অনেক নবী ও রসুল এসেছেন যেমন হযরত ইব্রাহিম (আঃ), হযরত ইসমাইল (আঃ), হযরত নূহ (আঃ) হযরত ইদ্রিস (আঃ), হযরত শীষ (আঃ) প্রভৃতি।

হজরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর বিশ্বাস বলতে কি বোঝায়?

আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে রসূল ও পয়গম্বরগণ সকলেই আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্‌র পরই তাঁরা অধিক মহিমান্বিত। তাঁরা নিষ্পাপ এবং সকলপ্রকার পাপ ও অন্যায় করা থেকে মুক্ত ছিলেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র শেষ নবী ও রসূল। পবিত্র কোরআন

শরীফ ওহী মারফৎ ফেরেশতা জিব্রাঈল দ্বারা তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে। সশরীরে মেঅরাজ দ্বারা আল্লাহ্ তাঁকে বেহেশত দোযখ ইত্যাদি দেখিয়েছেন। তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে বহু অলৌকিক কাজ প্রদর্শন করেছেন। তিনি দিবারাত্রি আল্লাহ্‌র আরাধনা করতেন। তাঁর আচার-আচরণ ব্যবহার ছিল অতুলনীয়। আল্লাহ্ তাঁকে অতীত ও বর্তমান সহ বহু বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পর আর কোন নবী ও রসূল আসবেন না বা কোন নূতন ধর্মীয় বিধানও আসবে না। কোরআন ও হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিয়ম দ্বারাই ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন মহান আল্লাহ্। তবে হযরত ঈশা (আঃ) যাঁকে আল্লাহ্ পৃথিবীর মাটি থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং যিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূর্বেই এসেছিলেন তিনি পুনরায় পৃথিবীর মাটিতে আসবেন এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নীতি ও আল্লাহ্‌র বাণী কোরআনের নির্দেশ পালন করবেন। কেয়ামতের দিন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর অনুগামীদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মুক্তির সুপারিশ করবেন। তাদের পাপমোচনের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট শাফাআত চাইবেন। এইজন্যই তাঁকে শফিউল মুজনাবিন বলা হয়। তাই শরীয়তের নিয়ম অনুসারে তাঁকে সম্মান করা ও তাঁর প্রতি সালাম পাঠানো আমাদের বিশেষ কর্তব্য।

মক্কা থেকে মদিনা গমন কি ও কেন ?

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) মক্কাতে ইসলামধর্ম পুনঃপ্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। যাঁরাই ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ্ এক ও মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল বলে স্বীকার করতেন তাঁদের উপরও অকথ্য অত্যাচার, প্রহার, উৎপীড়ন চলতে থাকে। অতঃপর অত্যাচার যখন প্রাণনাশের পর্যায়ে পৌঁছায় তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি মদিনায় হিজরত বা প্রস্থান করেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে আগে বা পরে মদিনায় পৌঁছেছিলেন তাঁদের মোহাজের বলে। আর যেসকল মদিনাবাসী তাঁদের সবরকম সাহায্য সহযোগিতা করে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁদের বলা হয় **আনসার**। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সঙ্গীদের বলা হয় **সাহাবা**।

মক্কা থেকে মদিনায় এই প্রস্থান ইসলাম ধর্মে হিজরত বলে গণ্য হয়। এই হিজরতকে কেন্দ্র করে হিজরী সাল গণনা করা হয়।

গ. ঐশীগ্রন্থ বা আল্লাহ্‌র বাণী

আল্লাহ্‌র বাণী কি?

মানবসম্প্রদায় যাতে ন্যায়নীতি ভ্রষ্ট না হয়, সদাসর্বদা যাতে তারা ন্যায়ের পথে থেকে পরস্পরের মঙ্গল সাধনে ব্যাপৃত থাকে এবং নিজ স্রষ্টার আরাধনা করে তার জন্য বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌ যুগে যুগে রসূল ও নবী পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্‌ ঐসকল রসূল ও নবীগণের নিকট স্রষ্টার বিধি-বিধান সম্বলিত কিছু বাণী পাঠিয়েছেন। যে বাণীর সাহায্যে রসূলগণ বিশ্বের মানুষকে সৎপথে আহ্বান করেছেন তা হলো আল্লাহ্‌র বাণী বা ঐশীগ্রন্থ। আল্লাহ্‌র যাবতীয় আদেশ নিষেধ এই সকল ঐশীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল গ্রন্থের বিষয়, বক্তব্য ও ভাষা কোনটাই সৃষ্ট জীবের অর্থাৎ মানুষের নয়। এ সকল বাণী স্রষ্টার বা আল্লাহ্‌র।

ঐশীগ্রন্থের সংখ্যা কত?

আল্লাহ্‌র বাণী বা ঐশীগ্রন্থের সংখ্যার সঠিক হিসাব দেওয়া কঠিন। তবে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের বর্ণনামত এর সংখ্যা ১০৪টি। এগুলি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রসূলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে চারখানি গ্রন্থ প্রধান ও সর্বজনপরিচিত। এগুলি হলো 'তাওরাত' বা ওল্ড টেস্টামেণ্ট হযরত মুসা (আঃ)-এর উপর; 'যবুর' বা স্যাম হযরত দাউদ (আঃ) (ডেভিড)-এর উপর 'ইনজিল' বা নিউ টেস্টামেণ্ট হযরত ঈশা (যীশু) আঃ-এর উপর এবং সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'কোরআন শরীফ' হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী রসূলগণের অনেকের নিকট একাধিক গ্রন্থ সহীফা আকারে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রধান চারটি গ্রন্থ ছাড়া অবশিষ্ট কোন গ্রন্থের সন্ধান বর্তমান বিশ্বে পাওয়া যায় না। 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট', 'স্যাম' ও 'নিউ

'টেস্টামেন্ট' যেভাবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে রসূলদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল তা অপরিবর্তনীয় আকারে নেই। বিভিন্ন সময়, বিভিন্নভাবে ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ তা পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছেন। একমাত্র ঐশীগ্রন্থ কোরআন অপরিবর্তনীয় আছে। ঠিক যেভাবে আল্লাহ্‌র বাণী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবেই কোরআন শরীফ আজও অপরিবর্তনীয় রয়েছে। বাকিগুলি এত ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে যে তা আল্লাহ্‌ কর্তৃক অবতীর্ণ মূল গ্রন্থের বক্তব্যের সঙ্গে এক নেই। তাই মুসলমানগণ বর্তমানে প্রচলিত ঐ গ্রন্থগুলি ঐশীগ্রন্থ বলে বিশ্বাস করেন না।

পবিত্র কোরআন শরীফ

পবিত্র কোরআন কি?

পবিত্র কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী। বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌ তাঁর ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর দ্বারা এই বাণী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছেন। দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ প্রয়োজনানুসারে ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) বিভিন্ন সময় আল্লাহ্‌র বিভিন্ন প্রত্যাদেশ (ওহী) নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট। তিনি আল্লাহ্‌র সেই সকল বাণী সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করে নিতেন এবং সাহাবা অর্থাৎ তাঁর সঙ্গীগণকে শুনিয়ে দিতেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এই সকল বাণী সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখতেন। সেই সময় আজকের মত কাগজ ছিল না। তাই গাছের ছাল, চামড়া, পাথর ইত্যাদির উপর তাঁরা বাণীগুলি লিখতেন। তা ছাড়াও অসংখ্য ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা এগুলি মুখস্থ করে রাখতেন। এঁদেরকে হাফেজ নামে আখ্যায়িত করা হতো। আজও সমগ্র কোরআন শরীফকে বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মানুষ মুখস্থ করে রেখেছেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) নিজে পার্থিব লেখাপড়া জানতেন না তাই তাঁকে 'উম্মি' (নিরক্ষর) বলা হতো।

কিভাবে কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে ?

আমরা যে বৃহৎ কলেবরের কোরআন শরীফ পড়ি তা একত্রে অবতীর্ণ হয়নি। এই কোরআন শরীফ আল্লাহ্‌র আরশে সুরক্ষিত ছিল এবং তা প্রয়োজনমত এক একটি আয়াত আকারে জিব্রাঈল (আঃ)-এর দ্বারা আল্লাহ্‌ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছেন। পরে রসূলুল্লাহ্‌ (হযরত মোহাম্মদের) নির্দেশমত এগুলিকে সুরা ও আয়াত আকারে সাজানো হয়েছে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এবিষয়ে জিব্রাঈল (আঃ)-এর কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে তবে কোরআনকে সাজানোর নির্দেশ দিতেন। প্রত্যেক আয়াত ও সুরার শুরু ও শেষ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে শুনিয়ে সুনিশ্চিত হয়ে তবেই কোরআনকে সাজানোর কাজ করা হয়েছে।

কোরআন প্রথম অবতীর্ণ হয় মক্কা শহরের অনতিদূরে হেরা পর্বতগুহায়। এই পর্বতচূড়ায় এক অপূর্ব গুহা বিদ্যমান। গুহাটি ঠিক কাআবার বরাবর অবস্থিত। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এই গুহায় নির্জনে আল্লাহ্‌র আরাধনা করতেন। কখনও কখনও তিনি একাদিক্রমে তিনচারদিন এই গুহায় অবস্থান করতেন। বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে যেতেন। খাবার শেষ হয়ে গেলে আবার এসে তা নিয়ে যেতেন। এমনি করে যখন গভীর ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন তাঁর সামনে জিব্রাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়ে বলেন, 'একরা' (পড়)। এটিই পবিত্র কোরআনের সুরা আলাকের প্রথম শব্দ। আর পৃথিবীর বুকে পবিত্র কোরআনের অবতীর্ণ হওয়া প্রথম শব্দ। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বিস্ময়াভিভূত হয়ে বললেন,—আমি পড়তে জানি না। 'পড়'—এই আহ্বান বার তিনেক ধ্বনিত হয়েছে আর হযরতও একই উত্তর দিয়ে গেছেন। এরপর জিব্রাঈল (আঃ) পড়ে গেছেন :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَأْ

وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ۗ

"একরা বিসমে রাব্বেকাল লাজি খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন

আলাক। একরা অ রাব্বোকাল আকরামোল লাজি আল্লামা বিল কালাম, আল্লামাল ইনসানো মালাম ইআলাম।"

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-ও এই ক'টি স্তবক (আয়াত) জিব্রাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মত পড়ে গেলেন। এরপর থেকে একাদিক্রমে ২৩ বছর ব্যাপী অবতীর্ণ হলো কোরআন শরীফ তারপর শেষ হলো এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে, "আজ তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।"

কিভাবে কোরআনকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়?

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কোরআন শরীফকে সুবিন্যস্ত করেছিলেন জিব্রাঈল (আঃ)-এর নির্দেশ অনুসারে। সেই ধারাবাহিকভাবে সাজানো কোরআন শরীফই লক্ষ লক্ষ মুসলমান মুখস্থ করে রেখেছিলেন। কিন্তু কোনভাবেই তা গ্রন্থাকারে ছিল না। তাই মুখস্থকারী হাফেজগণ ব্যতীত সাধারণমানুষ এর সুবিন্যস্ত আকারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। কোন্ সুরার পর কোন্ সুরা, কোন্ আয়াতের পর কোন্ আয়াত তা সাধারণ মুসলমানগণ সাজিয়ে পড়ার সুযোগ পেতেন না। তাঁরা সুরা ও আয়াতগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পড়তেন। এইজন্য হযরত আবুবকরের খেলাফতের সময় হযরত ওমর তাঁকে রসুলুল্লাহ্ যেভাবে কোরআন শরীফকে সাজিয়েছিলেন সেইমত সাজিয়ে সমগ্র কোরআন শরীফকে লিপিবদ্ধ করার পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শমত হযরত (রাঃ) আবুবকর কোরআন শরীফকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করান। এরপর হযরত ওসমান কোরআন শরীফকে সুরা অবতীর্ণ হওয়ার কাল অনুসারে সাজিয়ে গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত করেন। আজও আমরা সেই কোরআন শরীফকেই পড়ছি। গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত করার পর যেসব লক্ষ লক্ষ মুসলমান কোরআন শরীফ মুখস্থ রেখেছিলেন—সেইসব হাফেজগণকে একত্রিত করা হয় এবং গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত কোরআন শরীফকে তাঁদের মুখস্থ করা কোরআন শরীফের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়। তারপরই তাকে গ্রন্থাকারে সুবিন্যস্ত কোরআন শরীফ বলে বিশ্বমুসলমানের জন্য নির্ধারিত করা হয়। কোরআন শরীফের কোথাও পরিমার্জন, পরিবর্তনের অবকাশ নেই। অবতীর্ণ হওয়ার সময় থেকেই ছিল না। তাই কোরআন শরীফ আজও অবিকৃত অবস্থায় বিশ্বমুসলিমের দৃষ্টি আর হৃদয়ে বিদ্যমান।

কোরআনের পরে আর কোন ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ হবে কি ?

প্রথমেই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে কোরআন শরীফের পর আর কোন ঐশীগ্রন্থ বিশ্ববাসীর জন্য আসবে না। এটিই সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ। বিশ্বমানবের জন্য পরিপূর্ণ জীবনবিধান রয়েছে কোরআন শরীফে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কে কোরআন শরীফ এক অতুলনীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে। মানবসভ্যতা, শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার এক বৈপ্লবিক বিধান দিয়েছে কোরআন শরীফ। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনকালের জন্য সুশৃঙ্খল, বিজ্ঞানভিত্তিক বিধান রয়েছে কোরআন শরীফে। তাই পবিত্র কোরআন শরীফ শুধুমাত্র ধর্মগ্রন্থ নয়—এটি একাধারে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনগ্রন্থও। এই গ্রন্থের বিধানগুলি সবই আল্লাহ্-প্রদত্ত এবং সেজন্যই অলঙ্ঘনীয়। একে মানুষ, রাষ্ট্র, আদালত কারও পরিবর্তন করার অধিকার নেই। তা করতে চাইলে তা হবে সীমালঙ্ঘনীয় অপরাধ ও পাপ। প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে আস্থাশীল ও বিশ্বাসী হতে হবে। পবিত্র কোরআন শরীফের বিধানে অবিশ্বাসী হলে সে নিজেও অবিশ্বাসীদের (কাফের) অন্তর্ভুক্ত হবে। তার কোন বক্তব্যই মুসলমানের বক্তব্য বলে গণ্য করা যাবে না। পবিত্র কোরআন শরীফের নির্দেশ অনুযায়ী ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি নেই। তাই যে পবিত্র কোরআন শরীফের বিধান অমান্য করতে চাইবে সে তৎক্ষণাৎ অমুসলমান বলে গণ্য হবে। তার যে কোন বক্তব্য মুসলমানদের জন্য অবশ্যই বর্জনীয় এবং তার বক্তব্যকে মুসলমান সম্প্রদায়ের বক্তব্য বলে গণ্য করা যাবে না।

পবিত্র গ্রন্থ কোরআনের উপর বিশ্বাস রাখার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বিশ্বাস রাখতে হবে যে এর পূর্বেও অনেক ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাও সত্য। ঐসকল গ্রন্থের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হওয়া মুসলমান মাত্রেরই দায়িত্ব।

ঘ. রসুলের বাণী হাদিস

হাদিস বলতে কি বোঝায় ?

মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবন যাত্রা ছিল একনিষ্ঠ ন্যায়নীতি নির্ভর ও আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। তাঁর কাছ থেকে দুরকম বাণী আমরা পেয়েছি। একটি আল্লাহ্‌র বাণী তাঁর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে তা হল ঐশীগ্রন্থ কোরআন শরীফ। আর তাঁর মুখ নিঃসৃত নিজস্ববাণী হল হাদিস শরীফ।

পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা, ইসলাম ধর্মের বিধি বিধান, আদেশ, নিষেধ, মানব জীবনের জীবন যাত্রার পথ-পদ্ধতি রীতি-নীতি কাজ-কর্ম বিষয়ে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যেভাবে এবং যা যা নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর সেই সকল মুখ নিঃসৃত বাণীই হল হাদিস শরীফ। হাদিস শরীফ চার রকম।

প্রথমতঃ যে সকল বাণী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) নিজে বর্ণনা করেছেন তা হাদিসে কাওলী বা বাক্য সূচক হাদিস। দ্বিতীয়তঃ অনেক কাজ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) নিজে করেছেন ও তাঁর সঙ্গীগণ বর্ণনা করেছেন সেগুলি হাদিসে ফেআলী বা কর্মসূচক হাদিস। তৃতীয়তঃ হযরতের অনেক সঙ্গী তাঁর উপস্থিতিতে বহু কাজ করেছেন যে কাজগুলিকে হযরত অনুমোদন করেছেন অথবা অনুরূপ কাজের জন্য তিনি কোন আপত্তি বা প্রতিবাদ ও নিষেধ করেননি, এগুলিকে হাদিসে তকরারী বা সমর্থন-সূচক হাদিস বলে। চতুর্থতঃ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) প্রকাশ্য ওহী ছাড়াও আল্লাহ্‌র বাণী সম্বলিত অনেক নির্দেশ পেয়েছেন যেগুলি হল হাদিসে কুদসী বা পবিত্র হাদীস।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় এই ধরণের বাণী বা হাদিস-গুলিকে একত্রিত বা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কারণ অনেকের শঙ্কা ছিল হয়ত কোরআনের বাণীর সঙ্গে তার সংমিশ্রন ঘটে যেতে পারে। পরবর্তী কালে বিভিন্ন ইমামগণ (ধর্মীয় নেতা) তা সংকলিত করেন। ইমাম মালেকই সর্বপ্রথম হাদিস সংকলন করেছিলেন। এরপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি

কঠোর পরিশ্রম করে বিশুদ্ধ হাদিস সংকলন করেছেন। তার মধ্যে যে ছয়খানি হাদিস গ্রন্থকে বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করা হয়েছে তা হল (১) ইমাম বোখারীর সংকলিত 'বোখারী শরীফ' (২) ইমাম মোসলেমের 'মোসলেম শরীফ' (৩) আবুদাউদ শরীফ (৪) তিরমিযি শরীফ ও (৫) এবনে মাজা ও (৬) নেসায়ী শরীফ। এই ছয় খানি হাদিস গ্রন্থে হুজরত হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এর সময় কাল থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে সকল হাদিস আছে তা সংকলিত হয়েছে। এগুলিকে বিশুদ্ধ হাদিস বলে প্রত্যেক মুসলমানের মান্য করা ও সেইমত কাজে পরিণত করা উচিৎ।

ঙ. সাহাবা বা সঙ্গীগণ

সাহাবা কারা?

যাঁরা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে থেকেছেন, ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আজীবন মুসলমান থেকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁরা হলেন সাহাবা। অসংখ্য লোক রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এসে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং মুসলমান থাকা অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন—এঁরাও সকলে সাহাবা। এঁদের মধ্যে বিভিন্ন পদমর্যাদা ও গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সাহাবাগণ সৎ ও পবিত্র পথে সম্পূর্ণভাবে সুন্নতের (রসুলের নীতির) নিয়মানুসারে জীবন যাপন করেছেন। তাঁরা কোন পাপ করেননি। তাঁরা মহান চরিত্রের ও গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা আকাশের নক্ষত্র রাজির মত উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তাঁদের চরিত্র সকলের অনুকরণীয়। হযরতের মৃত্যুর পর যে চারজন সাহাবা পর পর ইসলামের শাসন ভার গ্রহণ করে খলিফা নিযুক্ত হন তাঁরা হলেন (১) হযরত আবুবকর (২) হযরত ওমর (৩) হযরত ওসমান (৪) হযরত আলি। এই চারজনকে খোলাফায়ে রাশেদীন বা খলিফা চতুষ্টয় বলে।

চ. খোলাফায়ে রাশেদিন বা চারখলিফা

খোলাফায়ে রাশেদিন বলতে কি বোঝায় ?

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর ইহলোক ত্যাগের পর যাঁরা ইসলামী সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা, ধর্মীয় বিষয়গুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং হযরতের আদর্শ পালনের নীতি অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন খলিফা (প্রতিনিধি)। হযরতের মহাপ্রয়াণের পর হযরত আবুবকর (রাঃ)। কে মুসলমানগণ মুসলিম সাম্রাজ্য ও ধর্মীয় বিধানগুলির যথোপযুক্ত পরিচালনার জন্য সর্ব সম্মতভাবে খলিফা নিযুক্ত করেন। সে জন্যই তাঁকে ইসলামের প্রথম খলিফা বলা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ওমর দ্বিতীয় খলিফা নিযুক্ত হন এবং হযরত ওমরের মৃত্যুর পর হযরত ওসমান তৃতীয় এবং হযরত আলি চতুর্থ খলিফা নিযুক্ত হন। এই চারজন খলিফাকে একত্রে খোলাফায়ে রাশেদিন বলে।

ছ. ওলিআল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র সাধক

ওলি কে ?

ওলি এমন একজন মুসলমান যিনি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসুলের আদেশ নিষেধ পরিপূর্ণভাবে মেনে চলেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ আরাধনা, নামাজ রোজা তসবিহ পাঠের মধ্যে কাটান এবং সকল প্রকার পাপ অন্যায় ও অপরাধ থেকে বিরত থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সকল প্রকার পার্থিব ভোগ বিলাস ও জগৎ সংসার অপেক্ষা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসুলকে বেশী ভালবাসেন। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন।

ওলি ব্যক্তিগণকে সহজেই চেনা যায়। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয়ে সন্ত্রস্থ থাকেন, সর্বক্ষণ নামাম ও প্রার্থনার মধ্যে কাটান। তাঁদের হৃদয়ে সর্বক্ষণ আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসুলের প্রেম জাগরূক থাকে। তাঁদের জগৎ সংসারের প্রতি কোন মোহ বা আকর্ষণ থাকে না। তারা পরকালের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকেন।

জ. মোঅজেযা ও কারামাত

(অলৌকিক ও বিস্ময়কর বিষয় :)

মোঅজেযা কি ?

আল্লাহ্ তাআলা কোন কোন সময় তাঁর পয়গম্বর দ্বারা এমন এমন কার্য প্রদর্শন করান যা কোন সাধারণ সৃষ্ট জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। আর আল্লাহ্ পয়গম্বরদের দ্বারা এ সকল কাজ প্রদর্শন করান এজন্য যে সাধাবণ লোকজন তাঁদের এই সকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখে তাঁদেরকে পয়গম্বর বলে স্বীকার করে তাদের দেওয়া উপদেশ সমূহ গ্রহণ করবে।

পয়গম্বরদের দ্বারা কি ধরণের অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শিত হয়েছে ?

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় রসূল ও নবীগণ (পয়গম্বর) অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন। এগুলির মধ্যে কিছু বহুজন বিদিত ঘটনা আছে। যেমন : মুসা (আঃ)-এর লাঠি সাপে পরিণত হয়ে যাওয়া এবং যাদুকরদের সাপগুলিকে খেয়ে ফেলা। আল্লাহ্‌র কুদরতে নবী মুসার (আঃ) নীলনদীর উপর থেকে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং ফেরাউন ও তার বাহিনী সহ নীলনদের মাঝখানে সদলবলে ডুবে মরা।

হযরত ঈশা (যীশু) (আঃ) এর মোঅজেযাগুলির মধ্যে বিখ্যাত হল—তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন, অন্ধকে দৃষ্টি দান করেছেন, কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ লোকের দেহে হাত রাখতেই সে তা থেকে মুক্তি পেয়েছে, মাটির তৈরী পাখীর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে উড়িয়ে দিয়েছেন।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অলৌকিক কার্যগুলির মধ্যে কোরআন শরিফই একটি অলৌকিক বিষয়। এই গ্রন্থেই বলা হয়েছে 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে এর সুরার মত একটি সুরা তৈরী কর।' 'কিন্তু তা তোমরা পারবে না।' গত চৌদ্দ শত বছর যাবৎ গোটা পৃথিবীর কেউই এই চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে পারেন নি। গোটা বিশ্বে কারো পক্ষেই অনুরূপ কোন একটি আয়াত ও সুরা তৈরী করা সম্ভব হয়নি। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা হল সশরীরে মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ্‌র আরশ

বেহেশত দোযখ ইত্যাদি সবই দেখে আসেন এজন্য তিনি কোন যানবাহন ইত্যাদির সাহায্য নেননি, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অলৌকিক ক্ষমতা বলে সবকিছু দেখে আসেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং আদেশে সজ্ঞানে স্বশরীরে পবিত্র মক্কা শহর ছেড়ে বোরাক (এক বিশেষ ঐশ্বরিক যান)-এ চড়ে জেরুজালেমের বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে সপ্ত স্তর আকাশ পর্যন্ত সবকিছু দেখে আসেন। তিনি বেহেশত দোযখ ইত্যাদি পরিদর্শনের পর তাঁর যাত্রার স্থানেই ফিরে আসেন। এই ঘটনাকে মে'রাজ বলা হয়। তৃতীয় অলৌকিক ঘটনা হল আঙ্গুলের ইশারায় আকাশের চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা। একে শাক্কাল কামার বলে। তিনি কাফেরদের দাবী অনুযায়ী আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কাআবা ঘরের সন্নিকটে আবুকয়েস পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে এই অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছিলেন।

কারামত কি ?

কোন কোন সময় আল্লাহ্ তাঁর একান্ত ওলিকে এই সম্মানের অধিকারী করেন। আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ আরাধনায় আত্মনিয়োগকারী ও পার্থিব ভোগ-লালসা বিমুখ কিছু কিছু লোক এমন আশ্চর্য ঘটনা প্রদর্শন করেন যা সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এই সকল ঘটনা কারামত নামে অভিহিত হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ওলির এই সকল কাজ সৎ ও সুপথে আহ্বানের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মোঅজেযা ও কারামতের পার্থক্য কি ?

রসুল ও নবীত্বের অধিকারীগণ সাধারণের ক্ষমতার উর্ধ্বে যে সকল অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করেন তা হল মোঅজেযা ; আর ওলি, তাপস ও সাধকশ্রেণীর পুণ্যবান লোকজন সাধারণের ক্ষমতার উর্ধ্বে যে সকল আশ্চর্যজনক কার্য প্রদর্শন করেন সেগুলি কারামত। আবার কেউ ধর্মীয় পথে না থেকে, বিপথে থেকে যাদু বা বিশেষ কলাকৌশলের সাহায্যে অনেক বিস্ময়কর বিষয় প্রদর্শন করেন তাকে বলে এসত্তেদরাজ বা চাতুর্যপূর্ণ কাজ।

ঝ. মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী স্থান

১. কেয়ামত

কেয়ামত বা মহাপ্রলয় এবং হাসর বা শেষ বিচার কি?

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যখন শেষ বিচারের দিন এগিয়ে আসবে তখন নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ্‌র ফেরেশতা হযরত ইস্রাফিল (আ:) আল্লাহ্‌র নির্দেশে শিঙ্গায় (বিকট শব্দকারী বাঁশী) ফুঁ দিয়ে বিকট শব্দ করবেন আর সেই শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর জীব-জন্তু, পাহাড়-পর্বত সব কিছুই ঐ শব্দাঘাতে ধ্বংস হয়ে যাবে। কোথাও কোন জীবনের স্পর্শ থাকবে না। খসে পড়বে আকাশের তারকারাজি, তুলোর মত উড়ে যাবে পাহাড়-পর্বত। যা আছে আকাশ পৃথিবী আর তার মধ্যবর্তী অংশে সবই বিধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীর এই মহাপ্রলয়ের দিন নির্দ্ধারিত হয়ে আছে অনেক আগে থেকেই। সেই নির্দ্ধারিত দিন আসার পূর্বলক্ষণ হিসেবে পৃথিবীতে নানা ঘটনা ঘটতে থাকবে, আর তা থেকেই বোঝা যাবে কেয়ামত বা মহাপ্রলয় আগত। কেয়ামত ও শেষ বিচারের দিন আসার আগে পৃথিবীতে যে সকল নিদর্শন প্রকাশ পাবে বলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:) বলেছেন তা হল :

(১) পাপে ও অন্যায় অবিচারে ভরে উঠবে পৃথিবী।

(২) পৃথিবীর সর্বত্র বাবা-মাকে অমান্য করাটা স্বাভাবিক বলে গণ্য হতে থাকবে।

(৩) বিশ্বাসঘাতকতা করা ও গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাৎ করা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হবে।

(৪) সর্বত্র নাচ, গান, পান-ভোজন জাতীয় আনন্দোৎসবে বিভোর হয়ে উঠবে মর্ত্যবাসীগণ।

(৫) পরবর্তী বংশধরগণ তাঁদের পূর্ববর্তী বংশধরগণকে সর্ববিষয়ে অভিযুক্ত ও দায়ী বিবেচনা করতে থাকবেন।

(৬) অশিক্ষিত অনুপযুক্ত মূর্খ জনপ্রতিনিধির হাতে দেশের নেতৃত্ব চলে যেতে থাকবে।

(৭) রাখাল, জন-মজুরের অবস্থা এত পরিবর্তিত হবে যে তারা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করে মালিকানা ভোগ করতে থাকবে।

(৮) অনুপযুক্ত লোকজনই সবকিছুর দায়িত্ব বহন করবে এবং তারাই নেতৃত্ব করবে ও উচ্চ পদমর্যাদা পাবে।

এই সকল নিদর্শন সর্বত্র বহাল হওয়া থেকেই অনুমিত হবে যে কেয়ামত ও শেষ বিচারের সময় এগিয়ে আসছে।

পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পর হযরত ইস্রাফিল (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে দ্বিতীয় বার সিঙ্গা বাজাবেন। এইবার সবকিছুই আবার তার স্বস্ব অবস্থায় ফিরে আসবে এবং সকলে এক মহাপ্রান্তরে (হাসরের ময়দান) হাজির হবে। এরপর প্রত্যেককে পৃথিবীতে ও তার জীবদ্দশার কৃতকর্মের জবাবদিহির জন্য বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হতে হবে। আল্লাহ্‌তাআলা হাসরের ময়দানে সকলের পুনরুত্থান ঘটিয়ে তাদের কার্যকলাপের বিচার করে পাপ পুণ্যের পুরস্কার দেবেন। কৃতকর্ম অনুযায়ী মানুষ দোযখ ও বেহেশতের জীবন ভোগ করবেন।

সারা পৃথিবীতে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলার জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ বিধান আছে। যাঁরা আল্লাহ্‌র বিধান সম্পর্কে বিশ্বাস করবে, এক আল্লাহ্‌র আরাধনা করবে, রসুল ও নবীগণকে স্বীকার করবে, আল্লাহ্‌র বাণীকে অমোঘ জানবে, আল্লাহ্‌র ফেরেশতা, কেয়ামত, শেষ বিচারের দিন, তকদির ইত্যাদির উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী কাজ করে যাবে তারা তাদের কাজের পুরস্কার পাবে। আর যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যকে শরিক করেছে, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও সৎকাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকে পার্থিব জীবনে ভোগবিলাসের মধ্যে কাটিয়েছে তাদের শাস্তির বিধান দেওয়া হবে। হাসরের ময়দানে প্রত্যেকের কৃতকর্ম সম্বলিত কর্মতালিকা দেওয়া হবে। সৎ ও পুণ্যবানগণের ডান হাতে এবং অসৎ ও পাপিষ্ঠদের বাম হাতে তাদের আমল নামা (কর্মতালিকা) দেওয়া হবে। সূর্য একেবারে নীচে নেমে আসবে। কোথাও একবিন্দু ছায়া থাকবেনা। শুধুমাত্র সৎ ও পুণ্যবানগণ আল্লাহ্‌র আরশের ছায়া ভোগ করবেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সেদিন তার অনুগামী সৎ ব্যক্তিবর্গকে 'হাওজেকাওসর' থেকে পানি পান করাবেন।

এই দিনে সকলের পাপ পুণ্য তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা হবে, এরপর নিজ কর্ম অনুযায়ী পুলসেরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অবশিষ্টগণ পুলসেরাত পার হতে পারবেনা, দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

২. জান্নাত বা স্বর্গ

জান্নাত বলতে কি বোঝায় ও সংখ্যা কটি ?

জান্নাত আরবী শব্দ। জান্নাত শব্দের অর্থ উদ্যান, সুসজ্জিত উদ্যান, চির সুখ শান্তির স্থান। ফারসীতে বলে বেহেশত। এই জান্নাত বা স্বর্গে শোক, দুঃখ ও কষ্টের লেশমাত্র নেই। সুসজ্জিত মনোমুগ্ধকর বাগান, অসংখ্য সুমিষ্ট ফলের গাছ। নীচে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী ঝরণা। মানুষের সকল রকম সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থা রেখে আল্লাহ্‌তাআলা সৃষ্টি করেছেন এই জান্নাতকে। জান্নাতে চির বসন্ত বিদ্যমান। সকলেই সেখানে চির যৌবনের অধিকারী। সেখানে জীবনসঙ্গীনি হিসাবে রয়েছে আয়ত চোখ ও নিমীলিত নয়না হুরগণ। জান্নাতের ভোগবিলাস সবই হবে তৃপ্তিদায়ক। জান্নাতে মানুষ সর্বাধিক তৃপ্তি পাবে তার সৃষ্টিকর্তার সাক্ষাৎ পেয়ে, জান্নাতে ইচ্ছানুসারে আহার করতে পারবে, কোনভাবেই কারো উপর নির্ভরশীল হতে হবে না। এখানকার তৃপ্তি এত অনন্য যে পৃথিবীবাসী হিসাবে মানুষের পক্ষে তা কল্পনা করা সম্ভব নয়। যে সকল নর-নারী আল্লাহ্‌র আদেশ, নিষেধ পালন করে সৎ ভাবে জীবন যাপন করবেন তাঁরা এই জান্নাতের অধিবাসী হয়ে চির সুখ ও শান্তি ভোগ করতে থাকবেন। এরকম আটটি জান্নাত আছে। যথা: (১) জান্নাতুল খোলদ, (২) দারুস সালাম, (৩) দারুল কারার, (৪) জান্নাতুল আদান। (৫) জান্নাতুল মাওয়া, (৬) জান্নাতুন্ নায়ীম, (৭) ইল্লীয়ুন, এবং (৮) জান্নাতুল ফেরদাউস।

৩. জাহান্নাম বা নরক

জাহান্নাম বলতে কি বোঝায় ও সংখ্যা কটি ?

জাহান্নাম আরবী শব্দ। জাহান্নাম অর্থ জ্বলন্ত অগ্নি। জাহান্নামকে

ফারসী ভাষায় দোযখ বলে। ফারসী দোযখ শব্দের অর্থ চরম অশান্তির স্থান। যারা পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগবিলাসে বিভোর হয়ে নানা পাপাচারে লিপ্ত থাকে, আল্লাহ্ এক বলে স্বীকার করে না, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণকে এবং তাঁদের প্রচারিত বিধি বিধানকে সত্য বলে পালন করে না তারা এই অগ্নিময় স্থানের বাসিন্দা হবে। এখানে সর্বত্র নানাবিধ কঠিন ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, গভীর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, রক্ত পুঁজ জাতীয় অত্যন্ত দুর্গন্ধময় তপ্ত তরল পদার্থ রয়েছে যাতে নিক্ষিপ্ত হবে পাপাত্মা ব্যক্তিগণ। বিষধর সর্পসকল ও অসংখ্য যন্ত্রণা দায়ক বিছা সদা দংশনে উদ্যত আছে। ঐ সকল পাপাচারীকে তারা বিরামহীন ভাবে দংশন করতে থাকবে আর তারা অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকবে। কিন্তু তা থেকে মুক্তি পাবে না। পাপের পরিমাণ শাস্তি পেতেই হবে। কেউ কেউ দুর্গন্ধময় উত্তপ্ত তরল পদার্থে হাবুডুবু খেতে থাকবে। কিন্তু এখানে কারো মৃত্যু নেই, কারো পাপের পরিমাণ যন্ত্রণা ভোগের পূর্বে মুক্তি নেই, আর অবিশ্বাসী ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার করেছে, নানা দেব-দেবীর আরাধনা করেছে তারা পরকালের জীবনে অনন্তকালব্যাপী ঐ কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে থাকবে, তা থেকে কখনই তাদের মুক্তি হবে না। এই নরক কুণ্ডের এক বিন্দু পরিমাণ দুর্গন্ধ পানীয় যদি পৃথিবীতে ফেলা হয় তা হলেই সমগ্র পৃথিবীবাসী এর দুর্গন্ধে পাগল হয়ে যাবে। জাহান্নামের সংখ্যা সাতটি (১) লাযা, (২) সাককার, (৩) সাঈর, (৪) হোতামা, (৫) জাহীম, (৬) জাহান্নাম, ও (৭) হাবিয়া। পাপের গুরুত্ব অনুপাতে এক একজন এক এক শ্রেণীর জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। কারণ এর কোনটি অগ্নিকুণ্ড, কোনটি তীব্র দুর্গন্ধময় গলিত পদার্থ, কোনটি উত্তপ্ত জলরাশি ইত্যাদিতে পূর্ণ।

৪. তকদির বা কপাল (ভাগ্য)

তকদির কাকে বলে?

গোটা মানব সম্প্রদায়ই বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টির আহার্যদাতা। সমগ্র সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় সংঘটিত হওয়ার পদ্ধতির

নির্ণয় কর্তা। কোন সৃষ্ট জীবই নিজের ইচ্ছায় কিছুই করতে পারে না। মান, ইজ্জত, অবমাননা, ধন, দৌলত, বিষয়, সম্পত্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবন, মৃত্যু সবই আল্লাহ্ মানুষের জন্য নির্দ্ধারিত করে দেন। আর প্রত্যেকের জন্য এই নির্দ্ধারণ করা বিষয়টিই ঘটতে থাকে আর তাই হল তার তকদির। এই তকদিরে আস্থা রাখা ও বিশ্বাস রাখা ঈমান বা বিশ্বাসের অঙ্গ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইসলাম ধর্মের বিধানে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ

ইসলাম ধর্মের নিয়মানুসারে মানুষের ক্রিয়াকর্মের জন্য আট রকম বিধান আছে। যথা: ১. ফরজ ২. ওয়াজিব ৩. সুন্নত ৪. মুস্তাহাব ৫. হারাম ৬. মাকরূহ তাহরিমি ৭. মাকরূহ তানযিহ ৮. মোবাহ।

১. ফরজ বা অবশ্য পালনীয়

ফরজ কি?

ফরজ হল এমন এক পবিত্র ধর্মীয় বিধান যা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'ফরজ' আল্লাহ্‌র হুকুম। ফরজ কাজের নির্দেশ পবিত্র কোরআনে লিখিত রয়েছে। ইসলামের বৈধ ব্যতিক্রম নীতির বাইরে যে কেউ এই ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কাজ করবেন না তাঁকে 'ফাসেক' বলে গণ্য করা হবে। আর যিনি এই ফরজ বা অবশ্য পালনীয় বিধানকে অস্বীকার করবেন তিনি কাফের বা অবিশ্বাসী বলে গণ্য হবেন। অর্থাৎ ইসলামের অনুসারি নয় বলে গণ্য হবেন।

ফরজকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

ফরজ দুভাগে বিভক্ত। যথা—

১. ফরজে আইন ২. ফরজে কেফায়া।

১. 'ফরজে আইন' হল সেই অবশ্য পালনীয় বিধান যা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। ইসলাম ধর্মের অনুমোদিত কারণ ছাড়া কেউ এ আইন পালন না করলে কঠিন শাস্তির অধিকারী হবেন এবং চরম অপরাধী গণ্য হবেন। আর ফরজ পালন না করলে তাঁকে 'ফাসেক' বলে গণ্য করা হবে। যেমন সালাত (নামায) প্রতিষ্ঠা করা, সিয়াম বা (রোযা) পালন করা, সমর্থ ব্যক্তিদের যাকাত দেওয়া এবং ধনশালীদের হজ্ব করা ফরজে আইন।

২. 'ফরজে কেফায়াও' বাধ্যতামূলক ভাবে পালনীয় বিধান। তবে কিছু বিধান আছে যা সমষ্টিগত বা ব্যক্তিগত ভাবে পালন করা যায়। অর্থাৎ যে সকল বিধান পালনে যৌথভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব আছে তা হল ফরজে কেফায়া। এইগুলি সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত। সমগ্র সম্প্রদায়ের তরফে যে কেউ এই দায়িত্ব পালন করলে সকলেরই দায়িত্ব পালিত বলে গণ্য হয়। কিন্তু কেউ পালন না করলে সকলকেই অপরাধী হতে হয় এবং সমস্ত সম্প্রদায় শাস্তিযোগ্য পাপ কাজের জন্য অপরাধী বলে গণ্য হবে। যেমন সালাতুল জানাযা বা জানাযার নামায, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ ইত্যাদি।

২. ওয়াজেব

ওয়াজেব বলতে কি বোঝায়?

ওয়াজিব হল এক পবিত্র বিধান যা পালন করা বাধ্যতামূলক এবং এ বিধান পবিত্র কোরআনে দ্ব্যর্থবোধক (দলিলে যান্নি) অর্থ দ্বারা প্রমাণিত ও উল্লিখিত। এই প্রমাণও খুবই জোরদার। 'ফরজ'-এর সঙ্গে এর পার্থক্য সামান্যই। এই বিধান পালন না করলে বা পালনে অবহেলা করলে কঠিন শাস্তিযোগ্য পাপ হবে। এবং অবহেলাকারীকে 'ফাসেক' বলে গণ্য করা হবে। দুই ঈদের নামায ও বেতেরের নামায হল ওয়াজেব বা একান্ত পালনীয়।

৩. সুন্নত

সুন্নাত বলতে কি বোঝায় ?

যে সকল কাজ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ (সাহাবাগণ) পালন করেছেন এবং তাঁর অনুসারী ও অনুগামীদের (উম্মতদের) পালনের নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি সুন্নত। সুন্নত দু'রকম ১. সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ ২. সুন্নাতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ।

১. সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ্ কি ?

সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ হল, যে সকল কাজ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ নিয়মিত পালন করেছেন এবং তাঁর উম্মতদের পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা সঙ্গত কারণ ছাড়া কখনও পরিত্যাগের বিধান নেই তা হল সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ। যে কেউ এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি পালন করবেন না বা ক্রমাগত তা পালনে অবহেলা করবেন তাঁকে 'ফাসেক' বলে গণ্য করা হবে। যেমন ফজরের ফরজ নামাযের আগের দু রাকাত সুন্নত, জোহরের ফরজ নামাযের আগের চার রাকাত ও পরে দু রাকাত সুন্নত, মাগরিবের ফরজের পর দু রাকাত সুন্নত, নামায ইত্যাদিগুলি সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ বা অবশ্য পালনীয় সুন্নত।

২. সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ্ কি ?

যে সকল কাজ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ পালন করেছেন, কিন্তু কখনও কখনও তা পালনে বিরত থেকেছেন বা পালন করেননি সেগুলি সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ। এগুলি পালন করলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয় কিন্তু পালনে বিরত থাকলে কোন শাস্তিযোগ্য পাপ হয়না। যেমন আসরের ও এশার ফরজ নামাযের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত নামায আদায় করা ইত্যাদি।

৪. মুস্তাহাব বা অতিরিক্ত পালনীয়

মুস্তাহাব কি ?

যে সকল কাজ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ কখনো

কখনো করেছেন আবার কখনো কখনো করেননি এবং অন্যকে নির্দেশও দেননি সেগুলি মুস্তাহাব। এই কাজগুলি করলে পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং না করলে কোন অপরাধ গণ্য হয়না। যেমন নফল নামায।

৫. হারাম বা নিষিদ্ধ

হারাম কি ?

যে সকল কাজ পবিত্র কোরআন ও হাদিস এবং হযরত ও তাঁর সাহাবাগণ কর্তৃক সুস্পষ্ট প্রমাণের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে তাই হারাম বা অবৈধ। যেমন আল্লাহ্ ছাড়া কারো উপাসনা করা, মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, লুঠ করা, গচ্ছিত সম্পদ ভক্ষণ করা, ব্যভিচার করা, মানুষকে হত্যা করা, মদ্যপান করা ইত্যাদি। হারাম বা অবৈধ কাজগুলির প্রস্তুতিতে বা কাজে যুক্ত থাকলে তাঁকে 'ফাসেক' এবং যিনি হারামকে বৈধ বলে গণ্য করেন এবং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে হারাম কাজ থেকে বিরত হন না তাঁকে কাফের (অবিশ্বাসী) বলা হয়।

৬. মাকরূহ বা নিষিদ্ধ পর্যায়

'মাকরূহ্' কি ?

যে সকল কাজ অবাঞ্ছনীয় ও নিষিদ্ধের মত গণ্য হয় এবং ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করা হয় সেগুলি হল 'মাকরূহ'। মাকরূহ দু'রকম—(১) মাকরূহ তাহরিমী (২) মাকরূহ তানযিহ।

মাকরূহ তাহরীমি কাকে বলে ?

যে সকল কাজ নিষিদ্ধ এবং হারামের কাছাকাছি এবং যা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য তাকে মাকরূহ তাহরীমি বলে। মাকরূহ তাহরীমি কাজগুলি নিষিদ্ধ বলে সহী (সঠিক) প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। যাঁরা এইসকল কাজ করেন বা এই নিষিদ্ধগুলি অগ্রাহ্য করেন তাঁদের 'ফাসেক' বলে গণ্য করা হয়। যেমন সোনা বা রূপার পাত্রে আহার করা, পুরুষের রেশমী কাপড় পরা, কেঁচো খাওয়া ইত্যাদি।

মাকরূহ তানযিহী কাকে বলে ?

যে সকল কাজ প্রায় হালালের কাছাকাছি। এগুলি না করলে সওয়াব হয় কিন্তু করলে কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বা পাপ হয়না। তবে মাকরূহ তানযিহীকে সম্পূর্ণ হালাল গণ্য করা হলে বা বার বার তা করতে অভ্যস্থ হয়ে গেলে অবশ্যই তা অপরাধ বলে গণ্য হবে। যেমন—কাঁচা পিয়াজ খাওয়া, আসরের নামায শেষ সময়ে পড়া।

৭. হালাল বা বৈধ

হালাল কি ও কাকে বলে ?

যে সকল কাজ পবিত্র কোরআন ও হাদিস-এর দ্বারা অনুমোদিত এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ (সাহাবাগণ) পালন করেছেন ও করার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি হালাল বা বৈধ, অনুরূপ কাজগুলিকেই হালাল বলে। যেমন—নিজের প্রয়োজনগুলি নিজে করা, সকলের সঙ্গে সংব্যবহার করা, বিবাহ করা, যে কোন প্রাণীকে না মেরে জবাই করা। এককথায় সবরকম সৎ, মঙ্গল ও কল্যাণকর কাজ করা এবং সমাজবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনে সৎ ও মঙ্গলজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হালাল বা বৈধ।

৮. মোবাহ

'মোবাহ' কি ?

কতকগুলি কাজ আছে যেগুলি করলে বা না করলে নিজের বা সমাজের কারো কোন ক্ষতি হয়না তাকে 'মোবাহ' বলে। এরকম কাজের জন্য পাপ বা পুণ্য কিছুই হয়না। যেমন—নিজেকে সবসময় সুসজ্জিত রাখা, ভাল ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা, অত্যন্ত ভাল বা খারাপ অথচ বৈধ খাদ্য ভক্ষণ করা ইত্যাদি। অন্যভাবে বলা যায় অনুরূপ কাজগুলি প্রায় বৈধ বা হালালের কাছাকাছি।

৯. বেদাআত

বেদাআত কাকে বলে ?

যে সকল ধর্মীয় কাজকর্ম হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর সঙ্গীগণ বা

তৎপরবর্তীগণের সময়কালে প্রচলিত ছিলনা এবং তাঁরাও তা করেননি কিন্তু বর্তমান সমাজে নতুনভাবে তা প্রচলিত হচ্ছে বা বহুলোক ধর্মীয় নিয়মের মত পালন করছেন সেগুলিকে বেদাআত বলে। বেদাআত দু'রকম। যথা—
১. বেদাআতে হাসানা ও ২. বেদাআতে সাইয়েআহ।

১. **বেদাআতে হাসানা:** সমাজ-ব্যবস্থা ও সমাজ উন্নয়ন সর্বদাই পরিবর্তনশীল। এই সকল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চলা-ফেরা, আচার-আচরণ, প্রয়োজন, জীবন-জীবিকা সবেরই পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই ধর্ম প্রচারের, প্রসারের এবং প্রতিষ্ঠিত ও উজ্জীবিত রাখার প্রয়োজনে ন্যায়নীতি-নিষ্ঠ বহু উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। সেগুলিকে বেদাআতে হাসানা বলে। যেমন—স্কুল কলেজ স্থাপন করা, ওয়াজ-নসিহতের (উপদেশের) সভা আহ্বান করা, মসজিদে বেতনভুক্ত ইমাম ও মোয়াজ্জেন নিয়োগ করা ইত্যাদি।

২. **বেদাআতে সাইয়েআহ:** যে সকল কাজ সমাজের ও ইসলামের জন্য ক্ষতিকর তাকে বেদাআতে সাইয়েআহ বলে। যেমন মহররমকে কেন্দ্র করে তাজিয়া করা, কবরে ফুল, ধূপ, চাদর, সিন্নি ও মোমবাতি দেওয়া, পীরের নামে মানত করা, বিয়ের জন্য সময় ক্ষণ ইত্যাদিকে বিশেষ শুভজ্ঞানে নির্দিষ্ট করা ইত্যাদি। এই সকল কাজের জন্য গোনাহগার হতে হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইসলামী শরীয়ত

ইসলামী শরীয়ত কাকে বলে ও তা দ্বারা কি বোঝায়?

শরীয়ত কথার আভিধানিক অর্থ হলো মেনে চলার সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা বা বিধান। ধর্মীয় অর্থ ইসলামী জীবন-বিধান। শরীয়ত হলো মানব সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বিধান যা মানব কল্যাণে ইসলাম অনুসারীদের জন্য

আল্লাহ্ অলঙ্ঘনীয়ভাবে অবশ্য পালনীয় করেছেন। শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো সৎপথে পরিচালিত হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে জীবন গঠনের দ্বারা মানুষের নৈতিক উন্নতি বিধান। এই বিধান দ্বারা মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা হয় অত্যন্ত সফল ও কল্যাণকর পদ্ধতির মাধ্যমে। এই বিধান অমান্য করা একাধারে যেমন পাপ অপর দিকে তেমনই সামাজিক অপরাধ।

"শরীয়ত হলো ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আচরণের এক অবশ্যপালনীয় অভ্রান্ত বিধান।" মানুষের সমগ্র জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট বিধিবদ্ধ নিয়ম। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে শরীয়ত হলো "দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদিস কথিত জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ পার্থিব জীবনে সঠিকভাবে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে এবং পরকালের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।" 'কোন্‌টি বিধিসম্মত ও কোন্‌টি পরিত্যাজ্য তার পার্থক্যকারী বিশেষ পন্থাকেই শরীয়ত' বলে কোন কোন পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন।

শরীয়ত হলো অধিকার প্রাপ্তির ইসলামী নীতি শাস্ত্র এবং শাস্ত্রীয় বা ঐশ্বরিক আদেশ ও নিষেধের বিধান। মুসলিম জনগণের ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপূর্ণ জীবনবিধান নির্দ্ধারণ করে শরীয়ত। মানুষের ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ যাবতীয় দায়িত্ব ও অধিকারকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। ১. আল্লাহ্‌র অধিকার ২. ব্যক্তিগত অধিকার ৩. সাধারণ মানুষের অধিকার ৪. সমগ্র সৃষ্ট জীবের অধিকার।

১. আল্লাহ্‌র অধিকার

শরীয়তের বিধানে আল্লাহ্‌র অধিকার কি ?

প্রথমতঃ, মানুষকে আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন এজন্য যে, সে একমাত্র এক আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর আরাধনা করবে। এ বিশ্বাস একটি বিশেষ বাক্য দ্বারা নির্দ্ধারিত করা হয়েছে যেমন—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। দ্বিতীয়তঃ, একান্ত আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌কে পরিপূর্ণ-

ভাবে সৃষ্টিকর্তা বলে গ্রহণ করা ও তাঁর নির্দেশকে অমোঘ জানা। তৃতীয়তঃ, মানুষের উচিত আল্লাহ্‌কে সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রশ্নাতীতভাবে মান্য করা। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন ও জীবনযাত্রার পথ পবিত্র কোরআন ও হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নীতির দ্বারা নির্দ্ধারণ করা দরকার। চতুর্থতঃ, আল্লাহ্‌র আরাধনা ও প্রার্থনা একটি অবশ্যকরণীয় কাজ। নিজের প্রয়োজন, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ, বিলাস বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্‌র আরাধনা, উপাসনা ও প্রার্থনা করা আল্লাহ্‌র কাম্য। যাবতীয় লোভ, লালসা, আত্মতৃপ্তি ত্যাগ করে চরম ধৈর্য ও সংযমের পরীক্ষাদানের জন্য একমাস রমজানের রোযা রাখা। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে এটা প্রতিষ্ঠা করা যে মুসলমানের জন্য সবকিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর আস্থা ও তাঁরই জন্য ত্যাগের মানসিকতা হলো আল্লাহ্‌র প্রিয়। হজ্ব করার মধ্য দিয়ে ধনশালী তার ধনসম্পদ খরচ করবে। এইভাবে আরাধনাও মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার।

২. ব্যক্তিগত অধিকার ঃ

শরীয়তে ব্যক্তিগত অধিকার কাকে বলে ?

ব্যক্তিগত অধিকার বলতে শরীয়তী অর্থে (ক) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (খ) সম্মানের সুরক্ষা। (গ) বস্তুগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা (ঘ) অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে সুরক্ষা (ঙ) সম্পত্তির অধিকারের সুরক্ষা (চ) নীতিনিষ্ঠ কাজে সুরক্ষার অধিকারকে বোঝায়। (ছ) অধিকৃত বা প্রাপ্ত বস্তু বা সম্পত্তির অধিকার।

৩. অন্যের অধিকার ঃ

ইসলামী শরীয়তে অন্যের অধিকার কাকে বলে ?

ইসলাম ধর্ম স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই শরীয়তের লক্ষ্য হলো সমগ্র ভাবে মানবকল্যাণ এবং এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন। সেইহেতু এখানে ব্যক্তিগত অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক অধিকারও স্বীকৃত। সামাজিক ভাবে একের অন্যের প্রতি অধিকার, রাষ্ট্রের কাছে এবং সমগ্র

মানব জাতির কাছে অবশ্যই অন্যান্যের বিশেষ পারস্পরিক অধিকার থাকবে। কোনভাবেই একজনের অন্যের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। ইসলাম ধর্ম সম্পূর্ণ ভাবে চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, জালিয়াতি, ধোকাবাজী, ঠকবাজী, সুদ নেওয়া বা এই জাতীয় এমন সকল কাজ যা দেশবাসীর বা অন্য লোকের পক্ষে ক্ষতিকারক তা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। এছাড়া, জুয়া, লটারী বা এ ধরনের অদৃষ্টবাদী খেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে ইসলামী শরীয়ত স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে। একচেটিয়া কারবার, খাদ্যবস্তু সহ যে কোন সামাজিক প্রয়োজনীয় জিনিষ গুদামজাত করা, কালোবাজারী করা ইত্যাদি ব্যক্তিগত লাভালাভ জাতীয় ব্যবসা শরীয়ত সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ ও অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে।

নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা, যৌনাচার, নারীপুরুষের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক, সমকামিতা, নারীদের দেহ ব্যবসা ইত্যাদিকে সম্পূর্ণ এবং সুকঠিন ভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং এধরনের কাজ জনস্বাস্থ্যহানিকর ও সামাজিক অভিশাপ বলে ঘোষণা করেছে ইসলাম ধর্মের শরীয়তী বিধান। ইসলামী বিধানে পুরুষের উপর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা-মাতার ভরণ পোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে এবং সংসার নির্বাহ, গৃহকর্মবিষয়ক, সন্তান সন্ততিদের লালন-পালন, বাল্যশিক্ষা, চরিত্র গঠন এবং স্বামীপুত্র পরিজনের সুখ-শান্তি বিধানের জন্য পারিবারিক ও সাংসারিক নীতি নির্দ্ধারণের দায়িত্ব ভার অর্পিত হয়েছে নারীদের উপর। শিশু কিশোরদের জন্য অভিভাবক, পিতা-মাতা ও গুরুজনদের মান্য করার নীতি নির্দ্ধারণ করেছে ইসলাম।

শরীয়ত মানুষকে তার প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, দেশবাসীকে সম্মানের সঙ্গে সহযোগিতার বিধান সুনির্দ্দিষ্ট করেছে। শরীয়ত গোপন ধন সম্পদ সঞ্চয়কে অবৈধ ঘোষণা করেছে এজন্য যে, এর ফলে আত্মীয় পরিজন ও দেশবাসীবৃন্দকে নানা দুর্দশা ও ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়। শরীয়ত প্রত্যেকের জন্য এই বিধান নির্দিষ্ট করেছে যে—প্রত্যেকেই নিজ নিজ আত্মীয় বন্ধু, অধিনস্ত কর্মী এবং দেশ ও বিদেশের নাগরিকদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এবং পরস্পরের মঙ্গলের জন্য প্রতিযোগিতা করবে।

ইসলাম ধর্ম মনে করে কোন মানুষই শুধুমাত্র একটি সংসারের সদস্য নন বরং তিনি সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্বজগতের একজন সদস্য। জাতীয় ঐক্য, মানব ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব, সংস্কৃতি, বিশ্বমানব কল্যাণ ও উন্নতির দায়িত্ব সম্পূর্ণ-ভাবে সকল মানব গোষ্ঠীর। ইসলাম বিশ্বমানব গোষ্ঠীকে একটি পরিপূর্ণ পরিবার গণ্য করে থাকে। প্রত্যেক মুসলমানকেই সামাজিক বিবাদ বিসম্বাদ, পরস্পর শত্রুতা ও একে অপরের অকল্যাণ করা ও কামনা করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। ইসলাম ধর্মের এই সকল বিধিবদ্ধ বিধান ও পন্থাগুলি হল শরীয়ত। শরীয়তের শিক্ষা হল একজন মুসলমানকে সৎ আদর্শবান, চরিত্রবান থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে এক আল্লাহ্‌র উপর আস্থাশীল হয়ে সমাজের কাছে আদর্শ হিসাবে নিজেকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে সমগ্র জন মানব তার দ্বারা ইসলামী শরীয়তের অমোঘ বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এইগুলি হল মোটামুটি শরীয়ত অনুযায়ী মানুষের করনীয় ও পালনীয় পন্থা এবং বিধান। বিধান অমান্য করলে মহাপাপী, আল্লাহ্‌র আদেশ লঙ্ঘনকারী ও সীমা লঙ্ঘনকারী হিসাবে চিহ্নিত হবে।

৪. সমগ্র সৃষ্টির অধিকার

শরীয়তে সৃষ্টির অধিকার কাকে বলে ?

ইসলাম ধর্মের বিধান হল আল্লাহ্‌ মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট জীব হিসাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং অবশিষ্ট সমগ্র সৃষ্টিকেই মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন। তাই মানুষকে ঐ সকল সৃষ্ট জীব ও বস্তুর ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। সকল সৃষ্টজীবের নিজের জগত আছে এবং তাদেরও সুনির্দিষ্ট অধিকার আছে। ইসলামের বিধানে কোন সৃষ্টির অধিকারকে লঙ্ঘন করে মানুষকে তা ভোগ করার অধিকার দেয় না। অন্যায়, অবৈধ ও অপ্রয়োজনীয় ভাবে কোন সৃষ্ট জীব ও বস্তু ইত্যাদিকে কষ্ট দেওয়া অথবা তাদের ক্ষতি ও অপচয়কে নিষিদ্ধ করেছে। যেমন ইসলাম অহেতুক কোন পাখীকে তার স্বাধীন অধিকার উড়ে বেড়ান থেকে বঞ্চিত করে খাঁচায় আবদ্ধ করা অনুমোদন করে না, তেমনি আবার

অপ্রয়োজনে বৃক্ষের ছেদন কর্তনকেও অন্যায় এবং পাপ বলে ঘোষণা করেছে। মানুষকে বৃক্ষের ফলভোগের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে কিন্তু অপ্রয়োজনে যথেচ্ছভাবে তার অঙ্গছেদন বা কর্তনের অনুমতি দেয় না। এই ভাবে ইসলাম ধর্মে সকল সৃষ্ট জীবের ও বস্তুর অধিকারকে সুরক্ষার জন্য বিশেষ বিধান নির্দ্ধারণ করেছে। আর সেই সকল বিধানকেই বলা হয় শরীয়ত। তা লঙ্ঘন করলে অপরাধ ও আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করার মতই গণ্য হবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফেকাহ বা আইনশাস্ত্র

ফেকাহ কাকে বলে ?

ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণ ব্যবহার শাস্ত্রকে ফেকাহ বলে। ফেকাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'বোধশক্তি' 'বুদ্ধিমত্তা' ও তথ্য। পবিত্র কোরআন, হাদিস অধ্যয়ন করে বিশেষ ধীশক্তি প্রয়োগ করে তার সঠিক অনুধাবন দ্বারা একটি বিশেষ ব্যবহার শাস্ত্র তৈরী হয় আর তাকেই ইসলাম ধর্মে ফেকাহ বলে অ্যাখ্যা দেওয়া হয়। শরীয়ত হল আল্লাহ্‌ ও তাঁর প্রেরিত পয়গম্বরের দেওয়া নির্দ্ধারিত পন্থা আর ফেকাহ হল মানবের চেষ্টায় ও জ্ঞানে পবিত্র কোরআন হাদিস থেকে সংগৃহীত নৈতিক বিধি সম্মত শাস্ত্রানুগ পন্থা।

মুসলিম আইন ও নীতির উৎস কি ?

ইসলামী আইন ও নীতির উৎস হল :—

(১) পবিত্র কোরআন (২) হাদিস শরীফ (৩) ইজমা, (৪) কেয়াস ও (৫) ইজতেহাদ।

পবিত্র কোরআন ও হাদিস বিষয় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বাকিগুলির পরিচয় পরপর দেওয়া হল :

১. ইজমা ঃ

'ইজমা' কথার তাৎপর্য কি ও ইজমা দ্বারা কি বোঝায় ?

ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস হল **ইজমা**। ইজমা শব্দটি জমআ শব্দ থেকে গৃহীত যার আভিধানিক অর্থ হল সংগৃহীত বা একত্রিত করা। যে সকল বিষয় বিচ্ছিন্ন ও অগোছাল আছে তাকে বিশেষ মতবাদ অনুযায়ী একত্রিত ও সুসংবদ্ধ করাকেই ইজমা বলে। মুসলিম শাস্ত্রবিদগণের ব্যবহৃত ইসলামী পরিভাষা 'ইজমা' অর্থ হল হজরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর সঙ্গী বা সাহাবাগণের একত্রিভূত মতবাদ। আইনের নির্দ্ধারণ ক্ষেত্রে ইসলামী সমসাময়িক যুগের ব্যবহার শাস্ত্রবিদ ও আইনপ্রণেতাদের একমত হওয়া ইসলামী আচরণ বিধিই হল ইজমা।

ইজমা, বিশেষজ্ঞ মুসলিম পণ্ডিত ও সাহাবাদের সর্বসম্মত গৃহীত নীতি। সাহাবা ও ইমামগণ সর্বসম্মত ভাবে এই নীতিগুলিকে অনুমোদিত বিশ্বাস এবং করণীয় বিষয় বলে গণ্য করেছেন। এবং এগুলিকে সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্ধারিত নীতি হিসাবে সাহাবাগণ নির্দ্ধারণ করেছেন। আবার ব্যাপক অর্থে সর্বসাধারণের মতবাদের গৃহীত নীতি হচ্ছে ইজমা। যে কোন ব্যক্তিগত মতই এখানে অগ্রাহ্য যদি না তা সকল ইসলাম বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী এবং ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীদের যৌথ ও ঐক্যমত হওয়া সিদ্ধান্ত হয়।

ইজমা তিনটি পদ্ধতির দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়েছে যথা ঃ (১) 'কাওল' বা বাক্য—বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে যখন কোন 'মোজতাহিদ' বা ইসলাম বিশেষজ্ঞ সাহাবাগণ তাঁদের মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন (২) 'ফেঅল' বা কার্য—যখন কোন ব্যবহারিক কাজের জন্য মোজতাহিদগণ একমত হয়েছেন (৩) 'সকুত' বা নিরবতা—অর্থাৎ যখন কোন বিষয় মুজতাহিদগণ কারো কোন বক্তব্য ও আচরণের উপর কোন মন্তব্য না করে চুপ থেকেছেন।

ইজমাকে দু ভাগ করা যেতে পারে। যেমন 'আযমাত' এবং 'রুখসাত'। সে সকল বিষয়ে তৎকালীন সময়কার সম্মানীয় মুজতাহিদগণ সরাসরি তাঁদের বক্তব্য জানিয়েছেন সেগুলি হল **ইজমা-ই-আযমাত**। যদি একজনও কোন ভাবে দ্বিমত পোষণ করেন তা হলে তা **ইজমা-ই-আযমাত** বলে গণ্য হবে

না। আর যে সকল বিষয় বেশীরভাগ ধর্মশাস্ত্রকার একমত হয়ে বিষয়টিকে সঠিক পন্থা বলে গণ্য করেছেন তাকে ইজমা-ই-রুখসাত বলে। পবিত্র কোরআনের ঘোষণায় ইজমা হল "পয়গম্বরকে মান্য কর আর যাঁরা তোমাদের মধ্যে বিজ্ঞ ব্যক্তি তাদেরও মান্য কর।" হাদিসের ভাষায় বলা যায় "যদি তোমাদের কোন বিষয় সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাহলে পবিত্র কোরআনের নির্দেশিত পথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। আর যদি সে বিষয়টি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে কোন দিক নির্দেশ না থেকে থাকে হযরতের জীবনাদর্শের নির্দেশিত পথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর ; তারপর বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ঐক্যমত হওয়া বিষয়গুলির নির্দেশমত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।" ইতিহাস প্রমাণ করে যে হযরতের পরে খলিফাগণের সামনে যখনই কোন প্রশ্ন এসেছে তখনই তারা তা নিঃষ্পত্তি করেছেন উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে।

যে সকল বিষয় সাহাবাগণ একমত হয়ে ইসলামের নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেগুলি বেশীর ভাগ ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতে অপরিবর্তনীয়। ইজমার মূল লক্ষ্য হল উন্নত সমাজ গঠনের প্রয়োজনে, মানুষের নৈতিক মান উন্নয়নে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশেষ বিশেষ ধর্ম সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন পূরণ দেয়। এক্ষেত্রে যাঁরা পবিত্র কোরআন হাদিস ও ইসলামী বিধান সম্পর্কে বিশেজ্ঞ কেবল তাঁদের দ্বারা বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হল ইজমা। ইজমা ইসলামী শাস্ত্র সম্মত। সাধারণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কোন মত বা সিদ্ধান্ত ইজমার অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. কেয়াস :

কেয়াস বলতে কি বোঝায় ও কেয়াসের তাৎপর্য কি ?

ইসলামী শাস্ত্র-আইন প্রণয়নের আর একটি গৃহীত পন্থা হল 'কেয়াস'। কেয়াসের আভিধানিক অর্থ হল সৃজন করা বা রচনা করা অথবা কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা মূলক বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া। মূলত কেয়াস হল একটি তুলনা মূলক সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ যে তিনটি উৎসের দ্বারা গৃহীত হয় তা হল পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা। ইমাম আবু হানিফাই প্রথম ইসলামী ধর্মশাস্ত্রকার যিনি নিজেকে কেয়াসের অন্তর্ভুক্ত

করেছেন। এই পদ্ধতি দ্বারা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর তিরোধানের পরবর্তী কালে উদ্ভূত নতুন সমস্যাগুলির সমাধান করা হয়েছে। যখন কোন সমস্যার সমাধানে পবিত্র কোরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা সরাসরি কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ পাওয়া যায় না তখন সবকিছু বিশ্লেষণ করে ও অনুরূপ ঘটনায় হযরতের জীবদ্দশার সাদৃশ্যমূলক কোন ঘটনার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা হল 'কেয়াস'। যে সকল ব্যক্তিগণ ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্র পবিত্র কোরআন, হাদিস সুন্নাহ ইত্যাদিতে বিশেষ জ্ঞানার্জন করেছেন কেবল তাঁদের দ্বারা গৃহীত অনুরূপ সিদ্ধান্ত সমূহই হল কেয়াস। অনুরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন চার ইমাম। যথা—ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালোক ইমাম শাফেঈ ও ইমাম হাম্বল (রহঃ)।

৩. ইজতেহাদ বা সিদ্ধান্ত কার্যকর করা :

'ইজতেহাদ'-এর তাৎপর্য কি ?

ইজতেহাদ হল ইসলামী আইনের আরও একটি উৎস। 'ইজতেহাদ' শব্দটির মূল হচ্ছে 'জাহাদ', যার অভিধানিক অর্থ হল 'নিজস্ব' অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র নীতি নির্দ্ধারণের জন্য কোরআন ও হাদিস থেকে বিশেষ শিক্ষার বিষয়গুলি অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করা ও তা কার্যকরী করা। যে সকল বিষয় কোরআন হাদিসে সরাসরি নির্দেশ নেই, এমন বিষয়ে বিজ্ঞ মুসলমান ব্যক্তিগণ প্রয়োজনভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সকল সিদ্ধান্তকেই ইজতেহাদ বলে গণ্য করা হয়। যুক্তি এবং বিচার বিবেচনা ইসলামী আইন প্রণয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই যুক্তি বিবেচনা পবিত্র কোরআনে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। মানুষের নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে ইসলাম অনুসারীদের জন্যে যে বিধান বা ধর্মীয় শাস্ত্র প্রণয়ন করা হয় তা বহুলাংশে যুক্তি ও বিচার বিবেচনা নির্ভর। "যারা নিজেদের বিবেক, বুদ্ধি, যুক্ত, বিবেচনাকে কাজে না লাগায় ইসলামী শরীয়তের বিধানে তারা পশুর সঙ্গে তুলনীয় এবং তাদের মুক বধির ও অন্ধের মত গণ্য করা হয়।" যুগের প্রয়োজনে নৈতিক বিচার বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা পবিত্র কোরআন হাদিস ও সুন্নাহর সমর্থনীয় যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেগুলিকেই

ইজতেহাদ বলা হয়। বড় বড় মুজাহিদগণ বিশেষ কতকগুলি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে ইসলাম ধর্মের ব্যবহারিক নিয়ম নীতি তৈরী করতেন। হযরতের জীবদ্দশায় ও তৎপরবর্তী প্রথম চার খলিফার যুগে এরকম বহুবিষয়েই যুক্তি বিবেক ও ন্যায়ানুগ হাদিস কোরআন ও সুন্নাহ্ সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইসলাম ধর্মশাস্ত্রকার চার বিখ্যাত ইমাম যেমন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম হাম্বল (রহঃ) 'ইজতেহাদ' কে ইসলাম ধর্মে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার বিষয় একমত হয়েছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায় তাঁদের নিজেদের সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনে যুগোপযোগী মুসলিম আইন তৈরীর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। শুধু একটি মাত্র শর্ত এক্ষেত্রে পালনীয় তা হল অনুরূপ কোন সিদ্ধান্তই পবিত্র কোরআন হাদিসের পরিপন্থী হবে না। এখন প্রশ্ন হল এই ইজতেহাদ বা যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তের দ্বারা ইসলামী আইন প্রণয়ন এখন বৈধ কিনা। এক্ষেত্রে দুটি মতবাদ প্রচলিত (১) অনেকে মনে করেন হযরত ও প্রথম চার খলিফার যুগের পর নতুন করে যুক্তি নির্ভর কোন ইসলামী আইন তৈরী করা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আবার আর একদল মনে করেন যে, না, যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বযুগেই ইজতেহাদ বা যুক্তি, বিচার, বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা পবিত্র কোরআন হাদিসের পরিপন্থী নয় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর কোন সাহাবা বা বিখ্যাত মুজতাহিদগণ অর্থাৎ ইমামগণ এমন কোন নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেননি যে মুসলমানদের সামনে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোন ইজতেহাদ গ্রহণ করা যাবে না। তবে সবক্ষেত্রেই এটা স্পষ্টভাবে ঘোষিত যে কোন ভাবেই পবিত্র কোরআন হাদিসের পরিপন্থী কোন আইন কোনকালেই তৈরী করা বৈধ হবে না। অথাৎ কোরআন হাদিসে উল্লিখিত বিষয়গুলির বিপরীত ধর্মী কোন সিদ্ধান্তই মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়। পবিত্র কোরআন হাদিসের মূল বক্তব্যের সীমারেখার মধ্যে ইজতেহাদ মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের এক অপরিসীম মঙ্গলময় অবদান। তবে কোন ক্ষেত্রেই মুসলমান বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্যের কোন সিদ্ধান্ত (তা মঙ্গল জনক হলেও) কারও জন্য বৈধ নয় বা গ্রহণযোগ্য নয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চার ইমাম

চার ইমাম কারা ও তাঁদের মূল নীতি কি ?

ইসলাম ধর্মাবলম্বী সকল সম্প্রদায় (শিয়াগণ ছাড়া) চার ইমামকেই সঠিক পথের দিশারী মনে করেন। ইসলাম ধর্মের জন্য যারা সর্বজনবিদিত ও গ্রহণযোগ্য আইন তৈরি করেছেন তেমন চার ইমাম হলেন : ১. **ইমাম আবু হানিফা আন্‌নুমান বিন সাবেত** ২. **ইমাম মালেক ইবনে আনাস** ৩. **ইমাম মোহাম্মাদ ইদ্রিস আস-শাফেঈ** এবং ৪. **ইমাম আহম্মাদ এবনে হাম্বল**। এঁদের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ। (বিস্তারিত জানার জন্য প্রত্যেক ইমামের জীবনী পৃথক গ্রন্থে পড়তে হবে)

১. ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)-এর নীতিকে হানাফি মতবাদ বলা হয়। হানাফি মতবাদ সর্বাধিক প্রাচীন মতবাদ এবং বিশ্বের বেশীর ভাগ মুসলমানই হানাফি মতবাদের অনুসারী। কোন ইমামের মতবাদই ইসলামের মূল বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। ইমামগণ কেবলমাত্র ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আচরণ বিধির জন্য যে সকল ইসলামী আইন প্রণয়ন করেছেন সে ক্ষেত্রে কিছু কিছু সূক্ষ্ম মত পার্থক্য থেকে গিয়েছে। তবে তাতে ইসলামের কোন ক্ষতি বা ধর্মাচরণে কোন ক্রুটি হবে না বা মূলনীতিতে কোন পার্থক্যও নেই।

আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের শাসন কালে ৮০ হিজরীতে (৬৯৯ খ্রীঃ) ইমাম আবু হানিফা ইরাকে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রবিদ ইমাম জাফর সাদেকের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং আবু আব্দুল্লাহ এবনে মোবারকের কাছে প্রাথমিক ভাবে হাদিস শ্রবণ করেন। ইমাম আবু হানিফাকে ইমাম আযম বা শ্রেষ্ঠ ইমাম বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি ১৫০ হিজরীতে (৭৬৯ খ্রীঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন এবং তাঁকে বাগদাদে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মাচরণের ব্যবহারিক পন্থাগুলি

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারত, পাকিস্থান, আফগানিস্থান, বাংলাদেশ, তুর্কীস্থান মিশর ও মধ্যএশিয়ার বেশীরভাগ দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের গৃহীত পন্থা।

ইমাম আবু হানিফা উদার পন্থাবলম্বী ছিলেন। প্রতিক্ষেত্রেই তিনি অপেক্ষাকৃত নরম, মানবিক ও উদার নীতি নির্দ্ধারণ করেছেন। পবিত্র কোরআন হাদিসের সঙ্গে সঙ্গে দেশ কাল উপযোগী স্বাভাবিক আচার আচরণকেও বিবেচনা করেছেন। পবিত্র কোরআন হাদিসের পরিপন্থী না হলে তা গ্রহণযোগ্য নীতিবলে ঘোষণা করেছেন। যেমন তাঁর মতে 'খোতবা' নিজ নিজ ভাষায় পড়াতে হানিকর কিছু নেই। আব্বাসীয় খলিফাদের শাসন কালে তিনি ও তাঁর নীতি বিশেষ সমাদর লাভ করে। পরবর্তী কালে হারুন আর্-রশীদও তাঁর প্রচারিত নীতিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ইমাম আবু হানিফা প্রবর্তিত নীতি ও ধর্মশাস্ত্র সম্বলিত মহাগ্রন্থের নাম— 'ফেকহুল-আকবার'।

২. ইমাম মালেক এবনে আনাস (রহঃ)

ইমাম মালেক (রঃ) প্রবর্তিত আচরণ ও ব্যবহার বিধিকে মালেকী নীতি বা মতবাদ বলে। ইমাম মালেকও ইসলামের মূল নীতিতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিমার্জন করেননি। কেবল মাত্র আচরণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন কোন সূক্ষ্ম বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে খলিফা হারুন-আর্ রশীদের রাজত্বকালে মদিনাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁকে ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় ইমাম বলা হয়। বাল্যকালেই তিনি পবিত্র কোরআন ও হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর পরিবার বর্গের প্রতি বিশেষ অনুগত ছিলেন এবং ইসলাম প্রচার, প্রসার ও ইসলামের নীতি প্রয়োগের বিষয় সর্বদা চিন্তা করতেন।

মদিনা ছিল ইসলাম ধর্মের সর্ববিষয়েই মূল কেন্দ্র। হযরতের বাসস্থান। এই মদিনাই ছিল তৎকালীন যুগে গোটা পৃথিবীর লক্ষস্থল। ইমাম মালেক বিপুল পরিমাণ হাদিস এখানে সংগৃহীত ও একত্রিত করেছিলেন, তাঁর

সংকলিত ফেকাহ-শাস্ত্রগ্রন্থ "কোতাবুল মুয়াত্তাহ" (মসৃণপন্থা) সাধারণ আরব ও সমপ্রকৃতির আফ্রিকার অধিবাসীগণের নিকট বিশেষ আদরণীয় হয়েছিল। এমনকি এঁদের কাছে ইমাম আবু হানিফার দূরকল্পী পন্থাগুলির তুলনায় এমাম মালেক প্রবর্তিত নীতিগুলি প্রাচীন সামাজিক পরিমণ্ডলে অধিক পঠিত ও গৃহীত হয়েছিল। এমাম মালেক ইসলামের ন্যায়নিষ্ঠা ও ন্যায়ানুষ্ঠানের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিতেন, তিনি হযরতের যুগের কোন নিয়ম নীতির পরিবর্তনের বিরুদ্ধে খুবই কঠোর ছিলেন। তিনি তাঁর নীতি ও পন্থাগুলিকে হাদিস, সুন্নাহ এবং হযরতের আচরণবিধির উপর নির্ভর করেই নির্দ্ধারণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে বহু ব্যবহারিক বিষয়েই তার মত পার্থক্য ছিল। তিনি ব্যবহারিক নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে অনুমান ও বিয়োজন মূলক সিদ্ধান্তকে পরিহার করেছেন। সুতরাং বলা যায় হানাফি পন্থাগুলি যুক্তি ভিত্তিক ও মালেকী পন্থাগুলি ঐতিহ্য ভিত্তিক চিরাচরিত প্রথা নির্ভর।

৩. ইমাম মোঃ ইদ্রিস আস শাফেঈ (রহঃ)

ইমাম শাফেঈ (রঃ) হলেন ইসলামের তৃতীয় ইমাম। তিনি খলিফা মামুনের সময়কালে ১৫০ হিজরী (৭৬৯ খ্রীঃ) প্যালেস্টাইনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরীতে (৮২৩ খ্রীঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি ইমাম মালেকের অনুগামী ছিলেন। তাই মালেকী নীতিশাস্ত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি ফাতেমী গোষ্ঠির গোঁড়া সমর্থক ছিলেন তাই আব্বাসীয় খলিফা হারুন-আর্ রশিদের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে দরবারে হাজির করা হয়েছিল। কিন্তু খলিফা তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি ফাতেমী ইমাম আলি এবনে মুসা-আর-রোজার সমসাময়িক ছিলেন।

তিনি ইসলামী আইন ও হাদিস এবং প্রবর্তিত প্রথার উপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এইসকল গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হল : 'ওসুল' বা মুসলিম দেওয়ানী, সামাজিক ও অনুশাসনিক আইন '.ন্নাহ' বা হাদিস বিষয়ক আইন ; তিনি ইমাম আবু হানিফার 'ইজমা'কেও যেমন গ্রহণ করেছেন তেমনি আবার ইমাম মালেকের 'ইসতেদ্লাল'কেও গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শফেঈর নীতিগুলি কোরআন ছাড়াও অনেক বেশী হাদিস নির্ভর। শুধু মাত্র মদিনার হাদিস নয় সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রচলিত হাদিস সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে তিনি নীতি নির্দ্ধারণ করতেন।

ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে ইমাম শাফেঈর প্রধান পার্থক্য হল যে আবু হানিফা ছিলেন প্রধানতঃ কোরআন নির্ভর সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী, ফলে হাদিসের উপর অপেক্ষাকৃত কম নিভর্রশীল। আর ইমাম শাফেঈ ছিলেন প্রধানতঃ হাদিসের উপর নিভর্রতার পক্ষপাতী। ইমাম শাফেঈর নীতির প্রধান অনুসরণকারীগণ হলেন উত্তর আফ্রিকা, মিশর, দক্ষিণআফ্রিকা এবং সিংহলের অধিবাসীবৃন্দ। ভারতের বোহরা সম্প্রদায়েরও এক অংশ ইমাম শাফেঈর নীতির অনুসরণ করে থাকেন।

৪. ইমাম আহমদ এবনে হাম্বল (রহঃ) ঃ

ইসলামের চতুর্থ ইমাম হলেন ইমাম আবু হাম্বল (র:)। তিনি ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি ইমাম শাফেঈর অনুগামী ছিলেন। তিনি খলিফা মামুন ও মুসতাসিম বিল্লাহে্র সময়কালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত মৌলবাদী ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর এই একান্ত মৌলবাদ নীতি জন-সাধারণকে তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছিল। এজন্য খলিফা মুসতাসিম ইমাম মালেককে কারাগারে বন্দি করেছিলেন পরে খলিফা মোতাওয়াক্কিল তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু তিনি কখনই তাঁর মৌলবাদী ধর্মীয় নীতিতে অবিচল থাকতে পিছপা হননি এবং সর্বদাই মোতাজেলাদের নীতির বিরোধিতা করেছেন।

ইমাম মালেক ব্যাপকভাবে হাদিস চর্চা করেন তাঁর বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ হল 'মসনদ'। এতে প্রায় তিরিশ হাজার হাদিস সংকলিত হয়েছে। তিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হাদিসের উপর নির্ভর করেই বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়ে নীতি নির্দ্ধারণ করেছেন। হাম্বলী মতবাদ হল ইসলামের কঠিন মৌলবাদী পন্থা এবং এই মতাবলম্বীগণ কোন ভাবেই কোন ধর্মীয় বিষয় অবাধ আলোচনার পক্ষপাতী নন। ইমাম হাম্বল কোন বিদেশী ও বিধর্মীয়

নীতির প্রভাবে কোন নতুন বিষয়ের প্রবর্তন, কোন বিষয়কে পরিবর্তন করা বা অবিশুদ্ধতা বিষয়ক কোন নীতিকে ইসলামের মধ্যে সংমিশ্রণ করার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইমাম হাম্বল পবিত্র কোরআনের যে কোন বিষয়কেই যুক্তি দ্বারা বিচার বিশ্লেষণের বিরোধী। যেহেতু ইমাম হাম্বল হাদিস বিষয়ে সকল প্রকার সমঝোতা বিরোধী তাই তাঁর নীতির অনুগামীর সংখ্যা খুবই কম বর্তমানে কেবলমাত্র আরবদেশের অভ্যন্তর ভাগের কিছু ওহাবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁর নীতির আংশিক প্রচলন আছে।

সংক্ষেপে ইমাম আবুহানিফা ও ইমাম শাফেঈর মধ্যকার পার্থক্য বিষয় কি কি?

ইসলাম ধর্মের বিধানে এই দুই ইমামই আদর্শনীয় এবং পবিত্র জীবন যাপনের অধিকারী। উভয়েই মহান ও মহীয়ান, এবং ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক ও পালক। কিছু কিছু ব্যবহারিক বিষয়ের বিধানের ক্ষেত্রেই মাত্র মতপার্থক্য আছে কোন নৈতিক মতপার্থক্য উভয়ের মধ্যে নেই, এখানে কিছু বিষয় উভয়ের মত পার্থক্যের উদাহরণ দেওয়া হল। যেমন :—

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)	ইমাম শাফেঈ (রহঃ)
* নিয়ত ও তারতীব (ধারাবাহিকতা) ছাড়াও ওজু হবে।	* নিয়ত ও ধারাবাহিকতা না থাকলে ওজু হবে না।
* পানির অভাবে খেজুরের রস দিয়ে ওজু করলেও তা শুদ্ধ হবে।	* পানির অভাবে অন্য কিছুতেই ওজু সিদ্ধ হবে না।
* ফরজ গোসলের সময় কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া বাধ্যতামূলক (ফরজ)।	* ফরজ গোসলে কুল্লি করা বা নাকে পানি দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।
* নামাযের মধ্যে অট্টহাসির শব্দ করলে ওজু ও নামায দুই নষ্ট হবে।	* নামাযের মধ্যে অট্টহাসির দ্বারা কেবল নামায নষ্ট হবে ওজুর নষ্ট হবে না।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)	ইমাম শাফেঈ (রহঃ)
* ওজুর কুল্লি করার সময় অনিচ্ছা ও ভুলে গলার মধ্যে পানি প্রবেশ করলে রোযাদারের রোযা নষ্ট হয়।	* অনিচ্ছা ও ভুলবশতঃ পানি পেটে চলে গেলেও রোযাদারের রোযা নষ্ট হবে না।
* নফল রোযা ভাঙ্গলে পরে তার কাযা রাখতে হবে।	* নফল রোযার কাযা রাখা বাধ্যতামূলক নয়।
* ফরজ নামাযে জামাআতের সময় মোক্তাদিগণকে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে না।	* প্রত্যেক নামাযেই মোক্তাদিকে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে।
* রাজ্যে শাসক থাকলে শহরে জুমআর নামায দুরস্ত বা শুদ্ধ।	* সকল অবস্থাতেই জুমআর নামায যায়েজ। শুধুমাত্র চল্লিশজন লোক হলেই চলবে। বাদশাহ বা শাসক থাকা বাধ্যতামূলক নয়।
* সম্পদের অধিকারী হলেও নাবালকের উপর যাকাত ফরজ নয়।	* নাবালকের উপরও যাকাত ফরজ। তাকেও সম্পদের যাকাত দিতে হবে।
* ব্যবহৃত অলঙ্কারের যাকাত দিতে হবে।	* ব্যবহৃত অলঙ্কারের যাকাত দিতে হবে না।
* ঘোড়ার মাংস ভক্ষণ বৈধ নয়।	* ঘোড়ার মাংস ভক্ষণ বৈধ।
* কোরবানী করা ওয়াজেব।	* কোরবানী করা সুন্নত।
* সম্পদশালীকে একটি করে বকরী কোরবানী করতে হবে।	* পরিবারের কর্তা সকলের পক্ষ থেকে একটি বকরী কোরবানী করতে পারে।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)	ইমাম শাফেঈ (রহঃ)
* স্বাধীনা সাবালিকা কন্যা অভিভাকের (ওলির) অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করতে পারে।	* অভিভাবকের (ওলির) ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করতে পারে না।
* কোন স্বামীর নিকট থেকে জোর পূর্বক তালাক লিখিয়ে নিলেও তা তালাক হিসাবে কার্যকরী হবে।	* জোরপূর্বক তালাক আদায় তালাক নয়। তা অর্থহীন।
* মুসলমান ক্রীতদাসের পক্ষে কাফেরকে আশ্রয় দেওয়া মূল্যহীন।	* মুসলমান ক্রীতদাসের পক্ষে কাফেরদিগকে আশ্রয় দেওয়া বৈধ এবং তা বৈধ বলে স্বীকার করতে হবে।
* মুসলমান মনিবকে তাঁর কাফের চাকরেরও যাকাত ফেতরা আদায় করতে হবে।	* কাফের চাকরের উপর কোন যাকাত বা ফেতরা নেই সুতরাং তা আদায় করার দায়িত্ব নেই।

এইভাবে প্রায় সত্তরটি ব্যবহারিক মসলায় বা ইসলামী নীতিতে ইমাম আবুহানিফা (রাঃ) ও ইমাম শাফেঈর (রাঃ) মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ইমাম শাফেঈ ইমাম মালেকেরই একজন শিষ্য। প্রায় কুড়িটি বিষয় নীতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে আবার ইমাম হাম্বল ইমাম শাফেঈরই শিষ্য। প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই তিনি ইমাম শাফেঈর সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। সে দুটি ক্ষেত্র হল।

(১) আমাদের 'কেয়াসের' চেয়েও সাহাবাদের 'বাণী' উত্তম।

(২) এবং 'খব্‌রে ওয়াহেদ' আমলের (অভ্যাসের) সঙ্গে যুক্ত করার যোগ্য।

এই চারজন ইমামই ইসলামী জগতের সর্বজন স্বীকৃত ধর্মীয় নেতা বা ইমাম। এঁরা কেউই ইসলাম ধর্মের মূলনীতি ও বিধানের ক্ষেত্রে কোন পৃথক মনোভাব পোষণ করেন না। এঁরা সকলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সুন্নতের অনুসারী ও ধর্মীয় নেতা বা সর্বজন গ্রহণযোগ্য ইমাম।

নবম পরিচ্ছেদ

শিয়া ও সুন্নী

শিয়া ও সুন্নী কাদের বলা হয়?

শিয়া মতবাদ আসলে একদল ক্ষমতা না পাওয়া অসন্তুষ্ট জনগোষ্ঠির মতের সমাহার। এই গোষ্ঠি প্রথমে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা এক ঈশ্বরতত্ত্বগত ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হন। 'শিয়া' শব্দের অর্থ হল দল, এটির উৎপত্তি 'শিয়া-ইত-ই আলী' শব্দ থেকে যার অর্থ হল 'আলীর দল'। শিয়া আন্দোলন শুরু করেন হযরত আলীর সমর্থক গোষ্ঠি, হযরত আলীর অনুগামীদের বিশ্বাস যে হযরত মোহাম্মাদ (সা:) অবশ্যই হযরত আলীকেই তৎপরবর্তী মুসলমানদের নেতা ও শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। এইভাবে ইসলামের প্রথম যুগেই দুটি শত্রু ভাবাপন্ন গোষ্ঠি তৈরী হয় তার একটির নাম শিয়া (হযরত আলীপন্থী দল) অপরটি হল 'সুন্নী' (জনগণের পথ বা পন্থা)। শিয়া সম্প্রদায় হযরত মোহাম্মাদ (সা:) এর মৃত্যুর পরই প্রথম ইসলামী খলিফার পদ হযরত আলীর প্রাপ্য বলে মনে করেন। ইতিহাসে দেখা যায় হযরত আলী চতুর্থ খলিফা হয়ে যখন সিরিয়ায় মাবিয়ার বিদ্রোহ দমনে যান তখনও মাবিয়ার ষড়যন্ত্রমূলক চক্রান্তের ফলে তিনি সেখানে খলিফা বলে স্বীকৃত হতে পারেননি। সেখানে মাবিয়া যুদ্ধে পরাজিত হয়েও সন্ধি সূত্রে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেন এবং বাক চাতুরীর সাহায্যে খলিফা আলীকে পদচ্যুত ঘোষণা করেন। এটি ইসলামের গৃহযুদ্ধের অবস্থায় সিফ্ফিন নামক যুদ্ধক্ষেত্রে ঘটেছিল। মাবিয়া পরাজিত হয়ে যখন মুসলমানদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ধি প্রস্তাব করেন তখন হযরত আলী একদল সৈন্যের চাপে তা মেনে নিতে বাধ্য হন এবং মাবিয়ার প্রস্তাব মত মধ্যস্থতার দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্মত হন। হযরত আলী মাবিয়ার চক্রান্তের বিষয় বুঝতে পেরেও একদল সৈন্যবাহিনীর চাপেই এই মধ্যস্থতায় রাজি

হয়েছিলেন। হযরত আলীর পক্ষে দুর্বলচেতা আবু মুসা আশআরী এবং মাবিয়ার পক্ষে ধূর্ত্ত আমরু বিন আল আস মধ্যস্থতায় নিযুক্ত হন। দুষ্ট বুদ্ধি আমরু সরল প্রকৃতির আবু মুসাকে রাজি করান যে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান-দের মঙ্গলার্থে আলি ও মাবিয়াকে পদচ্যুত করে তৃতীয় ব্যক্তিকে শাসক নিযুক্ত করা হবে। সেইমত আবু মুসা ও আমরু যথাক্রমে হজরত আলী ও মাবিয়ার পদচ্যুতি ঘোষণা করবেন। এই চুক্তি মতই হজরত আলীর পক্ষে আবু মুসা প্রথমে বেদিতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন যে "আমি হজরত আলীকে পদচ্যুত করলাম" কিন্তু কুচক্রী আমরু মাবিয়ার পদচ্যুতি ঘোষণা না করে বেদিতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন "আমি হজরত আলীর পদচ্যুতি অনুমোদন করলাম ও মাবিয়াকে খলিফা মনোনীত করলাম।" এইভাবে হযরত আলীকে যুদ্ধে জয়লাভের পরও বিজয়-জনিত ফল লাভে বঞ্চিত হতে হয় এবং তিনি সৈন্য সহ কুফায় প্রত্যাগমনে বাধ্য হন। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে যে সৈন্য গোষ্ঠী সন্ধি প্রস্তাবের জন্য চিৎকার করছিল এখন তারাই কিন্তু ঐ সন্ধি সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করল। এবং হযরত আলীর সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেওয়ার বিরোধিতা করে তারাই সৈন্যবাহিনী ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এই বেরিয়ে যাওয়া গোষ্ঠীই হল খারেজী। আর সেই থেকে যে মুসলিম জনগোষ্ঠী হযরত আলী পক্ষাবলম্বন করে সমর্থন করে আসছেন তাঁরাই হলেন শিয়া সম্প্রদায়। পরে কারবালার যুদ্ধ শিয়া সম্প্রদায়কে ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠা করেছে। এক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন সে "হোসেনের রক্তই শিয়া গোষ্ঠীর বীজ বপন করেছে।....মহরমের দশ তারিখেই শিয়া গোষ্ঠী জন্মলাভ করেছে।"

শিয়া মতবাদগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় কি ?

সাধারণভাবে শিয়া মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য শিয়া গোষ্ঠীর মতবাদগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল। যথা ঃ

(১) শিয়াদের মূল মতবাদ হল রাজনৈতিক। তাঁদের মতে প্রথম তিন খলিফার নির্বাচন অবৈধ, চতুর্থ, খলিফা হযরত আলীকে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পরই খলিফা নিযুক্ত করা উচিত ছিল। তাঁরা সকল আব্বাসীয় ও উমাইয়া খলিফাকেই অবৈধ দখলদার গণ্য করেন। তাঁদের

মতানুসারে ইসলামী অনুশাসনের নেতৃত্ব একমাত্র হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর পরবর্তী বংশধরদের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট। সুতরাং হযরত আলী তাঁর সন্তান ও স্ত্রী ফাতেমাই হযরতের পরে ইসলাম ধর্মের নেতৃত্ব পাওয়ার সর্বময় অধিকারী।

২. ইসলামের মূলমন্ত্র হল এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা ও উপাস্য নেই এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত দূত। শিয়াগণ এর সঙ্গে যুক্ত করেন যে হযরত আলী আল্লাহ্র তরফ থেকেই রসূলের পরে ইসলামের নেতৃত্ব করার জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি তথা ইমাম।

৩. শিয়া মতবাদে এই ধারণা পোষণ করা হয় যে, দ্বাদশ ইমাম মোহাম্মাদ আলমুনতাযর সামারাতে অন্তর্ধান করেছেন – যথাসময়ে তাঁর পুনঃ আগমন ঘটবে ইমাম মেহদী নামে। তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ন্যায় ও সত্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন। এবিষয় শিয়া সম্প্রদায়ের অপর গোষ্ঠীর মতপার্থক্য আছে। তারা বলেন যে হযরত আলীর পুত্র মুহাম্মাদ এবনুল হানিফাকে আল্লাহ্ জীবিত অবস্থায় আত্মগোপন করিয়ে রেখেছেন। বিশ্বে মহাপ্রলয় আসার পূর্বে ইমাম মেহদী নামে তাঁরই পুনরাবির্ভাব ঘটবে। শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ইমাম বিষয়ক ধারণা খুবই জটিল বিষয়।

৪. শিয়া সম্প্রদায় মনে করেন যে ইমাম নির্বাচনে অবশ্যই ঐশ্বরিক আইন আছে। তাঁরা ইমাম নির্বাচনে সকল মানব গোষ্ঠীকেই অগ্রাহ্য করেন। কারণ তাঁরা মনে করেন মানুষের ইমাম নির্বাচন প্রায়শঃই ভুল হওয়ার সম্ভবনাময়। তাঁদের মতে ইমামকে অবশ্যই ঐশ্বরিক ভাবে নিয়োজিত হতে হবে। ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকে তিনি হবেন সুস্পষ্ট ঘোষিত ব্যক্তি এবং প্রশ্নাতীত ভাবে তাঁকে অনুকরণ বাধ্যতামূলক। আর ইমামের কোন ন্যায়ভ্রষ্টতা বা অন্যায় কাজ অথবা যাঁরা সাধারণ জনগণের জন্য কোন নৈতিক বা ঐশ্বরিক বিধি পরিচালনা করেন তাঁদের ঐ কাজ কোন বিশ্বাসী লোকের প্রার্থনা (নামায) নষ্ট করবে না। শিয়া মতবাদে ইমাম হলেন 'মাসুম' বা পাপের দায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁদের কোন অধার্মিকতা কিংবা খেয়ালী যথেচ্ছাচারও মানবগোষ্ঠীর পর্যালোচনার উর্দ্ধে।

৫. শিয়া মতবাদ অনুসারে 'নূর' অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্যোতি হযরত

আদম থেকে শুরু করে এক নবীর মধ্য থেকে অন্য নবীর মধ্যে পৌঁছেছে এবং সেইসঙ্গে ঐ জ্যোতি (নূর) জ্যোতির্ময় করেছে হযরতের পিতা এবং হযরত আলীকে। অতঃপর তা হযরত আলীর সন্তানগণ ও হযরত ফাতেমাতে আরোপিত হয়েছে। উগ্র শিয়া পন্থীগণের মতে ইমামগণ আল্লাহ্ কর্তৃক মূর্তায়িত বা আবির্ভূত হয়েছেন। শিয়া সম্প্রদায়ের অতি উৎসাহী গোষ্ঠীর এও ধারণা যে জিব্রাইল (আঃ) ভুলবশতঃ হযরত আলীর জায়গায় হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে নির্বাচন করেছিলেন, নইলে হযরত আলীর কাছেই প্রকৃতপক্ষে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কথা।

৬. শিয়াগণ মনে করেন যে ইমামত্ব দু-রকম, যথা—জাহেরী (প্রকাশ্য) ও বাতেনী (অপ্রকাশ্য)। সুতরাং একসময় ও এককালে দুজন ইমাম হতে পারে, শিয়াগণের মতে ইমাম হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) থেকে বংশানুক্রমিক। ইমাম শুধুমাত্র তাঁর ইহজীবনকালীন সার্বভৌমত্বের অধিকারী নন বরং তাঁরা ইসলামী নীতি ও আইন বর্ণনায় বিশেষ পদমর্যাদার অধিকারী, এদিক থেকে ইমামই হলেন সবচেয়ে জীবন্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষক।

৭. তাঁরা এই ধারণা পোষণ করেন যে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে তবে তা অনন্তলোক (লাওহে মাহফুজ) থেকে সৃষ্ট নয় অর্থাৎ তা লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত ছিল না।

৮. উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকগণের জন্য তাঁরা তাঁদের মূল মতবাদকে গোপন করার নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। এই নীতিই তাঁদের অনুভূতি ও ধারণাকে গোপন করার শিক্ষা দেয় এবং তাঁদের ধর্মীয় প্রত্যয় বা বিশ্বাস 'সুন্নী' সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। শিয়াগণ তাঁদের নিজেদের মতবাদ গোপন রেখে আব্বাসীয় ও উমাইয়া খলিফাগণের নিকট বাহ্যিক আনুগত্য দেখিয়েছিলেন।

সাধারণভাবে শিয়া ও সুন্নী মতবাদে কি কি পার্থক্য দেখা যায় ?

শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের নিজ নিজ পন্থাগুলিতেই পরস্পরের পার্থক্য স্পষ্ট। সাধারণভাবে পার্থক্যগুলি হল :

(১) শিয়া মতবাদের সমর্থকগণ বলেন যে মূল কোরআন শরীফকে

কাটছাঁট করে অপূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে। তাঁরা সুন্নী মতাবলম্বীদের এই বলে দোষারোপ করেন যে সুন্নীগণ হযরত আলী সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিকে বাদ দিয়েছেন। অপরদিকে সুন্নী মতাবলম্বীগণ বলেন যে পবিত্র কোরআন সংগ্রহ ও সংকলনে সামান্যতম ত্রুটিও নেই বা কোনরকম দূর্নীতিও নেই। ঠিক যেভাবে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং হযরতের জীবদ্দশায় যেভাবে জিব্রাইল (আঃ) এর নির্দেশ মত সাজান ও সংকলন করা হয়েছিল তাই অবিক্রিত আছে এবং কোরআনের একটি শব্দও বাদ পড়েনি বা বদলান হয়নি।

(২) সুন্নী মতাবলম্বীগণ মনে করেন যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) অন্য সকলের মত মানুষ ছিলেন, তবে তিনি সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ ওহি বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। সকল মুসলমান সমান মর্যাদা সম্পন্ন। যে সকল মানুষ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) কে মেনে চলেন ও তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে ভয় করেন তাঁরা সকলেই আল্লাহর দৃষ্টিতে উত্তম। শিয়ামতাবলম্বীগণ মনে করেন যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত এবং আল্লাহ্তুল্য ক্ষমতার অধিকারী। ইহলোক ত্যাগে তাঁর আল্লাহতুল্য ক্ষমতার মৃত্যু ঘটেনি। শিয়ামতবাদ অনুসারে, হযরত আলী (রাঃ) তাঁর সন্তানগণ ও তাঁদের পরবর্তী বংশোদ্ভূত ইমামগণ উত্তরাধিকার সূত্রে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর ঐ সকল আল্লাহতুল্য ক্ষমতা ও গুণে ভূষিত হয়েছেন। আর তাঁরাই প্রকৃত পক্ষে ইসলামের একমাত্র নেতৃত্বের অধিকারী। সুন্নী মতাবলম্বীগণ তাঁদের (আলীর বংশধরগণকে) এইভাবে গ্রহণ না করে মহাপাপ করে চলেছেন।

(৩) সুন্নী মতবাদে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সর্বশেষ পয়গম্বর। এরপর আর কোন পয়গম্বর বিশ্ব জগতে আবির্ভূত হবেন না। কিন্তু শিয়া মতাবলম্বীদের বেশীর ভাগের বিশেষতঃ ইসমাইলী গোষ্ঠির বিশ্বাস যে ইমাম ইসমাইল হচ্ছেন শেষ পয়গম্বর। শিয়া মতবাদ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) অপেক্ষা হযরত ইসমাইলকে অধিক গুরুত্ব দেন বা সমান মর্যাদা সম্পন্ন মনে করেন। কিন্তু সুন্নী মতবাদ কোন ভাবেই হযরত আলী বা অন্য কাউকেই হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সমতুল্য মনে করেন না।

(৪) শিয়া মতবাদ অনুসারে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরের তিন খলিফাকে ইসলাম ধর্মের নেতা (ইমাম) বলে স্বীকার করা হয় না। তাঁরা মনে করেন যে হযরতের উত্তরাধিকারী তাঁর মতই আল্লাহ্ মনোনীত হবেন। তিনি হবেন নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক, ধর্ম বিষয়ক যাবতীয় ব্যাখ্যার ও ধর্মীয় নীতি সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানে সক্ষম। আর এ ক্ষেত্রে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর চাচাত ভাই তথা জামাতা হযরত আলীই একমাত্র হযরতের উত্তরাধিকারী হিসাবে মুসলমানদের নেতৃত্ব করার অধিকারী। তাঁদের মতে একমাত্র তিনিই পবিত্র কোরআনের প্রকৃত অর্থ ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাখ্যা দানে সক্ষম।

কিন্তু সুন্নী মতবাদে হযরতের পরের চার খলিফাকেই ন্যায়ানুগ ও নিষ্ঠাবান খলিফা বলে গণ্য করা হয়। ইসলামে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে সমগ্র জাতির নেতা নির্বাচন বৈধ নয়।

(৫) শিয়া মতবাদ আব্বাসীয় ও উমাইয়া খলিফাদেরও স্বীকার করেনা ও তাঁদের আনুগত্যও অস্বীকার করে না কিন্তু সুন্নী মতবাদ তাঁদের খেলাফতকে অস্বীকার করে না। এবং চার খলিফাসহ সকল শাসককেই অনুমোদন করেছে।

(৬) শিয়াগণ মনে করেন যে সাধারণ মুসলমানগণের কোন ভাবেই ইমাম বা ইসলামী নেতা নিয়োগের অধিকার নেই। এটা শুধুমাত্র আল্লাহ্ মনোনীত বিষয়। মানুষের এ বিষয়ে করণীয় কিছু নেই। কিন্তু সুন্নী মতবাদ হল—সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোরায়েশদের মধ্য থেকে উপযুক্ত লোককে ইমাম বা ধর্মীয় নেতা মনোনীত করবেন। তাছাড়া ঐ নির্বাচিত ইমামদের উপরই সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী ইমাম নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত।

(৭) সুন্নী মতবাদে ইমাম মেহদী যে হযরত ফাতেমার পরবর্তী বংশধরের কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি হবেন এমন কোন বিশেষ ধারণা প্রচলিত নেই। কিন্তু শিয়াগণ মনে করেন ফাতেমীয় বংশের কোন বিশেষ ব্যক্তিই ইমাম মেহদী হিসাবে কোন যুগে আবির্ভূত হবেন। এটা তাঁদের মতবাদের একটি প্রধান বিশ্বাস।

(৮) শিয়াগণ সুন্নীদের সমূহ হাদিসকে বতিল বলে ঘোষণা করেছেন তবে তাঁদের যে কোন সুন্নাহ বা হাদিস নেই তা নয়, তাঁরা পৃথকভাবে হাদিস সংকলন করেছেন যা সুন্নী মতবাদের সংগৃহীত হাদিস সমূহের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাঁরা কেবলমাত্র হযরত আলী ও তাঁদের পরবর্তী বংশোদ্ভূতদেরই ইমাম বলে স্বীকার করেন। এছাড়া কোন লোকই ইসলামের ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় নেতা বা ইমাম হতে পারবেননা বলে ঘোষণা করেছেন।

(৯) শিয়া মতবাদে ব্যবহারিক বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। আযান ও রমজানের তারাবিহ ইত্যাদি সুন্নী সম্প্রদায়ের অনুরূপ নয়। শিয়া মতবাদ অনুসারে এর ভিন্ন ভিন্ন সমাধান আছে। সাধারণ নামায তথা জামাআতে নামায আদায় শিয়ামতে বাধ্যতামূলক নয়। কারণ তাঁদের বর্তমানে কোন সঠিক ইমাম নেই। তাঁরা পাঁচ তকবির সহকারে জানাযা নামায আদায় করেন। সুন্নী মতে জানাযা নামাযে চারটি তকবির। শিয়াগণ ওয়ালীআল্লাহ্ গণকে অস্বীকার করেন এবং তাঁদের কবর যিয়ারাতকে অগ্রাহ্য করেন। সুন্নীগণ তা করেন না।

(১০) শিয়া মতবাদে প্রাচীন পারশিক পদ্ধতির 'নওরোজ' অনুষ্ঠান করা বৈধ। সুন্নীমতে বৈধ নয়। শিয়াগণের বিয়ে ও তালাক প্রথা সুন্নীমতানুসারী নয়। শিয়া মতে অস্থায়ী ('মুতা') বিবাহ বা নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে বিবাহ অনুমোদিত। সুন্নীগণ এই মত সম্পূর্ণ অবৈধ বলে অগ্রাহ্য করেছেন।

(১১) সুন্নী মতবাদে ১০ই মহরম আশুরাকে শোকাবহ ঘটনা মনে করে নিহত ও মৃতের আত্মার কল্যাণ কামনা, প্রার্থনা এবং জনহিতকর কাজের মধ্যে পালন করা হয়। আর শিয়া মতবাদে ঐ দিনকে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর দৌহিত্রের স্মৃতিরক্ষার দিন হিসাবে পালন করা হয়। বৈচিত্রময় তাজিয়া ও লাঠি ছোরা খেলাকে তাঁর স্মৃতি রক্ষার উপকরণ হিসাবে গণ্য করা হয়। সুন্নীগণ এধরনের কাজকে ধর্মীয় বিধি সম্মত বলেই মনে করেন না।

দ্বিতীয় বিভাগ

ইসলামের ধর্মাচরণ বিধি

প্রথম অধ্যায়

তাহারাত বা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওজু কি ?

নামায পড়া, কোরআন পাঠ, ও অন্যান্য পুণ্য কাজ করার জন্য নিজেকে পবিত্র করার মানসে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য ময়লাগুলিকে শরীয়তের বিধান মতে ধুয়ে ফেলা অর্থাৎ, হাত, পা, মুখমণ্ডল ইত্যাদি কয়েকটি অঙ্গ বিশেষ নিয়মে ধোয়াকে ওজু করা বলে। যেমন কব্জি পর্যন্ত দুহাত ধোয়া, তিনবার মুখমণ্ডল ধোয়া, নাকের ছিদ্রগুলি তিনবার পানি দিয়ে ধোয়া ও নাকের ময়লা পরিষ্কার করা, কনুই পর্যন্ত দুহাত ধোয়া, মাথা, মোছা এবং গোড়ালির উপর পর্যন্ত দু পা ধোয়া।

ওজু কত রকম ?

ওজু তিন রকম যেমন :

(১) সালাত বা নামাযের জন্য ওজু করা ফরজ।

(২) তওয়াফ করার জন্য ওজু করা ওয়াজেব।

(৩) মুখস্থ কোরআন পড়া, ঘুমান, গোসল করা ইত্যাদির জন্য ওজু করা মোস্তাহাব।

ওজু করার পদ্ধতি কি রকম ?

প্রথমে পবিত্র ও পরিষ্কার পানি সংগ্রহ করতে হবে। একটু উঁচু জায়গায় বসতে হবে। সম্ভব হলে কেবলার দিকে মুখ করে বসা ভাল, সম্ভব না হলে যে কোন দিকে মুখ করে বসা যাবে। এর পর নিজের জামার হাত কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নিতে হবে। এবার প্রথমে পড়তে হবে—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহ্‌হির রাহমা নির রাহিম (করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি) তারপর ওজুর নিয়ত করতে হবে।

অথবা, সম্ভব হলে পড়া :

"বিসমিল্লাহিল আলীয়িল আজীম, ওয়াল হামদো লিল্লাহে আলা দীনিল ইসলামে, আল ইসলামো হাক্কুন, ওয়াল কুফরো বাতেল।" অথবা বাংলায় বলা "সর্বমহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাকে ইসলামের উপর রেখেছেন। ইসলাম ধর্ম সত্য এবং কুফরী মিথ্যা ও পরিত্যাজ্য।' এর পর ওজুর নিয়ত করতে হবে।

ওজুর নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلٰوةِ
وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

("নাওয়াইতো আন আতাওয়াদ্দা লেরাফয়ীল হাদাসে ওয়াএসতেবা-হাতান লিস সালাতে ওয়াতাকাররোবান এলাল লাহে তাআলা।")

বাংলা : অপবিত্রতা দূর করার জন্য, নামায বিশুদ্ধভাবে আদায় করার জন্য এবং মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য ওজু করার নিয়ত করলাম।

(১) এরপর দুহাত কব্জি পর্যন্ত পানি দিয়ে ধোয়া। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আঙ্গুলের ফাঁকে ঠিকমত পানি লাগে অর্থাৎ ধোয়া হয়। সেজন্য পরস্পর হাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করান। (২) তারপর তিনবার মুখ ভরে পানি নিয়ে কুল্লি করা এবং কুল্লির সময় গরগরা করা। (৩) এবার ডান হাতে পানি নিয়ে দু নাকের ছিদ্রে দেওয়া এবং বাম হাতের কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি নাকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ধোয়া। একইভাবে তিনবার নাকে পানি দিয়ে ধোয়া। (৪) এবার দুহাত একত্র করে অঞ্জলি পূর্ণ পানি নিয়ে মুখমণ্ডল (কপালে চুল

ওঠার জায়গা থেকে, দু কানের লতি এবং দাড়ির নিচের থুতনীর হাড় পর্যন্ত) ভালভাবে তিনবার ধোয়া, কোনভাবে যেন মুখের কোন অংশ শুকনো না থেকে যায়। (দাড়ির চুলের গোড়ায় যাতে পানি লাগে লক্ষ্য রাখতে হবে)। (৫) এবার পানি হাতে নিয়ে দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধুতে হবে। প্রথমে ডানহাত তারপর বামহাত ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে। (৬) এবার আবার দুহাত কব্জি পর্যন্ত পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে প্রথমে হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে তিনটি আঙ্গুলের তালুর দিক দিয়ে কপালের দিক থেকে ঘাড় পর্যন্ত চুলের উপর মুছতে হবে। এবং কানের উপরিভাগে মাথার দুপাশ ঘাড়ের দিক থেকে কপালের দিকে হাতের তালু দিয়ে চুলের উপর মাসেহ (মুছা) করতে হবে। এরপর বৃদ্ধ আঙ্গুলদ্বয় দ্বারা নিচ থেকে উপরের দিকেকানের পেছন দিক মুছতে হবে এবং তর্জনি আঙ্গুলদ্বয়কে কানের ছিদ্রদ্বয়ে প্রবেশ করাতে হবে। শেষে হাতের তালুর বিপরীত দিক দিয়ে ঘাড় মুছতে হবে। ঘাড়ের মাঝের দিক থেকে গলার দিকে হাত আনতে হবে। (৭) সব শেষে পায়ের গোড়ালির উপরের গাঁট পর্যন্ত দু পা ধুয়ে নিতে হবে এবং যাতে পায়ের আঙ্গুলের খাঁজগুলো শুকনো না থেকে যায় সেজন্য হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের ফাঁক থেকে পর পর আঙ্গুলের ফাঁকগুলিতে প্রবেশ করিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে।

ওজুর ফরজ কটি ও কি কি ?

ওজুর ফরজ চারটি যথা : (১) মুখমণ্ডল ধোয়া অর্থাৎ কপালের উপরে চুল ওঠার জায়গা থেকে চিবুকের নীচ (থুতনি) পর্যন্ত এবং এক কানের গোড়া থেকে অপর কানের গোড়া পর্যন্ত ধোয়া। (২) মাথার এক চতুর্থাংশ মোছা বা মাসেহ্ করা। (৩) দুহাত কনুই পর্যন্ত ধোয়া। (৪) দু পা গোড়ালীর উপরের গাঁট পর্যন্ত ধোয়া।

ওজুর সুন্নতগুলি কি কি ?

(১) প্রথমে ওজুর নিয়ত করা। (২) ওজু শুরু করার আগেই বিসমিল্লাহ্ বলা। (৩) দু হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া। (৪) মেসওয়াক করা বা দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজা। (৫) তিনবার কুল্লি করা। (৬) তিনবার

নাকের ছিদ্রে পানি দেওয়া। (৭) দাড়ির ভিতরে অঙ্গুলি ভরে খেলাল করা। (৮) হাতের ও পায়ের আঙ্গুলে আঙ্গুল ভরে খেলাল করা। (৯) প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধোয়া। (১০) সমস্ত মাথা একবার মাসেহ (মোছা) করা। (১১) উভয়কালে পশ্চাৎ ভাগ মাসেহ করা। (১২) ওজুর সব কাজগুলিই ধারাবাহিক (তরতীব) অনুযায়ী করা। (১৩) ওজু করার সময় দেরী না করে পরপর অঙ্গগুলি ধোয়া। এই ধোয়ার কাজ করার সময় কোন ভাবেই এক অঙ্গ ধোয়া থেকে অপর অঙ্গ ধোয়া পর্যন্ত এমন বিরতি না রাখা যাতে পূর্ববর্তী অঙ্গ শুকিয়ে যায়। (১৪) রোজা না থাকলে তৃতীয়বার কুল্লি করার সময় গরগরা করা।

ওজুর মোস্তাহাব কি কি ?

ওজুর মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলি মোস্তাহাব যথা : (১) কেবলামুখী হয়ে বসে ওজু করা। (২) পরিষ্কার উঁচু জায়গায় বসে ওজু করা। (৩) ওজুর প্রত্যেক বিষয় ডান দিক থেকে শুরু করা। (৪) ঘাড় মাসেহ করা। (৫) বাম হাতের কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা। (৬) আংটি চুড়ি ইত্যাদি থাকলে তাকে নড়িয়ে তার মধ্যে পানি প্রবেশ করান। (৭) প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা। (৮) প্রত্যেক অঙ্গ ভাল করে ধোয়া। (৯) ওজু করার সময় কোন রকম সাংসারিক কথাবার্তা না বলা। (১০) উভয় পা বাম হাত দিয়ে ধোয়া। (১১) বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে কারো সাহায্য ছাড়া ওজু করা। (১২) নামাযের সময়ের আগেই ওজু করা। (১৩) ওজু শেষে ওজুর পাত্রের পানির কিছুটা পান করা। (১৪) ওজু শেষ করে কালেমা শাহাদাত ও দরূদ শরীফ পড়া। (১৫) ওজুতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি খরচ না করা।

ওজুর মাকরূহ কি কি ?

ওজু করার সময় নিম্নবর্ণিত কাজগুলি করা মাকরূহ। (১) অপরিচ্ছন্ন ও নাপাক জায়গায় ওজু করা। (২) ডান হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করা। (৩) ওজু করার সময় দুনিয়াদারি (পার্থিব) বিষয় কথাবার্তা বলা। (৪) মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় মুখের উপর সজোরে পানি ছিটান। (৫) ওজুতে

কোন অঙ্গ তিন বারের বেশী বা কম ধোয়া। (৬) ওজু করার সময় অযথা পানি খরচ করা। (৭) বিনা কারণে শুধু বাম হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ধোয়া। (৮) নিজের জন্য ওজুর পানি নির্দিষ্ট করে রাখা।

কি কি কারণে ওজু নষ্ট হয়?

নিম্নবর্ণিত কাজগুলি করলে ওজু নষ্ট হয়ে যায় এবং পুনঃ ওজু করতে হয়। যথা: (১) পেচ্ছাব, পায়খানা করা বা পেচ্ছাব ও পায়খানার দ্বার দিয়ে কিছু বের হওয়া। (২) শরীরের কোথাও থেকে রক্ত পুঁজ ইত্যাদি বের হওয়া এবং তা গড়িয়ে পড়া। (৩) মুখ ভরে বমি হওয়া। (৪) চিৎ বা কাত হয়ে কিংবা কোনকিছুর উপর হেলান দিয়ে নিদ্রা যাওয়া। (৫) যে কোন কারণে জ্ঞান হারান। (৬) পাগল হয়ে যাওয়া। (৭) মাতাল হয়ে যাওয়া। (৮) দাঁত থেকে এতটা পরিমাণ রক্ত বের হওয়া যা থুতুর সমান বা বেশী। (৯) নামাযের মধ্যে অট্টহাস্য করা বা জোরে হেসে ওঠা। (১০) উলঙ্গ হওয়া।

ওজুতে অঙ্গগুলি ধোয়ার সময় কমপক্ষে কতটা পানি অঙ্গে লাগান প্রয়োজন?

ওজুর সময় কমপক্ষে এতটা পরিমাণ পানি ব্যবহার করতে হবে যেন ধৌত অঙ্গগুলি থেকে পানি ঝরে পড়ে। নইলে যদি এমন ভাবে মোছা হয় যে, কোন অঙ্গ থেকে পানি ঝরে পড়ল না তাহলে ওজু অসম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে।

কমপক্ষে কতবার অঙ্গগুলি ধোয়া প্রয়োজন?

অন্ততঃ পক্ষে একবার ধোয়া বাধ্যতামূলক। তিনবার ধোয়া সুন্নত। তিনের অধিক বার ধোয়া মাকরূহ।

যদি কোন অঙ্গ অল্প পরিমাণ শুকনো থেকে যায় তাহলে ওজুর কোন ক্ষতি হবে কি?

ওজু করার সময় কোন অঙ্গের এক চুল পরিমাণ অংশও যদি শুকনো থাকে তা হলে ওজু বৈধ হবেনা অর্থাৎ ওজু হয়েছে বলে গণ্য হবেনা।

ওজুতে ধোয়ার জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গগুলিতে অতিরিক্ত অংশ থাকলে তা কি ধোয়া বাধ্যতা মূলক?

হ্যাঁ, যদি হাতে বা পায়ে পাঁচের অধিক আঙ্গুল থাকে বা কোন অঙ্গে আব জাতীয় কোন অতিরিক্ত অংশ থাকে তা ধোয়া বাধ্যতামূলক।

মাসেহ্ করা কী ?

পানিতে হাত ভিজিয়ে সেই ভেজা হাতে শরীরের কোন অংশ মোছাকে মাসেহ্ বলে। প্রত্যেক অঙ্গ মাসেহ্ করার সময় নতুন করে হাত পনিতে ভিজিয়ে নেওয়া ভাল।

কারো হাত কাটা হলে কনুইয়ের নিচের বাকী অংশ ধোয়া কি তার জন্য বাধ্যতামূলক ?

যদি কারো কব্জি পর্যন্ত বা আরও বেশী অংশ কাটা হয় কিন্তু কুনুইএর নীচের অনেকটা অংশ থাকে তাহলে কুনুই এর নীচের অংশটি কুনুই থেকে ধোয়া বাধ্যতামূলক।

কি ভাবে ওজুর নিয়ত করতে হবে ?

নিয়ত করার অর্থ হল কোন কাজের জন্য মনস্থির করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ওজুর সময় নিজের মনকে এই ভাবে স্থির করতে হবে যে তিনি অপবিত্রতা দূর করার জন্য, পবিত্রতা অর্জনের জন্য ও সালাত (নামায) আদায়ের উদ্দেশ্যে ওজু করছেন। মনে মনে এই ব্যাপারগুলি ভেবে স্থির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওজু করাই হল নিয়ত করা। এটা মুখে প্রকাশ্যে উচ্চারণ বাধ্যতামূলক না হলেও কোন ভাবে উচ্চারণ করা অর্থাৎ নিয়তকে বাক্যাকারে বলায় কোন ক্ষতি নেই বরং একটি পরিপূর্ণ অভ্যাসে পরিণত হয়ে মঙ্গল সাধন করে।

মেসওয়াক কি এবং তা করার নিয়ম কি ?

মেসওয়াক হল দাঁত মাজা। এই দাঁত মাজার বিষয় হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) খুবই তাগিদ করেছেন। দাঁতনের সাহায্যে দাঁত মাজা ভাল। এক্ষেত্রে নিমের দাঁতন বা মেসওয়াক কিনতে পাওয়া যায় তার সাহায্যে দাঁত মাজা যেতে পারে। দাঁতন হাতের তালুর চেয়ে অধিক লম্বা হওয়া উচিৎ নয় অর্থাৎ এক বেঘতের বেশী না হওয়া ভাল। প্রথমে দাঁতের ডানদিক তার পর বাম দিক মাজা উচিৎ। দাঁত মাজার সময় পরিষ্কার পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

গরগরা করা কি ও কি ভাবে করতে হয় ?

হযরত ওজু ও গোসলের সময় গরগরা করতেন। তবে রোজা

থাকলে গরগরা করা চলবে না তাছাড়া সকলেরই ওজু করার সময় গরগরা করা উচিৎ। ডান হাতে পানি নিয়ে কুল্লি করার মত মুখে নিতে হবে এবং উপরের দিকে মুখ করে গলার মধ্যে পানি নিয়ে গল্‌গল্‌ শব্দ করে পানি ফেলে দিতে হবে। এতে গলার মধ্যের ময়লা পরিষ্কার হয়। আর পরিষ্কারই ওজু ও গোসলের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এছাড়া ওজুর সময় কি কি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার?

ওজুর জন্য নিম্নলিখিত বিষয় গুলির প্রতি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

(১) কানের ছিদ্রদ্বয়ে ভেজা আঙ্গুল প্রবেশ করান বিশেষতঃ কনিষ্ঠ আঙ্গুল।

(২) নামাযের সময় হওয়ার আগে ওজু করা।

(৩) অঙ্গুলি ধোয়ার সময় ভাল করে ঘসা!

(৪) হাতে বা গলায়, চুড়ি আংটী, হার, চেন ইত্যাদি থাকলে তা ঘুরিয়ে বা সরিয়ে তার মধ্যে পানি প্রবেশ করান।

(৫) কোন পার্থিব বিষয় কথাবার্তা না বলা।

(৬) মুখমণ্ডলে সজোরে পানির ঝাপটা না দেওয়া।

(৭) ওজু শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহ্‌ বলা।

(৮) মুখের মধ্যে খুব বেশী পরিমান পানি কুল্লির জন্য না ভরা।

(৯) ওজুর শেষে কালেমা শাহাদাত পড়া।

(১০) ওজু শেষে অবশিষ্ট পানি থেকে কিছুটা পান করা।

(১১) ওজু করার পর 'তাহিয়াতুল ওজু' (ওজুর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য) তুরাকাত সালাত (নামায) আদায় করা ইত্যাদি।

পানি না পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে কি করতে হবে?

পানি পাওয়া না গেলে বা ব্যবহারে অক্ষম হলে ওজুর বা গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তায়াম্মুম

তায়াম্মুম কি ?

পানি না পাওয়া গেলে বা অসুস্থতা হেতু পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে যে পদ্ধতিতে নামাযের জন্য অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হাওয়া যায় তাকে তায়াম্মুম বলে।

তায়াম্মুম কি দিয়ে করতে হয় ?

পবিত্র এক খণ্ড মাটি বা মাটি জাতীয় কিছু ধূলা ইত্যাদির সাহায্যে তায়াম্মুম করতে হয়।

কিভাবে তায়াম্মুম করতে হয় ?

প্রথমে বিসমিল্লাহ্ পড়ে তায়াম্মুমের নিয়ত করতে হবে। তারপর মাটি জাতীয় ধূলোর উপর হাত রেখে সামনে ও পিছনে হাত ঘসে নিতে হবে ; এবার হাত ঝেড়ে প্রথমে দুহাতের তালুর দিক দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ্ করতে হবে। ওজুর জন্য মাসেহ্ করার যতটা অংশ তায়াম্মুমের জন্যও ততটাই অংশ অর্থাৎ চুলওঠার জায়গা থেকে গলায় থুতনি পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলের অংশটি ঐ হাতের তালুদ্বয় দ্বারা ওজুর মত একবার মাসেহ্ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে সামান্য চুল পরিমাণ অংশও মাসেহ্ করতে বাদ পড়ে না যায়। এবার পুনরায় দুহাত আবার আগের মত মাটিতে রেখে মাটি লাগিয়ে নিয়ে প্রথমে বাম হাতের তালুর কিছুটা এবং মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলির পেটের দিক দিয়ে ডানহাতের পিঠের দিকে আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে কনুই পর্যন্ত মুছে নিতে হবে এবং তালুর অবশিষ্ট অংশ আর বৃদ্ধ ও তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে কনুই এর দিক থেকে আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত হাতের উপরিভাগ মুছে নিতে হবে। একইভাবে ডান হাতের দ্বারা বাম হাতও মুছতে হবে। এক কথায় ওজুর সময় মুখমণ্ডল ও হাত যেভাবে পানির সাহায্যে ধোয়া হয় ঠিক একই ভাবে তায়াম্মুমের সময় মাটির সাহায্যে মুছে নিতে হবে।

তায়াম্মুমের নিয়ত কি ?

তায়াম্মুমের নিয়ত হল :

نَوَيْتُ اَنْ اَتَيَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى *

("নাওয়াতো আন আতাইয়াম্মামা লেরাফ্‌য়িল হাদাসে ওয়া এসতেবাহাতান লিস সালাতে অতাকাররোবান এলাল লাহে তাআলা।"

বাংলায় : অপবিত্রতা দূর করা ও সালাত আদায় করার জন্য এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য তায়াম্মুম করছি।

তায়াম্মুমের ফরজ (অবশ্যপালনীয়) কি কি ?

তায়াম্মুমের মধ্যে তিনটি কাজ বাধ্যতামূলক বা ফরজ। (১) নিয়ত করা (২) মুখমণ্ডল মাসেহ্‌ করা (৩) দুহাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ্‌ করা।

তায়াম্মুমের মধ্যে সুন্নত কাজগুলি কি কি ?

তায়াম্মুমের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা সুন্নত। (১) বিসমিল্লাহ্‌ বলা (২)-(৩) মাটিতে দুহাত মারা ও হস্তদ্বয় সামনে পিছনে ঘসা। (৪) অতিরিক্ত ধুলো হাতে লেগে থাকলে তা ঝেড়ে নেওয়া (৫) কোন রকম বিরতি না দিয়ে পরপর মাসেহ্‌ করা (৬) হস্তদ্বয়ের পরস্পরের আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে খেলাল করা। (৭) তায়াম্মুমের নিয়মের প্রতি নজর রাখা।

তায়াম্মুম নষ্ট হয় বা ভেঙ্গে যায় কিভাবে ?

যে যে কারণে ওজু নষ্ট হয়, ওজুতে যা যা মাকরূহ্‌ ইত্যাদি তায়াম্মুমও ঐ একই কারণে একই ভাবে নষ্ট হয় বা ভেঙ্গে যায়।

কি অবস্থায় তায়াম্মুম করা অনুমোদিত ?

যদি কেউ নিম্নলিখিত অবস্থায় পানি না পায় তখন তার জন্য তায়াম্মুম করা অনুমোদিত।

(১) কাছাকাছি পানি না পাওয়া, এমন কি এক মাইলের মধ্যে কোথাও পানি না পাওয়া গেলে।

(২) পানির কাছে কোন অলঙ্ঘনীয় শত্রু থাকা, যেমন কারো ঘরের কুয়োতে পানি আছে কিন্তু ঘর থেকে বের হয়ে ওখানে পানি সংগ্রহ করতে গেলে কোন শত্রু তাকে হত্যা করবে। অথবা তার গৃহে চুরি হয়ে যাবে অথবা কুয়ো, পুকুরের ঘাটে বৃহৎ সাপ বা সিংহ ইত্যাদি প্রাণ সংহারক জীব জন্তু, মানুষ ইত্যাদি অপেক্ষা রত হলে তায়াম্মুম করা বৈধ।

(৩) এত অল্প পরিমাণ পানি আছে যে তা ওজুতে খরচ করে ফেললে পিপাসায় কষ্ট পেতে হবে অথচ এক মাইলের মধ্যে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

(৪) কুয়ায় পানি আছে কিন্তু তা থেকে পানি তোলার মত দড়ি নেই।

(৫) পানি কাছাকাছি আছে কিন্তু কোন লোকের পক্ষ শারীরিক অক্ষমতাহেতু পানির কাছে যাওয়া সম্ভব নয় বা কাকেও সাহায্যকারী না পাওয়া। এগুলিও পানি না পাওয়ার অবস্থা বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোসল বা অবগাহন

গোসল কি ?

গোসল আরবী শব্দ। গোসল অর্থ হল ধোয়া। শরীরের সকল অঙ্গকে পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করা ও শরীরে কোন অপবিত্র কিছু লেগে গেলে তা পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করাকে গোসল বলে। গোসলকে বাংলায় স্নান বা অবগাহন বলা হয়।

কতরকম গোসল আছে ?

গোসল তিন রকম। (১) ফরজ বা অবশ্যপালনীয় (২) সুন্নত অর্থাৎ

যে যে অবস্থায় হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) গোসল করেছেন। (৩) মোস্তাহাব অর্থাৎ যে যে সময় গোসল করা উত্তম তবে না করলেও অপবিত্র গণ্য করা যাবে না। (৪) আরও দুটি কারণে যে গোসল করতে হয় তাকে ওয়াজেব বলে। যেমন মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়ান এবং না পাক অবস্থায় অবিশ্বাসী (কাফের) মুসলমান হলে বা ইমান আনলে যে গোসল করতে হয়।

গোসল করার নিয়ম কি ?

গোসলের প্রয়োজন হলে বা গোসলের মনস্থ করলে—পুকুরেই হোক বা গোসল খানায় হোক প্রথমে দুহাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর লজ্জা স্থান ও শরীরের ময়লা জমে থাকার অপ্রকাশ্য জায়গাগুলো হাত দিয়ে রোগড়ে ধুয়ে নিতে হবে। তার পর গরগরা সহ ওজু করতে হবে তবে পা ধোয়া বাকী থাকবে। এরপর তিনবার পানি দিয়ে ভাল করে সারা শরীর ধুয়ে নিতে হবে। সবশেষে পা ধুতে হবে।

গোসল খানায় হলে মাথায় পানি ঢালার পর ডান কাঁধে এবং তারপর বাম কাঁধে তিনবার পানি ঢালতে হবে এবং সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন শরীরের কোন অঙ্গে ময়লা থেকে না যায় বা কোন অংশ শুকনো থেকে না যায়। স্ত্রীলোকদের চুড়ি, নাকফুল বা অন্যান্য গহনা পরা থাকলে সেগুলোকে ঘুরিয়ে নড়িয়ে তার মধ্যে এমনভাবে পানি প্রবেশ করাতে হবে যাতে শরীরের ঐ অংশগুলির কোথাও বিন্দুমাত্র শুকনো না থাকে। মেয়েদের বেণী বাঁধা থাকলে তা না খুললেও চুলের গোড়ায় যাতে পানি পৌঁছায় তেমনভাবে গোসল করতে হবে। আর যদি বেণী বাঁধা না থাকে অর্থাৎ চুল খোলা থাকে তা হলে চুল ভিজিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। সব শেষে দু পা ধুতে হবে।

কখন গোসল করা ফরজ ?

(১) ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় বীর্য নির্গত হলে (২) সহবাস করলে, কামোত্তেজনা বশতঃ বীর্যোস্খলন হলে। (৩) স্ত্রীলোকের হায়েজ (মাসিক ঋতুস্রাব) নেফাসের (সন্তান প্রসবের পর যে স্রাব হয়) রক্তস্রাব বন্ধ হলে।

কখন গোসল করা ওয়াজেব ?

দু অবস্থায় গোসল করা ওয়াজেব। (১) মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর (২) নাপাক অবস্থায় কোন লোক মুসলমান হলে বা ইসলামধর্ম গ্রহণ করলে।

কখন গোসল করা সুন্নত ?

চার অবস্থায় গোসল করা সুন্নত। (১) শুক্রবারে জুমআর নামাযের জন্য (২) দুই ঈদের নামাযের জন্য (৩) হজ্বের ওমরাহ্‌র জন্য এহরাম পরিধানের পূর্বে। (৪) হজ্বের দিন আরাফার ময়দানে অবস্থানের জন্য।

কখন গোসল করা মোস্তাহাব ?

কিছু কিছু সময় গোসল করা মোস্তাহাব বা উত্তম। যথা (১) ১৫ই সাবান অর্থাৎ সবেবরাতের রাতে। (২) চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সালাত বা নামায পড়ার জন্য (৩) সালাতুল ইসতেসকা বা বৃষ্টির নামাযের জন্য (৪) মক্কা ও মদিনা শহরে প্রবেশের পূর্বে। (৫) অমুসলমানের মুসলমান হওয়ার পর। (৬) আরাফার দিনের পূর্ব রাত্রে অর্থাৎ ৮ই জিলহজ্ব রাত্রে। (৭) যিনি মৃতের গোসল দিয়েছেন।

গোসলের মধ্যে কি কি কাজ ফরজ ?

গোসল করার সময় তিনটি কাজ করা ফরজ। (১) গরগরা সহ কুল্লি করা (২) নাকের ছিদ্রে পানি দেওয়া ও বামহাতের বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে পরিষ্কার করা। (৩) সমগ্র শরীর পানি দিয়ে ভাল ভাবে ধোয়া।

গোসলের মধ্যে কি কি কাজ সুন্নত ?

গোসলের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলি সুন্নত। যথা (১) কব্জি পর্যন্ত দুহাত ধোয়া। (২) শরীরের গোপন অঙ্গগুলি ও অপরিষ্কার জায়গাগুলি ভাল করে রগড়ে ধুয়ে ফেলা। (৩) অবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নিয়ত করা। (৪) ওজু করা। (৫) সারা শরীর তিন বার পানি দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলা। (৬) গোসল শেষে উঁচু জায়গায় পা ধোয়া।

গোসলের নিয়ত কি ?

গোসলের নিয়ত হল :

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ

(নাওয়াতুল গোসলা লেরাফয়েল-জানাবাতে।)
বাংলায় : নাপাকী দূর করার জন্য গোসলের নিয়ত করছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শরীর পাক বা পবিত্র করা

শরীর পবিত্র হওয়া বলতে কি বোঝায় ?

শরীর পবিত্র বলতে শরীরের কোন অংশে কোন নোংরা ও অপরিচ্ছন্নতাকে পরিষ্কার করা বোঝায়। এমনভাবে পরিষ্কার করতে হবে যাতে শরীরের কোন অংশে কোন অপবিত্র নোংরা (নাজাসাত) লেগে না থাকে। দুভাবে শরীরকে পবিত্র করতে হবে, প্রথমতঃ যদি কোন বাহ্য ময়লা বা অপবিত্র কিছু থাকে তা পরিষ্কার করা যেমন—রক্ত-মল-মূত্র ইত্যাদি যা বিবেকের সাহায্যে অপবিত্র বলে বোঝা যায় তা পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং ওজু করতে হবে। আর গোসল ফরজ হয়ে থাকলে তা আগেই করে নিয়ে ওজু করে নৈতিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা ইত্যাদিকে শরীর পবিত্র হওয়া বোঝায়।

যে কেউ সালাত আদায় করার ইচ্ছা করবে তাকে অবশ্যই সালাতের পূর্বে পবিত্র হয়ে নিতে হবে।

অপবিত্রতা কত রকম ?

অপবিত্রতা মোটামুটিভাবে দু'রকম। যথা (১) 'বাহ্যিক' অর্থাৎ মলমূত্র-পরিত্যাগ করা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ক্রিয়া, শরীরের রক্তক্ষরণ, মদ্যপান ইত্যাদি। (২) 'নৈতিক' অর্থাৎ ওজু, গোসল ইত্যাদি করা।

বাহ্যিক অপবিত্রতা কি ও কত রকম ?

বাহ্যিক অপবিত্রতা দু'রকম। প্রথমতঃ মানুষের মল-মূত্র, বীর্য, হায়েজ

নেফাসের রক্ত, মদ, হারাম পশুর মল-মূত্র, শিশুর মল-মূত্র ইত্যাদি। এগুলি হল বৃহৎ বা ব্যাপক অপবিত্রতা বা 'নাজাসাতে গালিজা'। দ্বিতীয়তঃ হালাল পশুর প্রস্রাব, হারাম পাখীর মল, ঘোড়া বা খচ্চরের লালা বা প্রস্রাব এবং মাছের রক্ত ইত্যাদি হল হালকা অপবিত্র বা 'নাজাসাতে খাফিফা'।

পবিত্র হওয়ার নিয়ম কি ?

অপবিত্রতার প্রকৃতি অনুযায়ী পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। যেমন কতগুলি ক্ষেত্রে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসলের প্রয়োজন, কতগুলি ক্ষেত্রে ওজু ও তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্র হওয়া যায়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতিতে পানির সাহায্যে পবিত্র হতে হয়। যেমন মল-মূত্র ত্যাগ।

মল-মূত্র ত্যাগের নিয়ম কি ও কিভাবে পবিত্র হওয়া যায় ?

প্রস্রাব : মূত্র ত্যাগের সময় কেবলার দিকে মুখ ও পিঠ করে না বসে ভালভাবে মূত্র ত্যাগ করতে হবে। মূত্র ত্যাগ শেষ হলে নিজেকে নিঃসন্দেহ হতে হবে যে আর কোনভাবেই বিন্দুমাত্র মূত্র বের হবে না। এবার পবিত্র মাটি, ধূলা, পাথর, পুরাতন বা নতুন ন্যাকড়া, তুলা ইত্যাদির সাহায্যে ভাল করে মূত্রাঙ্গ শুকিয়ে নিতে হবে (একে কুলুখ নেওয়া বলে)। কিন্তু ঘুটে, কাঠ, ঘাস, কয়লা, কাগজ, হাড় এবং কোন খাদ্যদ্রব্যের সাহায্যে একাজ করা নিষেধ। এরপর পানি দ্বারা তিনবার মূত্রাঙ্গের অগ্রভাগ ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। স্ত্রীলোকদের জন্য কেবলমাত্র পানি দ্বারা ধুয়ে নেওয়াই যথেষ্ট।

মলত্যাগ : মলত্যাগের সময় জনসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে নির্জন নিরালা জায়গায় গিয়ে ভালভাবে মলত্যাগ করতে হয়। ঘেরা পায়খানা হওয়াই উত্তম। খোলা জায়গায়, লোকের দৃশ্যমান জায়গায় পায়খানা করা নিষেধ। পায়খানায় প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পা রেখে 'বিসমিল্লাহ্' বলে প্রবেশ করে এই দোওয়া পড়তে হয় :—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ *

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযোবেকা মেনাল-খুবসে ওয়াল খাবায়েসে।)

বাংলায় ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে সকল প্রকার অপবিত্রতা ও শয়তানের কু-দৃষ্টি থেকে আশ্রয় চাইছি।

পায়খানা করার সময় কোন কথা বলা, পবিত্র কোরআন, হাদিস পড়া, আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া নিষিদ্ধ। মলত্যাগ শেষে শুকনো মাটি বা পাথর দিয়ে মলদ্বার পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এরপর পানি দ্বারা শৌচকার্য করতে হয়। শৌচকার্য বা মোছার (কুলুখ নেওয়ার) সময় সর্বদা বাম হাত ব্যবহার করতে হয়। কুলুখের সাহায্যে মোছা সুন্নত তবে কুলুখের দ্বারা পরিষ্কার না করে শুধু পানি দ্বারা শৌচকার্য অর্থাৎ ধুয়ে পরিষ্কার করাও অনুমোদিত। ইসলাম ধর্মের ব্যবহারিক নীতিগুলি প্রত্যেকটিই শৃঙ্খলাবদ্ধ। সুশৃঙ্খল জীবনযাপন ইসলামের অঙ্গ। পায়খানায় খালি মাথায় বা খালি গায়ে যাওয়া উচিৎ নয়। পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দোওয়া ঃ

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ مَا يُؤْذِيْنِىْ
وَاَمْسَكَ عَلَىَّ مَا يَنْفَعُنِىْ *

(গুফরানাকা আলহামদো লিল্লাহিল-লাযি আযহাবা আন্নি-মা ইউযিনী অ আমসাকা আলাইয়া মা ইয়ানফায়োনী)।

বাংলায় ঃ আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমার কষ্ট দূর করেছেন এবং যিনি আমাকে আরাম দিয়েছেন।

শরীরে অন্য কোন অপবিত্রতা লাগলে তা পরিষ্কারের নিয়ম কি ?

শরীরের কোথাও কোন অপবিত্র কিছু লাগলে তা পানির দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তবে এক দেরহাম পরিমাণ জায়গায় কোন 'বৃহৎ' অপবিত্র লাগলে তা শুকিয়ে পরিষ্কার হয়ে থাকলে তা আর ধুয়ে পরিষ্কার না করলেও চলবে। আর যদি এক চতুর্থাংশের কম অংশে হাল্‌কা অপবিত্র কিছু লাগে তা পরিষ্কার না করলে চলবে। এক চতুর্থাংশ বলতে যে অংশে

ময়লা লেগেছে তার ¼ অংশ বোঝায়। সমগ্র বস্ত্র বা অঙ্গের ¼ অংশ নয়। এই পরিমাণ ময়লা বা নাজাসাত বৈধ। এর বেশী পরিমাণ লাগলে তা পানি দিয়ে তিনবার ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরিধেয় বস্ত্র পাক বা পবিত্র করা

কাপড় জামা বা পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র হওয়ার অর্থ কি?

বস্ত্র পবিত্র হওয়া সালাতের দ্বিতীয় পূর্বশর্ত। কাপড় তথা জামা, পা-জামা, লুঙ্গী, টুপি, পাগড়ী, কোট-প্যান্ট ইত্যাদি যা সালাত আদায়ের জন্য পরিধান করা হয় তা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যদি এইসকল পরিধেয় বস্ত্রে অপবিত্র কিছু লাগে তাহলে তাকে পানিতে ধুয়ে ফেলতে হবে। প্রত্যেকবার পানিতে ধুয়ে নিংড়ে নিয়ে আবার ধুয়ে নিংড়ে নিতে হবে। এইভাবে তিনবার ধুয়ে পবিত্র করে নিতে হবে। যদি কাপড়ে এক দেরহাম বা তার কম পরিমাণ 'ব্যাপক অপবিত্র' কিছু লাগে বা এক-চতুর্থাংশের কম পরিমাণ কাপড়ে 'হাল্‌কা অপবিত্র' কিছু লাগে সেক্ষেত্রে না ধুয়েও সালাত আদায় করা যায় তবে তা না করে ধুয়ে নেওয়াই উত্তম। কেউ অনুরূপ অপবিত্র লাগা কাপড় পরিধান করে সালাত প্রতিষ্ঠা করলে তা পুনঃ আদায় করতে হবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্থান বা জায়গা পাক বা পবিত্র হওয়া

সালাতের জায়গা বা স্থান পবিত্র হওয়া কি?

সালাতের স্থান পবিত্র হওয়া বলতে সালাতের জন্য দাঁড়ানর, হাঁটু রাখার, সেজদার সময় কপাল ও নাক ঠেকানর এবং হাতের তালু রাখার জায়গা

পবিত্র হওয়া বোঝায়। যদি কোন পাথর, ইটের বা ঢালাই করা মেঝে কিংবা ছাদ বা কাঠের পাটাতনের উপর সালাতের জন্য দাঁড়ান হয় এবং তার বিপরীত দিকে কোন অপবিত্র কিছু লেগে থাকে তাহলেও সালাতের কোন ক্ষতি হবে না। তবে যদি কোন পাতলা কাপড়ের উপর সালাতের জন্য দাঁড়ান হয় তার উভয় দিক পবিত্র না হলে তাকে পবিত্র গণ্য করা যাবে না এবং সালাতও বৈধ হবে না। কিন্তু ঐ কাপড় যদি এতটা মোটা বা পুরু হয় যে সালাত আদায়কারীর দৃষ্টিগোচর হবে না বা কোন দুর্গন্ধ ও দাগ লাগবে না তাহলে সেখানে সালাত বৈধ হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন অপবিত্র জায়গার উপর কাপড় বা মোসাল্লা বিছান হয় এবং মোসাল্লায় বা কাপড়ে কোনরকম দাগ লাগার বা কোন দুর্গন্ধ লাগার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সে জায়গাতেও সালাত বৈধ বলে গণ্য হবে। সাধারণভাবে কোন জায়গাকে ঐ একই পদ্ধতিতে পবিত্র করলে তা পাক বা পবিত্র বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আযান, একামত ও সালাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

আযান বা নামাযের আহ্বান

'আযান' বলতে কি বোঝায়?

আযান হল সালাতের জন্য উচ্চস্বরে আহ্বান (চিৎকার নয়)। পাঁচ ওয়াক্তের ও জুমআর সালাতের জন্য আযান দেওয়া সুন্নত। প্রত্যেক **'ফরজ'** বা অবশ্যপালনীয় সালাতের জন্য ঠিক সময় উচ্চস্বরে আযান দিতে হয়। যদি কোন সালাতের সময় হওয়ার পূর্বেই আযান দেওয়া হয়ে যায় তা হলে সময় হলে পুনরায় ঐ আযান দিতে হবে। হিজরী প্রথম বছরে এই আযান প্রচলিত হয়। কতকগুলি আরবী শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট সময় সালাত আদায় করার জন্য যে আহ্বান জানান হয় প্রকৃত অর্থে তাকেই আযান বলে। যিনি এই আহ্বান জানান তাঁকে মোয়াজ্জেন বলে। আযান অর্থ হল

'আহ্বান' মোয়াজ্জেন অর্থ আহ্বানকারী। আযান কেবল মাত্র পুরুষের জন্য অনুমোদিত। কোন মহিলা আযান দিলে তা বৈধ বলে গণ্য হবে না। যে ভাবে আযান দিতে হবে তা হল :—

(১) মোয়াজ্জেনকে (যে ব্যক্তি আযান দেন) অবশ্যই সকল প্রকার অপরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হতে হবে।

(২) মোয়াজ্জেনকে একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়াতে হবে এবং কানের ছিদ্র দ্বয়ে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করে সুউচ্চস্বরে আযান ধ্বনিত করতে হবে।

(৩) আযানের পূর্বে ওজু করে নেওয়া উত্তম অবশ্য অন্য কোন ভাবে অপবিত্র না থাকলে ওজু ছাড়াও আযান দেওয়া যায়।

(৪) মসজিদের বাম দিকে দাঁড়িয়ে আযান দিতে হয়।

(৫) আযানের জন্য নিম্নলিখিত আরবী শব্দগুলি পরপর সুউচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে হয়। (বাংলা উচ্চারণ ও অর্থের জন্য পরের পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)। যথা :—

اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ,

আযানের শব্দগুলি বলার নিয়ম কি ?

আযানের নিয়ম হল :

প্রথমে মোয়াজ্জেনকে তৈরী হয়ে মসজিদের বাঁমদিকের কোন বরাবর একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত নিয়মে ঐ বিশেষ শব্দগুলি পরপর

আরবী ভাষায় ধ্বনিত করতে হয়। প্রত্যেক বাক্যের পর অল্প একটু থেমেই পুনরায় পরের বাক্যটি উচ্চস্বরে ধ্বনিত করতে হবে। মনে মনে বিসমিল্লাহ্ বলে কেবলামুখী হয়ে কানের ছিদ্রদ্বয়ে উভয় হাতের আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে সুমধুর স্বরে সুউচ্চ কণ্ঠে নিম্ন নিয়মে ধ্বনিত করতে হবে :—

১. প্রথমে পরপর চারবার বলতে হবে :—

اَللهُ اَكْبَرُ

(আল্লাহো আকবার)
বাংলাঃ আল্লাহ মহান

(দুবার বলার পর একটু থেমে দম নিয়ে পরের দুবার বলতে হবে।)

২. এরপর দুবার (প্রথম বারের পর থেমে দম নিয়ে দ্বিতীয়বার) বলতে হবে :

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

(আশাহাদো আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)

বাংলা :—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই

৩. এরপর দুবার (প্রথম বারের পর একটু থেমে দম নিয়ে দ্বিতীয়বার) বলতে হবে :

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

(আশাহাদো আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্)

বাংলা : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ।

৪. এবার দুবার (প্রথম বারের পর একটু থেমে দম নিয়ে দ্বিতীয়বার) বলতে হবে :

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

(হাইয়া আলাস সালাহ)
বাংলা : সালাতে জন্য এসো

(প্রত্যেক বার মুখ সোজা রেখে শুরু করে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে শেষ করতে হবে।)

৫. তারপর দুবার (প্রথমবারের পর একটু থেমে দম নিয়ে দ্বিতীয় বার) বলতে হবে :

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

(হাই-য়া আলাল ফালাহ)
বাংলা : সাফল্যের (মঙ্গলের) জন্য এসো

প্রত্যেক বার সোজা হয়ে শুরু করে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে শেষ করতে হবে।

৬. এবার কেবল মাত্র ফজরের আযানের ক্ষেত্রে দুবার (প্রথম বারের পর একটু থেমে দ্বিতীয় বার) বলতে হবে :

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

(আস্ স্বালাতো খায়রুম মেনান নাঁউম)
বাংলা : নিদ্রা অপেক্ষা সালাত উত্তম।

৭. অতঃপর দুবার (মধ্যে না থেমে) বলতে হবে :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(আল্লাহো আকবার)
বাংলা : আল্লাহ্ মহান

৮. সব শেষে একবার বলতে হবে :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)
বাংলা : আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

আযান শেষের প্রার্থনাটি কি ?

আযানের শেষের দোয়াটি হল :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ
مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ
مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

আল্লা হুম্মা রাব্বো হাযিহিদ্দাওয়াতিত তাআম্মাতে, ওয়াস স্বালাতিল কা'য়েমাতে, আতে মোহাম্মাদা নিল ওয়াসিলাতে, ওয়াল ফাজিলাতে, ওয়াদ-দারাজাতির রাফিআতা, ওয়াবআসহু মাকামাম্ মাহমুদা-নিল লাযি ওআদতাহু, ওয়ারজোকনা শাফাআতাহু ইয়াওমাল কেয়ামতে, ইন্নাকা লা তোখলেফুল মিআদ।

বাংলা ঃ—হে আল্লাহ্, এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এই নামাযের তুমিই প্রভু, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান, সুমহান মর্যাদা এবং বেহেশতের শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানেই তাঁকে অধিষ্ঠিত কর, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। আমাদের আহার্যদান কর এবং কেয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশের অধিকারী কর। নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ করনা অঙ্গীকার।

আযানের শ্রোতৃবর্গের কি করণীয় ?

যখন কোন লোক মোয়াজ্জেনের আযান শুনবেন তাঁর কর্তব্য হল তিনিও মনে মনে মোয়াজ্জেনের বলা বাক্যগুলি বলবেন। তবে যখন মোয়াজ্জেন 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলবেন তখন শ্রোতাকে বলতে হবে لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' (আল্লাহ্ ছাড়া কোন শক্তি বা

ক্ষমতা নেই)। আবার মোয়াজ্জেন যখন اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

বলবেন তখন শ্রোতাকে বলতে হবে صَدَّقْتَ وَبَرَرْتَ এরপর ওজু করে নামাযের জন্য এগিয়ে যাবেন। কিন্তু নিম্নলিখিত কাজগুলি করার সময় আযানের জওয়াব বলা যাবে না। যথা :

১. সালাত বা নামায অবস্থায় থাকলে।
২. খোতবা শ্রবণকালে তা সে জুমআ, বিবাহ ইত্যাদি যে কোন খোতবাই হোক না কেন।
৩. মহিলাদের হায়েজ (মাসিক ধাতু) বা নেফাস (সন্তান প্রসবের পরের) অবস্থায়।
৪. প্রস্রাব পায়খানায় থাকলে।
৫. আহার করার সময় ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একামাত বা নামাযে দাঁড়ানর আহ্বান

একামাত বলতে কি বোঝায় ? একামাত ও আযানের পার্থক্য কি ?

প্রত্যেক ফরজ সালাত আরম্ভের জন্য এমাম তার জায়গায় দাঁড়ালেই উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য মোয়াজ্জেন আযানের সকল উক্তিগুলি অল্প আওয়াজে দ্রুতলয়ে বলে থাকেন এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বাক্যটি বলার পর قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (কাদকামাতিস স্বালাত অর্থাৎ নামাজ আরম্ভ হয়েছে) বাক্যটি দুবার বলেন। এর পর আযানের অবশিষ্ট বাক্যগুলি বলে একামাত শেষ করেন এবং সকলেই ইমাম সাহেবের সঙ্গে সালাত আরম্ভ করেন। মোয়াজ্জেনের আযানের ন্যায় এই

বাক্যগুলি বলাকেই একামাত বলে। একামাত ও আযানের মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ :

১. একামাত মসজিদের অভ্যন্তরে দেওয়া হয় এবং আযান মসজিদের বাইরে দেওয়া হয়।

২. একামাত নীচুস্বরে বলা হয় আর আযান উচ্চস্বরে বলা হয়।

৩. একামাতের সময় কানের ছিদ্রে আঙ্গুল দিতে হয়না আযানের সময় কর্ণদ্বয়ের ছিদ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে রাখতে হয়।

৪. একামাত বলার সময় না থেমে একটানা বলতে হয় আর আযান থেমে থেমে দম নিয়ে বলতে হয়।

৫. একামাতে 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার সময় ডাইনে ও বামে মুখ ঘোরাতে হয়না, আযানে ঐ দুটি বাক্য বলার সময় উভয় দিকে মুখ ঘোরাতে হয়।

৬. একামাতে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বাক্যের পর 'কাদকামাতিস স্বালাহ' বলতে হয় আর আযানে 'কাদ কা মাতিস স্বালাহ' বলতে হয়না।

৭. ফজরের আযানে 'আস স্বালাতো খায়রুম মেনান নাউম' বলতে হয় কিন্তু একামাতেও বলতে হয় না।

৮. একামাত কেবলমাত্র জামাআত আরম্ভ হওয়ার জন্য ইমাম দাঁড়ালে বলতে হয়, আযানের জন্য ইমামাকে দাঁড়াতে হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সালাত বা নামাযের পূর্ব প্রস্তুতি

সালাতের পূর্বে কি কি করা প্রয়োজন ?

সালাতের পূর্বে সাতটি কাজ করা বিশেষ প্রয়োজন। যথা : (১) শরীর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা। (২) কাপড় জামা ইত্যাদি যাবতীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা। (৩) স্থান বা জায়গা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়া ও করা। (৪) সতর (শরীরের আবৃত করার অংশ) বস্ত্রাবৃত করা। (৫)

সালাতের নির্দ্ধারিত সময় হওয়া। (৬) কেবলামুখী হওয়া। (৭) সালাতের নিয়ত করা, এ সকল করণীয় কাজগুলির প্রথম তিনটি পবিত্রতা বিষয়ক ও পরের চারটি নীতি ও নিয়ম বিষয়ক। প্রথম তিনটি ইতিপূর্বে পবিত্রতার অধ্যায়ে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলি এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হ'ল।

১. সতর ঢাকা

সতর ঢাকা বলতে কি বোঝায় ?

সালাতের জন্য হোক বা সামাজিক ক্ষেত্রে হোক সতর (শরীরের নির্দ্দিষ্ট আবৃত রাখার অংশ) ঢেকে রাখা বা বস্ত্রাবৃত করে রাখা বাধ্যতামূলক। নারী পুরুষের শরীর আবৃত রাখার বিধানে অর্থাৎ সতর ঢাকায় পার্থক্য আছে। পুরুষের জন্য সতর হল—নাভি থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত মানব দেহের অংশ। যে কোন পুরুষের জন্য এই অংশ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। স্ত্রী লোকদের হল :—মুখমণ্ডল, হাতের তালুদ্বয় ও পায়ের পাতাদ্বয় ছাড়া শরীরের বাকী অংশ। যে কোন স্ত্রীলোকের জন্য ঐ অংশ ছাড়া বাকী অংশ আবৃত রাখা বাধ্যতামূলক। তবে যারা স্বাধীনা নন বা জীবিকার্জনের জন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন তাঁরা কার্যকালে কনুই-এর নীচের অংশ ও পদযুগলের নীচের গাট খোলা রাখতে পারেন কিন্তু সালাতের সময় তা আবৃত করতেই হবে। তিনবার 'সোবহানা রাব্বিআল আযীম' বলা যায় এতটা সময়ের বেশী সতরের কোন অংশ খোলা থাকলে সালাত শুদ্ধ হবে না। অন্ধকার বা নির্জন স্থানেও উলঙ্গ অবস্থায় সালাত আদায় বৈধ নয়। এমন কি কারো কাপড় না থাকলে গাছের ছাল বা পাতা যা হোক কিছু দিয়ে হলেও লজ্জাস্থান আবৃত করে তবেই সালাত আদায় করা যাবে। আর সামাজিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক নারী পুরুষের প্রকৃতি অনুযায়ী সতর আবৃত রাখা বাধ্যতামূলক ইসলামী বিধান। এর অন্যথাকারীকে পাপাচারের জন্য পরকালে আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগ করতে হবে।

২ সালাতের নির্দিষ্ট সময়

মুসলমানকে কি ভাবে আল্লাহ্‌র আরাধনা করতে হয় ?

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ্‌র আরাধনা করার পদ্ধতি নির্দ্ধারিত করা আছে। আরাধনার ক্ষেত্রে সেই বিধিনিষেধ অবশ্যই পালন করতে হবে। যেমন—(১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত ও নিয়ম মাফিক পড়া (২) রমজানে পুরো মাস ব্যাপী সিয়াম বা রোযা রাখা (৩) যাকাত (অতিরিক্ত সম্পদের জন্য নির্দিষ্ট হারে অর্থ দরিদ্রদের দেওয়া) আদায় করা (৪) বিত্তশালী লোকদের জীবনে একবার হজ্ব করা।

সালাত কি ?

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে প্রার্থনা করা ও আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করার যে বিধান পবিত্র কোরআন ও হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর হাদিস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তা হল সালাত বা নামায।

দিন ও রাত্রিতে কতবার সালাত আদায় করতে হয় ?

দিন রাত্রি মিলিয়ে মোট পাঁচবার সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলমান নারী পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক। বার বছর বয়ঃক্রম থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই পাঁচ বার সালাত আদায় করা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম কি ?

পাঁচ ওয়াক্ত অবশ্যপালনীয় সালাত বা নামাযের নাম হল : (১) সালাতুল ফজর বা ফজরের নামায (২) সালাতুল যোহর বা যোহরের নামায (৩) সালাতুল আসর বা আসরের নামায (৪) সালাতুল মাগরিব বা মাগরিবের নামায (৫) সালাতুল এ'শা বা এশার নামায।

৩. কেবলামুখী হওয়া

কেবলা মুখী হওয়া বলতে কি বোঝায় ?

যে কেউ সালাত বা নামায কায়েম করতে চাইলে তাকে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে। কেবলা অর্থাৎ কাআবা ঘর বা বায়তুল্লাহ্ (আল্লার

ঘর) সৌদী আরবের মক্কা শহরে। এই কাআবা হল বিশ্বের মুসলমানদের কেবলা। পৃথিবীর সকল মুসলমানকেই এইদিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে কাআবার দিকের পার্থক্য আছে। এই কাআবা ঘর প্রায় পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিতি। এর বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন দেশ। ভারত, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি কাআবা শরীফের পূর্বদিকে অবস্থিত। তাই এই সকল দেশের অধিবাসীগণকে পশ্চিমদিকে মুখ করে সালাত বা নামায আদায় করতে হয়। সুস্থ, অসুস্থ সকল ব্যক্তিকেই এই কাআবা ঘরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে হবে। দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তিগণ বসে বা শুয়েও এই কাআবা ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করলে তবেই শুদ্ধ হবে। অন্যথায় সালাত শুদ্ধ ও বৈধ হবে না। কেবল মাত্র দিক বিভ্রম জনিত ভুলের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হলে তাতে কোন অপরাধ হবে না বরং সালাত শুদ্ধ বলে গণ্য হবে।

৪. সালাতের নিয়ত করা

নিয়ত করা বলতে কি বোঝায় ?

নিয়ত হল সালাত বা নাযামের সপ্তম প্রয়োজনীয় বিষয়। যে কোন রকম সালাত আদায়ের মনস্থ করলে তার জন্য নিয়ত বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ কোন ওয়াকতের কোন সালাত তা নির্দিষ্ট করে নিয়ে সালাত কায়েম করতে হবে। যদি কেউ ফজরের দুরাকআত ফরজ সালাত আদায় করতে চান তাহলে তাঁকে সে জন্য নির্দিষ্ট নিয়ত করতে হবে। আবার কেউ যদি কোন কাযা সালাত আদায় করতে চান তাও নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে হবে। বিশেষতঃ ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে নিয়ত না করলে সালাত শুদ্ধ হবে না। প্রত্যেক সালাতের নিয়ত পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে। সম্ভব হলে আরবী ভাষায় নিয়ত করা উত্তম যদি তা না পারা যায় তবে নিজ নিজ ভাষায় কোন ওয়াকতের কোন সালাত তা উল্লেখ করে ও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে নিয়ত করলেও সালাত শুদ্ধ হবে। যেমন কেউ যদি ফজরের দুরাকআত ফরজ নামাযের নিয়ত বাংলায় করে যে "আমি কেবলামুখী হয়ে আজকের ফজরে দুরাকআত ফরজ সালাত আদায়ের নিয়ত করলাম" তা হলেও তা শুদ্ধ হবে। [নিয়ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সালাত বা নামাযের সময়

সালাতুল ফজর বা ফজরের নামাযের সময় কখন ?

ভোর হওয়ার প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে পূর্বাকাশে কয়েকটি চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। পূর্বাকাশে প্রথমে একটু সাদা আভা দেখা যায়। এই সময় যে থামের মত মেঘমালা পূর্বাকাশে উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি ভাবে দেখা যায় তাকে 'সবহে কাজেব' বা অপ্রকৃত প্রভাতের চিহ্ন বলা হয়। অল্প পরেই এই থামের আকৃতি বিশিষ্ট সাদা মেঘখণ্ডটি সরে যায় ও ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে আরো সাদা মেঘখণ্ড পূর্বাকাশে উদিত হয়, একে 'সোবহে সাদেক' বা প্রকৃত প্রভাত বলে। এই সোবহে সাদেকের সময় থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত হল ফজরের নামাযের সময়। বিভিন্ন দেশের সূর্যোদয়ের সময় মত ঘড়ি মিলিয়ে এই সময় ঘোষণা করা হয়। ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন সালাত বা নামায আদায় শুদ্ধ নয় তবে কাযা নামায আদায় করা চলে।

সালাতুল যোহর বা যোহরের নামাযের সময় কখন ?

যোহরের সালাতের সময় শুরু হয় যাওয়াল বা মধ্যদিন অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই। মধ্যদিন বা যাওয়াল নির্দ্ধারিত হয় সম্পূর্ণ দিনের ঘণ্টাকে দুভাগ করে এক ভাগের সঙ্গে সূর্যোদয়ের সময়কে যোগ করে। যেমন :

ধরা যাক কোন দিন সূর্যোদয় হয় ৬-৪৫ মিনিটে

সূর্যাস্ত যায় ৫-৪৫ মিনিটে

তাহলে দিনের পরিমাণ হচ্ছে ৬-৪৫ + ৫-৪৫ ঘণ্টা = ১১ ঘণ্টা

১১ ঘণ্টাকে দু'ভাগ করলে দাঁড়ায় ১১ ÷ ২ = ৫½ ঘণ্টা

এবার সূর্য্যোদয়ের সময়ের সঙ্গে অর্ধদিন যোগ করলে দাঁড়ায় : ৬-৪৫ মিঃ + ৫-৩০ ঘণ্টা = ১২-১৫ মিঃ। অতএব ঐ দিনের যাওয়াল বা মধ্যদিন হল ১২-১৫ মিনিটে।

এই যাওয়াল সময়ে সালাত পড়া নিষিদ্ধ। এরপর থেকেই যোহরের সালাতের সময় শুরু হয় এবং কোন জিনিষের ছায়া যতক্ষণে যাওয়ালের সময়ের ছায়া ছাড়া তার দ্বিগুণের সমান হয় ততক্ষণ যোহরের সময়। যেমন : ধরা যাক একটি এক গজ দণ্ডের ছায়া যাওয়ালের সময় ৪ ইঞ্চি ছিল। যতক্ষণ না ঐ দণ্ডের ছায়া দুগজ ৪ ইঞ্চি হয় ততক্ষণই যোহরের সালাতের সময় বলে গণ্য করা হবে।

সালাতুল আস্বর বা আস্বরের নামাযের সময় কখন ?

যোহরের সময় যখন শেষ হয় ঠিক সেই সময় থেকেই আস্বরের সালাতের সময় শুরু হয়। অর্থাৎ যখন কোন দণ্ডের ছায়া তার (যাওয়ালের সময়ের ছায়া ছাড়া) দ্বিগুণ হয় তখন থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আস্বরের সালাতের সময়। তবে যখন সূর্যের রং হলুদ হয়ে যায় তখন সালাত বা নামায পড়া মাকরূহ ! তাই সূর্য হলুদ হওয়ার আগে পর্যন্ত হল আস্বরের প্রকৃত সময়। আর বিশেষ কারণে যদি ঐ দিনের আস্বরের সালাত পড়া না হয়ে থাকে তাহলে সূর্যের রং হলুদ হলেও ঐ সময় আস্বরের সালাত আদায় করা চলবে ।

সালাতুল মাগরেব বা মাগরিরের নামাযের সময় কখন ?

সূর্যাস্তের পর থেকে এই সালাতের সময় শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে যতক্ষণ লাল আভা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত হল মাগরেবের সালাতের সময় কাল। সূর্যাস্তের পর পরই সূর্য্যের লাল টকটকে আভা আকাশে বজায় থাকার সময় কাল হল মাগরিবের প্রকৃষ্ট সময়।

সালাতুল এশা বা এশার নামাযের সময় কখন ?

মাগরেবের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর থেকে সোবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত এই সালাতের সময় কাল। তবে মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই এশার সালাত শেষ হওয়া উচিত। রাত্রির এক তৃতীয়াংশের মধ্যেই এই সালাত আদায় করা মুস্তাহাব বা উত্তম। এবং বিনা ওজরে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এশার সালাত আদায় করা মাকরূহ। যাঁদের শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদের

সালাত আদায় করার অভ্যাস আছে তারা এশার সময়কার বেতেরের সালাত তাহাজ্জুদের সালাতের পর আদায় করতে পারেন। নইলে এশার সালাতের সময়ই বেতেরের সালাত আদায় করে নেওয়া ভাল।

কোন্ সময় কোন্ সালাত আদায় মোস্তাহাব বা উত্তম ?

গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরের পরে সূর্যের তাপ কম হলে এবং শীতকালে দ্বিপ্রহরের পরেই যোহরের সালাত আদায় করা মোস্তাহাব। প্রভাতে ভোরের আলো পরিষ্কার হলে ফজরের সালাত আদায় করা এবং রাত্রির এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে এশার সালাত আদায় করা মোস্তাহাব।

কোন্ কোন্ সময় সালাত নিষিদ্ধ ?

নিম্নলিখিত সময় সালাত নিষিদ্ধ যথা :

(১) সূর্যোদয়ের সময় (২) সূর্যাস্তের সময় (৩) দ্বিপ্রহর বা যাওয়ালের সময়। সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিট পর, সূর্যাস্তের ঠিক পরেই এবং দ্বিপ্রহরের বা যাওয়ালের ৫ মিনিট পর সালাত পড়া অনুমোদিত। এছাড়া সূর্যাস্তের পূর্বে সূর্য যখন হলুদ হয়ে যায় তখন ঐ দিনের আস্বরের কাযা ছাড়া সকল সালাত নিষিদ্ধ। (৪) যখন ইমাম দুই ঈদ ও জুমআর সালাতের খোতবা পড়েন। (৫) আস্বরের ফরজ সালাতের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর কোন সুন্নত বা নফল সালাত শুদ্ধ নয় তবে আস্বরের ফরজ সালাতের পর কাযা সালাত আদায় করা যায়। (৬) ফজরের সময়ের শুরু থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কাযা সালাত ছাড়া কোন সালাত আদায় করা শুদ্ধ নয়। (৭) ফজরের ফরজ সালাতের জামাআতে যুক্ত হতে গিয়ে সুন্নত বাদ পড়ে গিয়ে থাকলে সূর্যোদয়ের পর ঐ সালাত আদায় করতে হবে। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে ঐ সালাত আদায় শুদ্ধ নয়। (৮) সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় ফজর বা আস্বরের সালাত আদায় করলে পরে ঐ সালাতের কাযা আদায় করতে হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সালাত বা নামাযের নিয়ম

সালাতের গুরুত্ব কি ও সালাত কতপ্রকার ?

সালাত আরবী শব্দ আর নামায ফার্সী শব্দ। কোরআন শরীফের ভাষা হল সালাত। সালাত অর্থ হ'ল বিশেষ পদ্ধতিতে প্রার্থনা বা আল্লাহ্‌র আরাধনা করা। (এই বই-এ বহুক্ষেত্রে কোরআন শরীফে বর্ণিত সালাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা সমাজে নামায শব্দের সঙ্গেই বেশী পরিচিত বলে নামায শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে।) সালাত ইসলাম ধর্মের পঞ্চ স্তম্ভের একটি এবং এটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সালাত ছাড়া যাবতীয় এবাদাত অর্থহীন। পাঁচ ওয়াক্তের অবশ্য পালনীয় সালাত ছাড়া কেউই মুসলমান বলে গণ্য হতে পারবেন না।

সালাত কয়েক প্রকারের। কোন সালাত ফরজ, কোন সালাত ওয়াজেব, কোন সালাত সুন্নত আবার কোন সালাত নফল। আবার সালাতের মধ্যে করণীয় বিষয়গুলির বিশেষ বিশেষ নামকরণ আছে। যথা: (১) নিয়ত করা, (২) তাকবিরে তাহরিমা বলা, (৩) কেয়াম করা বা দাঁড়ান, (৪) কেরাত পড়া, (৫) রুকু করা, (৬) সেজদা করা, (৭) তাশাহুদ্দের বৈঠক, (৮) আমিন বলা (৯) খাতমুস সালাত বা নামাযের সমাপ্তি ইত্যাদি।

আবার সালাত এক এক রাকাআত হিসাবে আদায় করতে হয়। কোন সালাত দু'রাকাআত, কোন সালাত তিন রাকাআত, কোন সালাত চার রাকাআত বিশিষ্ট। সালাত শুরু করে সেজদা করা পর্যন্ত এক রাকাআত হয়। এইভাবে প্রত্যেকবার সেজদা পর্যন্তই এক এক রাকাআত সালাত গণ্য করা হয়।

সালাতের মধ্যে করণীয় বিষয়গুলির নাম কি ?

সালাতের মধ্যে করণীয় বিষয়গুলি নিম্নরূপ। যথা:

১. **নিয়ত করা:** নিয়ত শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য ইচ্ছা ও সংকল্প স্থির করা। কোন সালাত আরম্ভ করতে হলে প্রথমেই নির্দিষ্ট করে

নিতে হবে কোন্ সালাত, কত রাকাআত কি প্রকারের সালাত অর্থাৎ ফজর, যোহর, আস্বর, মাগরেব, এশা, কোন্ ওয়াক্তের কয় রাকাআত ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত না নফল সালাত তা ঠিক করে নিতে হবে। সেইসঙ্গে দু'রাকাআত, তিন রাকাআত না চার রাকাআত তাও নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। এইগুলি নির্দিষ্ট করে নেওয়াই হল নিয়ত। মনে মনে সুনির্দিষ্ট ভাবে এগুলো ঠিক করে না নিলে নামায শুদ্ধ হবে না। আরবী বা নিজের ভাষায় নিয়ত বলাও বৈধ। মুখে নিয়ত বলা মোস্তাহাব। [১৩১ পৃষ্ঠায় নামাযের নিয়ত দ্রষ্টব্য]

২. **তাকবিরে তাহরিমা বলা :** নামাযে দাঁড়িয়ে নিয়ত করে পুরুষগণকে কান পর্যন্ত দুহাত উঠিয়ে 'আল্লাহো আকবার' বলে হাত নামিয়ে তাহরিমা বাঁধতে হয়। হাত এতটা ওঠাতে হবে যেন হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের লতি স্পর্শ করে ও হাতের আঙ্গুল কানের উর্দ্ধাংশ বরাবর হয় ও হাতের তালু ঘাড় বরাবর থাকে। 'আল্লাহো আকবার' বলে হাত নামিয়ে পুরুষের নাভির নীচে বাম হাতের কব্জির উপর ডান হাতের তালু রেখে বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা বাম হাতের কব্জিকে ধরে রাখা হল তাহরিমা বাঁধা।

স্ত্রীলোকগণকে কাপড় বা বোরখার ভিতরেই কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহো আকবার' বলে হাত নামিয়ে কাপড়ের অভ্যন্তরে বুকের উপর বাম হাতের তালু রেখে তার উপর ডান হাতের তালু রাখতে হয়। এইভাবে হাত বাঁধাকে তাহরিমা বাঁধা বলা হয়।

ইমাম আবু হানিফার মতে নামাযে শুধুমাত্র তাকবিরে তাহরিমার সময়ই ঐভাবে হাত ওঠাতে হয়। রাসূলাল্লাহ্ (সাঃ) অন্যসময় হাত ওঠানর রীতি রদ করেছিলেন। অন্য ইমামদের মতে রুকুতে যাওয়ার, তাকবীর বলার সময় এবং রুকু থেকে উঠে 'সামেআল্লাহো লেমান হামেদা' বলার সময় কিছুটা হাত ওঠানর রীতিও সুন্নতরূপে প্রচলিত আছে। তবে সকল ইমামই একমত যে এই সময়ে হাত ওঠান বা না ওঠানয় সালাতের কোন ক্ষতি হয়না। সুতরাং এই সামান্য বিষয় নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি অর্থহীন।

৩. **কেয়াম করা বা দাঁড়ান :** দাঁড়িয়ে নামায বা সালাত আদায় করা একান্ত কর্তব্য। এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে যেন সারা শরীর

দাঁড়ানকালীন স্বাভাবিক অবস্থার মত থাকে এবং যেন কারো হাত তার হাঁটু স্পর্শ করতে না পারে। ফরজ ও ওয়াজেব সালাত সর্বদাই দাঁড়িয়ে আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। তবে একান্ত অক্ষম, অসুস্থ বা অসমর্থ হলে তার পক্ষে বসে সালাত আদায় বৈধ। আর নফল সালাত যে কোন সময় বসে আদায় করা চলে এবং দাঁড়িয়েও আদায় করা যায়।

৪. **কেরাত পড়া :** কেরাত পড়া বলতে সানা, আউজোবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ মনে মনে পড়ার পর ফরজ নামাযের প্রথম দুরাকাআতে আল-হামদো বা সুরা ফাতেহা ও কোরআন শরীফের অন্য কোন সুরা বা আয়াত পড়াকে বুঝায়। কেরাত অর্থ সশব্দে পড়া। ফরজ নামাযের প্রথম দুরাকাআতে সশব্দে কেরাত ও তাকবির পড়তে হয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে নীরবে শুধুমাত্র সুরা ফাতেহা এবং সশব্দে তাকবিরগুলি ও সালাম বলতে হয়। এছাড়া রমজান মাসে তারাবীহ ও বেতেরের নামাযে (দোওয়া কুনুত ছাড়া) কেরাত পড়তে হয়। কিন্তু যোহর ও আস্বরের নামাযের কোন রাকাআতেই তাকবির ছাড়া কোন কিছুই সশব্দে পড়তে হয়না। ফরজ নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে কেবলমাত্র সুরা ফাতেহা পড়তে হয়। তার সঙ্গে অন্য কোন সুরা পড়তে হয়না। কিন্তু অন্য যে কোন সুন্নত ও নফল নামাযের সব রাকাআতেই সুরা ফাতেহার সঙ্গে কোরআন শরীফের অন্য কোন সুরা বা আয়াত পড়া বাধ্যতামূলক।

জামাআতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইমামই ফরজ নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে সুরা ফাতেহা পড়বেন। মোক্তাদিগণ কোন রাকাআতেই কোন কিছু না পড়ে কেবলমাত্র নীরবে তাকবির বলে সানা, আউজোবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ নিঃশব্দে পড়ে একাগ্রতা সহকারে ইমামকে পরিপূর্ণ ভাবে অনুসরণ করবেন। অর্থাৎ মোক্তাদিগণ চুপচাপ থেকে একাগ্রতা সহকারে ইমামকে অনুসরণ করবেন, সুরা ফাতেহা পড়তে হবেনা। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা ছাড়া অন্য ইমামগণ ও ইমাম বোখারী মনে করেন মোক্তাদি-গণকে ফরজ নামাযের তৃতীয় বা চতুর্থ রাকাআতে সুরা ফাতেহা নীরবে পড়তে হবে। তবে সকল ইমামই একমত যে উভয় নিয়মেই নামায শুদ্ধ হবে। আসলে ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) ইমামের সঙ্গে নামাযে একাত্ম হয়ে

নিজেকে মগ্ন রাখার জন্যই মোক্তাদিগণকে সুরা ফাতেহা পড়তে হবেনা বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে মতপার্থক্য মূল-নামাযের জন্য কোনভাবেই ক্ষতিকর নয়। উভয় নিয়মেই নামায শুদ্ধ।

৫. **রুকু করা ঃ** অর্থাৎ বিশেষ নিয়মে সম্মুখের দিকে মস্তক অবনত করা। এমনভাবে শরীরকে সামনের দিকে ঝোকাতে হবে যাতে হাতের তালু দিয়ে হাঁটুকে শক্ত করে ধরে মাথা ও পিঠ সোজা রাখা যায়। এইভাবে হাত দিয়ে হাঁটু ধরে দেহভার রাখাকে রুকু অবস্থা বলে। রুকু অবস্থায় রুকুর তসবিহ পড়তে হয়। এই সময় পাঁজরের কোন অংশের সঙ্গে হাত লাগিয়ে রাখা নিষেধ ও নিয়ম বহির্ভূত। একান্ত শান্তভাবে কোমর পিঠ ও মাথা সমান রেখে তিনবার রুকুর তসবিহ 'সোবহানা রাব্বিয়াল আজীম' বলে সোজা উঠে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যাতে সমগ্র শরীর দাঁড়ানর অবস্থা ধারণ করে।

৬. **সেজদা ঃ** জায়নামায বা মোসাল্লা কিংবা মেঝেতে নাক ও কপাল ঠেকিয়ে তিনবার সেজদার তসবিহ 'সোবহানা রাব্বিয়াল আলা' পড়াকে সেজদা বলে। সেজদার সময় শরীরের সাতটি অঙ্গ নামাযের জায়গা স্পর্শ করে থাকার নিয়ম। যেমন কপাল, নাক, দু'হাত, দু'হাঁটু ও পায়ের আঙ্গুল। দু'পায়ের আঙ্গুলগুলিকে মুড়ে কেবলামুখি করে আন্তরিকতা দ্বারা আল্লাহ্‌র সামনে সেজদা করতে হয়। কোনভাবেই এই সময় হাত দিয়ে কাপড় বা মাথার চুল ইত্যাদি ধরে রাখা নিষেধ। প্রত্যেক রাকাআতে দুটি করে সেজদা করতে হয়।

৭. **তাশাহুদের বৈঠক ঃ** প্রত্যেক নামাযের দ্বিতীয় ও শেষ রাকাআতের সেজদার পর বসে তাশাহুদ বা আত্তাহিয়াতো পড়তে হয়। যোহর, আস্বর ও এশার চতুর্থ রাকাআতে এবং মাগরেবের ও বেতেরের তৃতীয় রাকাআতে বসে তাশাহুদ এবং তার সঙ্গে দরূদ ও দোওয়া মাসুরা পড়তে হয়। এই বৈঠককে দ্বিতীয় বৈঠক বা শেষ বৈঠক বলে। যে সকল নামায দুরাকাআতেই শেষ তার দ্বিতীয় রাকাআতে বসে তাশাহুদ পড়ার পরই দরূদ ও দোওয়া মাসুরা পড়তে হয়। কারণ দু রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে এটাই শেষ বৈঠক।

৮. **আমিন বলা :** প্রত্যেক রাকাআতে সুরা ফাতেহা পড়ার পর ইমাম ও মোক্তাদী সকলকেই আমিন বলতে হয়। কোন কোন ইমাম বলেছেন এই আমিন পুরুষদের জন্য সশব্দে বলার নিয়ম। ইমাম আবু হানিফা এই 'আমিন' মনে মনে বলার পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে দু'ভাবে পড়াতেই নামায শুদ্ধ হবে বলে সকলেই একমত।

৯. **খাতমুস সালাত বা নামাযের সমাপ্তি :** নামাযের শেষ রাকাআতের বৈঠকে আত্তাহিয়াতো দরূদ ও দোওয়া মাসুরা পড়ার পর 'আস-সালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলতে বলতে প্রথমে ডানদিকে ও পরে বামদিকে মুখ ফিরিয়ে নিজ কাঁধের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নামায শেষ করতে হয়।

সালাতের শুদ্ধ নিয়ম

সালাতের জন্য কিভাবে দাঁড়াতে হয় ও প্রাথমিক করণীয় কি কি ?

প্রথমে সকল প্রকার অপবিত্রতা মুক্ত হয়ে ওজু করে পবিত্র কাপড় পরে কেবলামুখী হয়ে পবিত্র জায়গায় দু'পায়ের মাঝখানে অন্তত চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে সালাতের জন্য দাঁড়াতে হবে। এবার পার্থিব চিন্তা মুক্ত হয়ে মনস্থির করে একাগ্রতা সহকারে আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্ট হয়ে এই ধারণা করতে হবে যে আমি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান এবং বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌ আমাকে দেখছেন। এবার একাগ্রচিত্তে পড়তে হবে :

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

(ইন্নি ওয়াজ্জাহ্‌তো ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামাওয়াতে ওয়াল আরদা হানিফাওঁ ওয়ামা আনা মেনাল মোশরেকীন)।

বাংলা : অবশ্যই আমি তাঁর দিকে মুখ ফিরালাম যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আমি কোনভাবেই মোশরেকদের(অংশী স্থাপনকারী) দলভুক্ত নই।

এরপর ফরজ নামাযের জন্য সশব্দে তাকবির বলে (সুন্নত, ওয়াজেব বা নফল সালাতের জন্য জোরে তাকবির বলতে হয় না) পুরুষগণকে দুহাত কানের লাত পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবিরে তাহরিমা অর্থাৎ اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহো আকবার' বলে হাত নামিয়ে নাভির নীচে বাম হাতের কব্জির উপর ডান হাতের তালু রেখে তাহরিমা বাঁধতে হবে। এই সময় বাম হাতের পিঠের দিকে ডান হাতের তালু রেখে ডান হাতের বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরে রাখতে হবে। মহিলাগণ কাপড়ের ভিতরেই কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে তাকবিরে তাহরিমা অর্থাৎ আল্লাহো আকবার বলে হাত নামিয়ে বুকের উপর একই নিয়মে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে তাহরিমা বাঁধবেন। এবার মনে মনে প্রথমে সানা পড়তে হবে। সানা হল :—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ؕ

(সোবহানাকা আল্লাহুম্মা অ-বেহামদেকা অ-তাবারাকাসমোকা অ-তাআলা জাদ্দোকা ওয়া-লা ইলাহা গায়রোকা।)

বাংলা : হে আল্লাহ্, তুমিই পবিত্রীকৃত, আমরা তোমারই প্রশংসা করি। বরকতময় মহিমান্বিত তোমার নাম এবং সুউচ্চ তোমার গৌরব, এবং তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।

সানা পড়া শেষ করে মনে মনে প্রথমে তাউজ ও তারপর তাসমিয়াহ পড়তে হবে। প্রথমে পড়তে হবে তাউজ। তাউজ হল :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ

(আউযোবিল্লাহে মিনাশ শায়তানির রাজিম।)

বাংলা : অভিশপ্ত শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তি পেতে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

এরপর তাসমিয়াহ্ অর্থাৎ বিসমিল্লাহ্ পড়তে হয়। 'তাসমিয়াহ্' হল :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিল্লা হির্ রাহমা নির্ রাহিম)

বাংলা : কৃপাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি।

এবার সুরা ফাতেহা (সুরা আলহামদো) পড়ে মনে মনে 'আমিন' বলতে হবে। অতঃপর কমপক্ষে তিন আয়াত বিশিষ্ট কেরাত পড়ে তাকবির (আল্লাহো আকবার) বলে রুকু করতে হবে। তবে যোহর ও আসরের ফরজ নামায ছাড়া অন্য কোন ফরজ নামায হলে ও মহিলা না হয়ে পুরুষ হলে প্রথম দুরাকাতে সুরা ফাতেহা ও তার সঙ্গের সুরা বা আয়াত উচ্চঃস্বরে পড়তে হবে। জামাআতের ক্ষেত্রে কেবল ইমাম উচ্চস্বরে পড়বেন এবং মোক্তাদিগণ (ইমাম ছাড়া সকলে) মনে মনে আমিন বলা ছাড়া সর্বক্ষণ চুপ থেকে ইমামের পড়া শুনবেন ও অনুকরণ করবেন। অতঃপর রুকুর তসবিহ পড়তে হবে।

রুকু করা ও রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানর নিয়ম কি ?

রুকুতে হাঁটুদ্বয়ের উপর হাতের তালু ভর করে পিঠ ও মাথা সোজা রেখে তিন, পাঁচ বা সাতবার পরিষ্কার করে রুকুর তসবিহ পড়তে হবে। মেয়েরা রুকুতে কম ঝুকবে এবং বাহুদ্বয় পাঁজরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে ও হাঁটুদ্বয় ঈষৎ ভাঁজ হয়ে থাকবে।

রুকুর তসবিহ হল :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (সোবহানা রাব্বিয়াল আজীম)

বাংলা : আমার মহান পালয়িতা পবিত্র।

এবার তাসমী অর্থাৎ 'সামেআল্লাহোলেমান হামেদা' বলতে বলতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ফরজ নামায হলে পুরুষ এবং ইমামকে ঐ তসবিহ্ উচ্চস্বরে বলতে হয় এবং জামাআতের ক্ষেত্রে মোক্তাদিগণকে তাহমীদ অর্থাৎ 'রাব্বানা লাকাল হামদ' মনে মনে বলতে হয়। তাসমী হল :

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ('সামেআল্লাহো লেমান হামেদা')

বাংলা : যে কেউ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা শোনেন।

জামাআতের ক্ষেত্রে ইমাম ছাড়া সকলে তাহমীদ বলবেন। তাহমীদ হল :

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (রাববানা লাকাল হামদ)

বাংলা : হে আমাদের প্রভু ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য।

সেজদায় যাওয়ার নিয়ম কি ও কিভাবে সেজদা করতে হয় ?

রুকু থেকে উঠে সোজা দাঁড়ানর পর পরই পুনরায় তাকবীর (আল্লাহো আকবার) বলতে বলতে একেবারে সোজা সেজদায় যেতে হবে। (এক্ষেত্রেও ফরজ নামাযে পুরুষ এবং ইমাম জোরে তাকবির বলবেন)।

সেজদায় যাওয়ার সময় প্রথম হাঁটুদ্বয় অতঃপর হস্তদ্বয় মেঝেতে রেখে দুহাতের মাঝখান থেকে মাথা সোজা মাটির কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে প্রথমে নাক, তারপর কপাল মেঝেতে ঠেকিয়ে সকলকে নীরবে সেজদার তসবিহ 'সোবহানা রাব্বিয়াল আলা' তিন, পাঁচ বা সাত বার স্পষ্ট করে পড়তে হবে। সেজদাবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলি সোজা কেবলা বরাবর রেখে চোখের ও কানের সোজা মাথা থেকে কয়েক ইঞ্চি ফাঁকে হাতের তালুদ্বয়কে জায়নামায বা মেঝেতে রাখতে হবে। এই সময় বাহুদ্বয়, বগল ও পাঁজরার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে না বা কনুই মাটিতে ঠেকবে না। পেট ও উরুদ্বয়ের মধ্যেও ফাঁক থাকবে। মহিলাগণকে বাহুদ্বয় দেহের সঙ্গে লাগিয়ে শরীরকে উরুর সঙ্গে মিলিয়ে মেঝেতে বা জায়নামাযে কনুই ঠেকিয়ে সেজদা করতে হবে। সেজদার সময় পুরুষগণের পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে জায়নামায বা মেঝেতে স্থির রাখতে হবে এবং আঙ্গুলগুলিকে কেবলা বরাবর মুড়ে মেঝেতে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। পাছা ও গোড়ালীর মধ্যে ফাঁক থাকবে কিন্তু স্ত্রীলোকদের তা না থেকে পাছা ও গোড়ালী মিলে থাকতে পারে। এবার নাক ও কপাল জায়নামায বা মাটিতে ঠেকিয়ে সেজদাহর তসবিহ পড়তে হবে। সেজদার তসবিহ হল :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সোবাহানা রাব্বিয়াল আলা)

বাংলা : আমার প্রভু পবিত্র ও সুমহান (সুউচ্চ)

তসবিহ পড়ার পর বসার সময় পুরুষদের বাম পায়ের পাতার উপর বসে ডান পায়ের আঙ্গুলকে কেবলা বরাবর রেখে তাতে ভর দিয়ে গোড়ালি খাড়া ভাবে রাখতে হবে। আর স্ত্রী লোকদের দুপায়ের পাতাকেই ডানদিকে বের করে রেখে বাম উরুর উপর ভর করে বসতে হবে। সেজদা থেকে ওঠার সময় ফরজ নামাযের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং ইমাম জোরে তাকবির বলবেন। ঐ অবস্থায় বসে দুজানুর উপর হাতের তালু রেখে এক তসবিহ পড়ার মত সময় সোজা থেকে পুনরায় একই ভাবে 'আল্লাহো আকবার' বলে দ্বিতীয় সেজদা করতে হবে। সেজদায় তসবীহ পড়ার পর তাকবীর অর্থাৎ 'আল্লাহো আকবার' বলতে বলতে সোজা দাঁড়াতে হবে। সেজদা থেকে ওঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর দুহাত ও দু হাঁটু উঠিয়ে সোজা দাঁড়াতে হয়। দাঁড়ানর বা ওঠার সময় জায়নামায বা মাটিতে হাতের ভর রেখে ওঠা নিয়ম বহির্ভূত বা বসার সময় উবু হয়ে বসা যাবে না। এবার প্রথম রাকাআত সালাতের সব কাজ সম্পন্ন হল।

দ্বিতীয় রাকাআত থেকে নামাযের শেষ পর্যন্ত করণীয়গুলি কিভাবে সম্পন্ন করতে হয় ?

দাঁড়ানর পর থেকে দ্বিতীয় রাকাআত সালাতের কাজ শুরু হল। এবার 'সানা' (সোবহানাকা····) আউজোবিল্লাহ পড়তে হবে না কেবল মনে মনে বিসমিল্লাহ্····পড়েই প্রথম রাকাতের মত সুরা ফাতেহা ও অন্য একটা সুরা বা কোরআনের তিন আয়াত পরিমাণ পড়ে প্রথম রাকাআতের মত রুকু সেজদা ইত্যাদি করতে হবে। সেজদা শেষ করে এবার আর সোজা উঠে না দাঁড়িয়ে বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর বসে ডানপায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে গোড়ালি উঁচু করে হাত দুটির তালুকে জানুর উপর এমনভাবে রাখতে হবে যাতে আঙ্গুলের অগ্রভাগ কেবলা বরাবর থাকে। মহিলাদের বসার সময় দুপায়ের পাতাই ডানদিকে বের করে দিতে হবে এবং বাম পায়ের পাতার উপর ডান পা থাকবে। এবার জানুর উপরে রাখা হস্ত তালুর উপর বা সেই বরাবর দু হাঁটুর মাঝখানে দৃষ্টি রেখে তাশাহুদ বা আত্তাহিয়াতো পড়তে হবে।

তাশাহুদ বা আত্তাহিয়্যাতো হল :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ
اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

(আত্তাহিয়্যাতো লিল্লাহে ওয়াস্ স্বালাওয়াতো ওয়াত্ ত্বাইয়েবাতো আস্সালামো আলাইকা আইয়োহান নাবীয়ো ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকা তোহু, আস্ সালামো আলাইনা ওয়া আলা এবাদিল্লাহিস্ স্বালেহীন, আশহাদো আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়া-আশহাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদোহু ওয়া রাসুলোহু।)

বাংলা : সকল প্রকার অভিবাদন, নামায এবং পবিত্র সুন্দর কাজই আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর ও সৎবান্দাদের উপর (আল্লাহ্‌র) শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিশ্চয়ই মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ (রাসূল)।

তাশাহুদ বা আত্তাহিয়াতো পড়ার সময় 'আশহাদো আল্লা ইলাহা' বলার সময় তর্জনী অঙ্গুলী সোজা উপরের দিকে ওঠাতে হয় আর 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় নামাতে হয়। দুরাকাআত বিশিষ্ট নামায হলে এই বৈঠকেই তাশাহুদ পড়ার পর, দরূদ ও দোওয়া মাসুরা পড়ে সালাম বলে নামায শেষ করতে হবে। যদি তিন রাকাআত বিশিষ্ট নামায হয় তাহলে তাশাহুদ বা আত্তাহিয়াতো পড়ার পরই তাকবির (আল্লাহো আকবার) বলে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকাআত সালাত শুরু করতে হবে এবং পূর্বের মত রুকু করে সেজদার পর দ্বিতীয় রাকাআতের পরের মত বসে একইভাবে তাশাহুদ বা আত্তাহিয়াতো পড়ে দরূদ ও দোওয়া মাসুরা পড়ার পর সালাম বলে নামায শেষ করতে হবে। কিন্তু

যদি চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাত বা নামায হয় তাহলে প্রথম রাকাআতের সেজদার পর যেভাবে উঠে দাঁড়াতে হয় সেইভাবে তৃতীয় রাকাআতের পরও উঠে দাঁড়িয়ে চতুর্থ রাকাআত শুরু করতে হবে। চতুর্থ রাকাআতের সেজদার পর বসে তাশাহুদ বা আত্তাহিয়াতো, দরূদ ও দোওয়া মাসুরা পড়ে সালাম বলে সালাত শেষ করতে হবে। যদি তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরজ সালাত হয় তাহলে তৃতীয় রাকাআতে শুধুমাত্র সূরা ফাতেহা নীরবে পড়তে হয়। আর যদি এই নামায জামাআতে হয় তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে কেবলমাত্র ইমাম নীরবে সূরা ফাতেহা পড়বেন এবং মোক্তাদীগণ নীরবে একাগ্রতা সহকারে ইমামের অনুকরণে দাঁড়িয়ে থাকবেন ও ইমামের সঙ্গে রুকু সেজদা করে নামায শেষ করবেন। ইমাম আবুহানিফা ছাড়া অন্য ইমামগণের মতে এই সময় সকল মোক্তাদীকেই নীরবে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। অবশ্য উভয়ভাবেই নামায শুদ্ধ হবে বলে সকল ইমাম এক মত।

শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়াতোর পর পড়ার দরূদ হল :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

(আল্লাহুম্মা স্বাল্লে-আলা মোহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা য়ালে মোহাম্মাদিন কামা স্বল্লায়তা আলা ইব্রাহিমা ওয়াআলা আলে ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজিদ। আল্লাহুমা বারেক আলা মোহাম্মাদিওঁ ওয়াআলাআলে মোহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিমা ওয়াআলা-আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।)

বাংলা : হে আল্লাহ্। তুমি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ দান কর, যেমন তুমি ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ দান করেছ, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত। হে আল্লাহ্!

তুমি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও তার বংশধরগণের উপর বরকত (আশীর্বাদ) প্রেরণ কর যেমন তুমি ইব্রাহিম ও ইব্রাহিমের বংশধরগণের উপর বরকত প্রেরণ করেছিলে, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত, গৌরবান্বিত।

এরপর ঐ বৈঠকেই দোওয়া মাসুরা পড়তে হবে। দোওয়া মাসুরা হল :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ ـ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

(আল্লাহুম্মাগফেরলী ওয়ালে ওয়ালেদাইয়া ওয়ালে মানতাওয়ালাদা ওয়ালে জামীয়েল মুমেনীনা ওয়াল মুমেনাতে, ওয়াল মুসলেমিনা ওয়াল মোসলেমাতে। আল আহইয়ায়ে মিনহুম ওয়াল আমওয়াতে ইন্নাকা মুজিবুদ্দাওয়াত বেরাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন।)

বাংলা : হে আল্লাহ! আমাকে, আমার পিতামাতাকে, এবং যারা জন্মগ্রহণ করবে তাদের এবং সকল মুমেন নরনারীকে ও জীবিত এবং মৃত মুসলমান নরনারীকে তোমার করুণায় ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা পূরণকারী, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপাময় দয়ালু।

এই দোওয়া পড়ার পর সালাম বলে সালাত শেষ করতে হয়। প্রথমে সালাম বলতে বলতে ডানদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিজের কাঁধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পুনরায় বাম দিকে মুখ ঘুরিয়ে অনুরূপভাবে সালাম বলে সালাত শেষ করতে হয়। সালাত বা নামায শেষ করার সালাম হল :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

(আস সালামো আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহ্)

বাংলা : তোমার উপর শান্তি এবং আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হোক।

মোনাজাত

এবার একক বা সমবেত ভাবে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা বা মোনাজাত করা উত্তম। মনে রাখতে হবে মোনাজাত নামাযের অঙ্গ নয়। তবে নামাযই আল্লাহ্‌র সর্বাপেক্ষা নৈকট্য লাভের এবাদাত তাই নামাযের পরে আল্লাহ্‌র নিকট নিজের ও সমাজের প্রয়োজনীয় বিষয় প্রার্থনা করলে আল্লাহ্‌ মঞ্জুর করতে পারেন এই প্রত্যাশা নিয়েই মোনাজাত বা প্রার্থনা করা হয়। নামায শেষে মোনাজাত করলে বা না করলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। বরং মোনাজাত করাই উত্তম। হয়ত আল্লাহ্‌ প্রার্থনা কবুল করবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সালাতের আহকাম ও আরকান

আহকাম ও আরকান কাকে বলে?

আহকাম ও আরকান আরবী শব্দ। শব্দ দুটি যথাক্রমে 'হুকুম' ও 'রোকনের' শব্দের বহুবচন। হুকুম অর্থ হ'ল নির্দেশ এখানে শর্ত। আর রোকন শব্দের অর্থ হ'ল পালনীয় বা করণীয় এখানে 'ফরজ', অর্থাৎ যে কোন সালাতের শর্ত ও ফরজকে (অবশ্যপালনীয় বিধানকে) যথাক্রমে আহকাম ও আরকান বলা হয়।

সালাতের ফরজ

সালাতের মধ্যে কি কি ফরজ বা অবশ্য পালনীয়?

সালাত বা নামাযের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলি ফরজ। যথা: ১. তাকবির অর্থাৎ আল্লাহোআকবার বলে নিয়ত করা বা তাহরিমা বাঁধা। ২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া। ৩. সুরা ফাতেহার সঙ্গে কোরআনের কিছু অংশ পড়া। ৪. রুকু করা। ৫. সেজদা করা। ৬. শেষ বৈঠকে তাশাহুদ (আত্তাহিয়াতো) পড়ার মত সময় বসা। ৭. সালাম দ্বারা নামায শেষ করা।

সালাতের ওয়াজেব

সালাতের মধ্যে ওয়াজেব কি কি?

সালাতে নিম্নলিখিত কাজগুলি ওয়াজেব। যথা: ১. যে কোন

নামাযের প্রত্যেক রাকাআতেই প্রথমে সুরা ফাতেহা পড়া। ২. ফরজ নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআত ছাড়া সকল নামাযের প্রত্যেক রাকাআতেই সুরা ফাতেহার পর যে কোন সুরা বা কোরআনের যে কোন তিনটি আয়াত অথবা একটি বড় আয়াত পড়া। ৩. দুই ঈদের ওয়াজেব এবং রমজানের তারাবীহর পর এক মাসের জন্য এশার বেতেরের ওয়াজেব নামাযে (দোওয়া কুনুত ছাড়া) উচ্চস্বরে কেরাত পড়া। নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পড়া। ৪. ফজর, মাগরেব ও এশার ফরজ সালাতের প্রথম দু রাকাআতে পুরুষদের উচ্চস্বরে সুরা ফাতেহা এবং কোরআনের সুরা বা আয়াত পড়া, এবং জোহর ও আস্বরের নামাযে নীরবে পড়া। ৫. রুকু করার পর সোজা হয়ে দাঁড়ান। ৬. দু সেজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা অর্থাৎ প্রথম সেজদা দিয়ে সোজা হয়ে বসে তবে দ্বিতীয় সেজদায় যাওয়া। ৭. রুকু সেজদার কাজগুলি সুশৃঙ্খলভাবে পরপর করা। ৮. দুই, তিন, বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের দ্বিতীয় রাকাআতের পর তাশাহুদ পড়ার জন্য বসা। ৯. দু রাকাআতের পর এবং শেষ রাকাআতের পর—এই উভয় বৈঠকেই তাশাহুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতো পড়া। ১০. বেতেরের নামাযে তৃতীয় রাকাআতে দোওয়া কুনুত পড়া। ১১. বেতেরের নামাযের তৃতীয় রাকাআতে সুরা ফাতেহার পর তাকবির বলে কান পর্যন্ত হাত ওঠান। ১২. সালাম অর্থাৎ 'আসসালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' বলতে বলতে প্রথমে ডানদিকে মুখ ফিরান আবার একইভাবে সালাম বলতে বলতে বামদিকে মুখ ফিরানর মাধ্যমে নামায শেষ করা। ১৩. দুই ঈদের নামাযের জন্য অতিরিক্ত তাকবিরগুলি বলা। ১৪. তারতিব অর্থাৎ করণীয় কাজগুলি শৃঙ্খলা সহকারে নির্দিষ্ট নামাযে নিঃশব্দে ও সশব্দে পর পর করা।

সালাতের সুন্নত

সালাতের বা নামাযের সুন্নত বলতে কি বোঝায়?

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) নামাযের মধ্যে যা যা করতেন ও করতে নির্দেশ দিয়েছেন সে গুলিকে নামাযের সুন্নত বলে। নামাযের কোন সুন্নত ভুলবশতঃ ছেড়ে গেলেও নামায আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাযের কোন সুন্নত বাদ দেন তাহলে আল্লাহ্ তাঁকে শাস্তি দেবেন।

নামায বা সালাতের মধ্যের সুন্নতগুলি কি কি ?

নিম্নলিখিত কাজগুলি নামায বা সালাতের সুন্নত। যথা :

১. কেবলা মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় দু হাত কান পর্যন্ত ওঠান (স্ত্রী লোকের জন্য কাঁধ পর্যন্ত হাত ওঠান)। ২. দু হাতের আঙ্গুল গুলিকে স্বাভাবিক ভাবে সোজা রাখা। ৩. তাকবির বলার সময় মাথা নিচের দিকে না ঝোকান। ৪. তাকবিরে তাহরিমা সহ একটি কাজ থেকে আর একটি কাজের জন্য প্রয়োজন মত ইমামের জোরে তাকবির বলা। ৫. পুরুষের নাভীর নীচে এবং মহিলাদের বুকের উপর ডান হাতের উপর বাম হাত বাঁধা। ৬. সানা পড়া। ৭. আউজোবিল্লাহ....পুরোটা পড়া। ৮. বিসমিল্লাহ....পুরোটা পড়া। ৯. ফরজ নানাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে শুধু মাত্র সুরা ফাতেহা পড়া। ১০. সুরা ফাতেহার পর 'আমিন' বলা। ১১. সানা, আউজোবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ্ এবং আমিন নিঃশব্দে বলা। ১২. প্রত্যেক রুকু এবং সেজদায় তিনবার তসবিহ পড়া। ১৩. রুকু করার সময় মাথা ও পিঠ সমান অবস্থায় রাখা এবং দু হাতের তালুদ্বয় দুই হাঁটুর উপর রেখে শরীরের ভর রাখা এবং হাতের আঙ্গুল গুলিকে স্বাভাবিক অবস্থার মত ফাঁক করে রাখা। ১৪. ইমামের 'সামেআল্লাহো লেমান হামেদা' এবং মোকতাদিগণের (ইমাম ছাড়া সকলে) 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলা। ১৫. সেজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু তারপর হাতের তালু তারপর নাক ও কপাল মেঝেতে বা জায়নামাযে লাগান। ১৬. আত্তাহিয়াতো পড়ার সময় পুরুষের বাম পায়ের পাতার উপর বসা এবং ডান পা আঙ্গুলের উপর ভর করিয়ে গোড়ালি উপরের দিকে রেখে পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে রাখা এবং আঙ্গুল গুলিকে মুড়ে কেবলামুখী করে রাখা। স্ত্রীলোকেদের দুপাই ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসা। ১৭. আত্তাহিয়াতো পড়ার সময় 'আশহাদোআল্লাইলাহা' বলতে বলতে শাহাদাত আঙ্গুলকে সোজা উপরের দিকে উঠান এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় নামান। ১৮. নামাযের শেষ রাকাআতে আত্তাহিয়াতোর পর দরূদ পড়া। ১৯. দরূদের পর 'দোওয়া' বা দোওয়া মাসুরা পড়া। ২০. নামায শেষ করার জন্য সালাম বলার সময় প্রথমে ডানদিকে তারপর বাম দিকে মুখ ঘোরান। ২১. জামাআতে নামায

আদায় করা ও কাতার (অর্থাৎ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লাইন) সোজা রাখা।
২২. মোকতাদীদের নীরবে তাকবির বলা।

সালাতের মুস্তাহাব

সালাতের মধ্যে মোস্তাহাব কী কী?

সালাতের নিম্নলিখিত কাজগুলি মোস্তাহাব বা উত্তম। যথা:

১. একামতের সময় মোয়াজ্জেন 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলা মাত্র সালাতের জন্য দাঁড়ান। ২. সালাতের জন্য দাঁড়ানর সময় দু পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমান ফাঁক রাখা। ৩ মোয়াজ্জেন 'কাদকা-মাতিস সালাহ' বলার সঙ্গে সঙ্গে সালাত বা নামায আরম্ভ করা। ৪. সালাতের সময় সেজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখা ও রুকুর সময় পায়ের পাতার উপর সেজদার সময় নাকের ডগার দুপাশে দৃষ্টি রাখা এবং নামায শেষ করার জন্য সালাম বলার সময় দু কাঁধের দিকে দৃষ্টি রাখা। আত্তাহিয়াতো পড়ার সময় দু পায়ের ঊরু ও হাঁটুর মাঝখানে দৃষ্টি রাখা। ৫. প্রথম রাকাআতের চেয়ে দ্বিতীয় রাকাআতে অপেক্ষাকৃত ছোট সুরা পড়া। ৬. দুহাতের মাঝখানে সেজদা করা এবং এই সময় হাত পায়ের আঙ্গুলগুলিকে কেবলামুখী রাখা। ৭. সেজদার সময় নাক ও কপাল মাটিতে রেখে বিজোড় সংখ্যায় অর্থাৎ ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি বার তসবিহ পড়া। ৮. আওাহিয়াতো পড়ার সময় হাতের তালুদ্বয় জানুর উপর এমন ভাবে রাখা যাতে আঙ্গুলগুলি হাঁটুর উপর থাকে। ৯. হাই ওঠা বা কাশির সময় যথা সাধ্য তা নিবারণের চেষ্টা করা। ১০. তাহরিমা বেঁধে দাঁড়িয়ে সালাত বা নামায আদায়ের সময় যদি কারো হাই ওঠার জন্য মুখ ফাঁক হয় তাহলে ডান হাতের পিঠের দিক হাঁ হওয়া মুখের উপর রাখা। অন্য সময় হলে বাম হাত অনুরূপ ভাবে রাখা। ১১. একা একা নামায পড়ার সময় রুকু ও সেজদায় তিনবারের অধিক তসবিহ পড়া।

সালাতের মাকরূহ

নামায বা সালাতের মধ্যে কি কি করা মাকরূহ?

কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলি সালাতের মধ্যে করলে সালাতের পুরো

সওয়াব (পুণ্য) পাওয়া যায় না সেগুলিই হল নামায বা সালাতের মাকরূহ বা মাকরূহাতিস সালাত। যথা :

১. পরিষ্কার ও ভালকাপড় রেখে ময়লা কাপড় পরে সালাত বা নামায পড়া। দাড়ি, জামা, ও চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করা। ২. গলা বা মাথা থেকে চাদর দুদিকে ঝুলিয়ে রাখা। ৩. হাফ হাতা জামা বা খালি মাথায় নামায পড়া। ৪. নামাযে দাঁড়িয়ে কেবলার দিক থেকে মুখ না ফিরিয়েও এদিক ওদিক তাকান। ৫. নামাযের মধ্যে অযথা নড়াচড়া করা, আড়ি মোড়ি দেওয়া. আঙ্গুল মটকান, থুতুফেলা আঙ্গুলে তসবিহ গোনা। ৬. কোন প্রাণীর ছবিওয়ালা কাপড় বা জায়নামাযে এবং গেরুয়া ও পশমি কাপড়ে নামায পড়া। ৭. নাক মুখ ঢেকে কিংবা চোখ বন্ধ করে নামায পড়া (তবে একাগ্রতার উদ্দেশ্যে চোখ বন্ধ করা জায়েজ)। ৮. ক্ষুধার সময় সামনে খাবার রেখে, প্রস্রাব ও পায়খানা চেপে রেখে নামায পড়া। ৯. এক বারের বেশী সেজদার জায়গা থেকে কিছু সরান। ১০. নিজের প্রয়োজনে দ্রুত নামায শেষ করা ; নামাযের সময় মসজিদের দরজা বন্ধ রাখা। ইমামের একা মেহরাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায পড়া। ১১. মাথা বা হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেওয়া ; মুখের মধ্যে খাবার পয়সা, ইত্যাদি রেখে নামায পড়া ; অযথা হাই তোলা বা হাই বন্ধের চেষ্টা না করা। ১২. নোংরা জায়গায়, কবরস্থানে ও গোসল খানায় নামায পড়া। ১৩. সেজদার সময় প্রথমে মেঝেতে বা জায়নামাযে হাঁটু না ঠেকিয়ে হাত ঠেকান. সেজদা থেকে ওঠার সময় প্রথমে হাত না উঠিয়ে হাঁটু ওঠান। সেজদার সময় দুহাত কনুই পর্যন্ত মেঝেতে রাখা। ১৪. প্রথম রাকাআতের চেয়ে দ্বিতীয় রাকাআতে দীর্ঘ সুরা পড়া ; সামনে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পিছনে একক ভাবে দাঁড়ান। ১৫. যাতায়াতের পথের উপর নামায পড়া। ১৬. বিসমিল্লাহ্, আউজোবিল্লাহ্, সানা, রুকু ও সেজদার তসবিহ উচ্চস্বরে পড়া। ১৭. ফরজ নামাযে রুকু সেজদা ইত্যাদির তাকবির নীরবে বলা। ১৮. সুন্নতের খেলাফ কাজ করা। কাতার ফাঁক রেখে দাঁড়ান। ১৯. সুদখোর, বৈরাগী, সংসার ত্যাগী. জারজ, অন্ধ, মোনাফেক (বিশ্বাসঘাতক) মুর্খ, এবং জনসাধারণের অশ্রদ্ধার পাত্র এমন লোকের ইমামতি করা। ২০. হাত বার করা অসুবিধা জনক এমনভাবে চাদর গায়ে দেওয়া।

সালাত বা নামায বাতিল কারী কাজ

কি কি কাজ সালাত বা নামায নষ্ট করে দেয় ?

কতকগুলি কাজ আছে যা নামায বা সালাতের মধ্যে করলে সালাত নষ্ট হয়ে যায়। পুনঃ ঐ সালাতে আবার আদায় করতে হয়। এদের মুফসেদাতুস সালাত বা সালাত (নামায) বিনষ্ট কারী ক্রিয়া বলে। যথা :

১. সালাতের বা নামাযের মধ্যে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কথা বলা, হাঁটাচলা করা, পানাহার করা, সালামের জওয়াব দেওয়া ও সালাম করা। ২. সালাতের মধ্যে উচ্চশব্দে হাসলে, কাঁদলে এবং ব্যথায় উহ, আহ্ শব্দ করলে, কোরআন শরীফ দেখে পড়লে। কেরাতে মারাত্মক ভুল হলে। ৩. অপবিত্র জায়গায় সিজদা করলে, সালাতের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে ; স্বেচ্ছায় কেবলামুখী হয়ে না দাঁড়ালে, সালাতের মধ্যে ওজু বা তায়াম্মুম নষ্ট হলে। নামাযের মধ্যে কেবলার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া। ৪. সালাতের মধ্যে হাত বা পা দিয়ে কিছু টেনে সরালে ; সাংসারিক কিছু প্রার্থনা করলে। যেমন আল্লাহ্ আমাকে আজ একশত টাকা দাও ইত্যাদি। ৫. সালাতের ফরজ ও ওয়াজেব কাজ ভুলে গেলে এবং সোহ্ সিজদা না করলে। ৬. নির্দিষ্ট ওয়াক্তের নিয়ত না করে অন্য সালাতের নিয়ত করলে। ৭. দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা বস্তুর কলাই পরিমাণ বের করে খেয়ে ফেললে। ৮. ইমাম ছাড়া অন্য কারো তাকবির গ্রহণ করলে। ৯. কোন সংবাদে আলহামদোলিল্লাহ, ইন্নালিল্লাহ্, সোবহানআল্লাহ্ এবং হাঁচির উত্তরে আলহামদো লিল্লাহ্ বললে। সালাতের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ভাবে কাশলে বা গলা ঝাড়লে। ১০. সতর না ঢাকলে, সালাতের মধ্যে অট্টহাস্য করলে। ১১. ইমামের দাঁড়ানর জায়গা অপেক্ষা আগে বেড়ে দাঁড়ালে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নামায বা সালাতের রাকাআত

প্রত্যেক দিনের পাঁচ ওয়াক্তের সালাত বা নামাযের রাকাআত-গুলির সংখ্যা কত ?

দিনের পাঁচ ওয়াক্তের সালাত বা নামাযের রাকাআতের সংখ্যা সমান নয়। প্রত্যেক নামায বা সালাতের রাকাআতের সংখ্যা নিম্নরূপ। যথা :

১. ফজরের সালাত বা নামায মোট চার রাকাআত। যথা :

ক. দু'রাকাআত সুন্নত খ. দু'রাকাআত ফরজ।

২. জোহরের সালাত বা নামায মোট বার রাকাআত। যথা :

ক. চার রাকাআত সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্।

খ. চার রাকাআত ফরজ।

গ. দু'রাকাআত সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্।

ঘ. দু'রাকাআত নফল।

৩. আস্বরের সালাত বা নামায মোট আট রাকাআত। যথা :

ক. চার রাকাআত সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ্।

খ. চার রাকাআত ফরজ।

৪. মাগরেবের সালাত বা নামায মোট সাত রাকাআত। যথা :

ক. তিন রাকাআত ফরজ।

খ. দু'রাকাআত সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্।

গ. দু'রাকাআত নফল।

৫. এশার সালাত বা নামায মোট সতের রাকাআত। যথা :

ক. চার রাকাআত সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ্।

খ. চার রাকাআত ফরজ।

গ. দু'রাকাআত সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্।

ঘ. দু'রাকাআত নফল।

ঙ. তিন রাকাআত বেতর।

চ. দু'রাকাআত নফল।

জুমআর সালাত বা নামায কত রাকাআত?

জুমআর নামায সর্বমোট আঠার রাকাআত। **যথা :—**

ক. দু'রাকাআত তাহিয়াতুল ওজু—(সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ)

খ. দু'রাকাআত দোখুলুল মসজিদ—(ঐ)

গ. চার রাকাআত কাবলাল জুমআ —(সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ)

ঘ. দু'রাকাআত ফরজ।

ঙ. চার রাকাআত বা'আদালজুমআ—(সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ)

চ. দু'রাকাআত ওয়াকতুস সুন্নত....(সুন্নাতুল মোয়াক্কাদাহ)

ছ. দু'রাকাআত নফল।

দু ঈদ ও তারাবিহর নামায কত রাকাআত?

ক. দু ঈদের নামাযই দু'রাকাআত করে এবং তা ওয়াজেব।

খ. তারাবিহর নামায দু'রাকাআত করে দশ সালামে মোট কুড়ি রাকাআত। এই নামায সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাঁচ ওয়াক্ত নামায বা সালাতের নিয়ত

নিয়ত বলতে যে কোন সালাতের জন্য ইচ্ছা, সংকল্প বা মনস্থির করাকে বোঝায়। মনে মনে নিজ নিজ ভাষায় নিয়ত করলেও চলে। তবে আরবী ভাষায় নিয়ত করা উত্তম। এর দ্বারা বিশ্ব মুসলমানের সালাত বা নামাযের ক্ষেত্রে ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় হয়।

ফজর সালাতের দু'রাকাআত সুন্নতের নিয়ত কিরূপ?

ফজরের দু'রাকাআত সুন্নত নামায বা সালাতের নিয়ত হল :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

(নাওয়াইতো আন উস্বাল্লিয়া লিল্লাহে তাআলা রাকাআতায় স্বালাতিল ফাজরে সুন্নাতো রাসুলিল্লাহে, তাআলা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতেশ শরীফাতে আল্লাহো আকবার।)

বাংলা : আমি আল্লাহ তাআলার জন্য কেবলামুখী হয়ে ফজরের দু'রাকাআত সুন্নত নামায পড়ার নিয়ত করছি—আল্লাহো আকবার।

দু'রাকাআত ফজরের ফরজ সালাত বা নামাযের নিয়ত বল :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(নাওয়াইতো আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তাআলা রাকাআতায় স্বালাতিল ফজরে ফারজুল্লাহে তাআলা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতেশ শরীফাতে আল্লাহো আকবার।)

বাংলা : আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে ফজরের দু-রাকাআত ফরজ নামাযের নিয়ত করছি—আল্লাহো আকবার।

জোহরের চার রাকাআত সুন্নত সালাত বা নামাযের নিয়ত কি ?

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(নাওয়াইতো আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তাআলা আরবাআ রাকাআতে

স্বালাতিল জোহরে সুন্নাতে রাসুলিল্লাহ্ তাআলা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতিশ শারিফাতে—আল্লাহো আকবার।)

বাংলা : মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে জোহরের চার রাকাআত সুন্নত নামাযের নিয়ত করছি—আল্লাহো আকবার (আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ)।

জোহরের চার রাকাআত ফরজ সালাত বা নামাযের নিয়ত কি ?

জোহরের চার রাকাআত সুন্নত সালাত বা নামাযের জন্য যা নিয়ত ফরজের জন্যও সেই একই নিয়ত কেবলমাত্র 'সুন্নাতো রাসুলিল্লাহে তাআলা' শব্দের জায়গায় 'ফারজুল্লাহে তাআলা' শব্দ বলতে হবে।

জোহরের দু'রাকাআত সুন্নত সালাত বা নামাযের নিয়ত বল :

ফজরের দু'রাকাআত সুন্নত নামাযের যা নিয়ত জোহরের দু'রাকাআতের সুন্নতের নিয়তও একই কেবলমাত্র 'সালাতিল ফাজরে' শব্দের পরিবর্তে 'সালাতিল জোহার' বলতে হবে। (ফজরের সুন্নতের নিয়ত দ্রষ্টব্য)

দু'রাকাআত নফল সালাত বা নামাযের নিয়ত কি

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

(নাওয়াইতো আন উস্বাল্লিয়া লিল্লাহে তাআলা রাক্আতায় স্বালতিন নাফলে মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতিশ শরিফাতে আল্লাহো আকবার।)

বাংলা : আমি মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে দু'রাকাআত নফল নামায পড়ার নিয়ত করলাম—আল্লাহো আকবার।

আসরের চার রাকাআত ফরজ সালাত বা নামাযের নিয়ত কি ?

জোহরের চার রাকাআত ফরজের যা নিয়ত আসরের ফরজেরও সেই একই নিয়ত কেবল—'সালাতিল জোহর' শব্দের জায়গায় 'সালাতিল আসর' বলতে হবে।

মাগরেবের তিন রাকাআত ফরজ সালাত বা নামাযের নিয়ত কি ?

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতো আন উস্বাল্লিয়া লিল্লাহে, তাআলা সালাসা রাকাআতে স্বালাতিল মাগরেবে ফারজুল্লাহে তাআলা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতেশ শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলা : আমি মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পবিত্র কাআবা শরীফের দিকে মুখ করে মাগরেবের তিন রাকাআত ফরজ নামাযের নিয়ত করছি— আল্লাহো আকবার।

মাগরেবের দু'রাকাআত সুন্নত নামাযের নিয়ত কি ?

ফজর বা জোহরের দু'রাকাআত সুন্নত নামাযের নিয়তের মতই মাগরেবের দু'রাকাআতের সুন্নতের নিয়ত হবে কেবল মাত্র 'সালাতুল ফাজরে বা জোহরে' শব্দের বদলে 'সালাতুল মাগরেব' বলতে হবে।

মাগরেবের সময়ের দু'রাকাআত নফল নামাযের নিয়ত কি ?

জোহরের সময় যেভাবে নফলের নিয়ত করতে হয় এখনও সেই একই নিয়ত হবে। নফল নামাযে কোন ওয়াকতের দরকার হয় না।

এশার চার রাকাআত সুন্নতের নিয়ত কি ?

জোহরের চার রাকাআত সুন্নতের যেমন নিয়ত এশার সুন্নতেরও সেই একই নিয়ত কেবল— 'সালাতিল জোহরে' শব্দের জায়গায় 'সালাতিল এশা' বলতে হবে।

এশার চার রাকাআত ফরজ নামাযের নিয়ত কি ?

জোহরের ফরজ নামাযের মতই নিয়ত। কেবলমাত্র 'সালাতিল জোহর' শব্দের পরিবর্তে সালাতিল এশা বলতে হবে।

এশার দু'রাকাআত সুন্নত নামাযের নিয়ত কি ?

ফজর, জোহর বা মাগরেবের দু'রাকাআত সুন্নতের নিয়তের মতই নিয়ত কেবলমাত্র ফজর, জোহর বা মাগরেব শব্দের জায়গায় 'এশা' বললেই হবে।

এশার সময়কার দু'রাকাআত নফল সালাত নামাযের নিয়ত কি ?

আগেই জোহরের নফল নামাযের যে নিয়ত উল্লেখ করা হয়েছে সকল নফল সালাত বা নামাযেরই ঐ একই নিয়ত হবে। (১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

নবম পরিচ্ছেদ

বেতেরের সালাত বা নামায

এশার সময় তিন রাকাআত ওয়াজেব সালাত বা নামায পড়তে হয়। এই সালাত বা নামাযই হল বেতেরের নামায। এশার ফরজ নামাযের পর থেকে সোবহে কাজেব পর্যন্ত এই সালাতের সময়। রমজান মাসে বেতেরের নামাযও তারাবিহ নামাযের শেষে জামাআত করে পড়তে হয়। সুরা ফাতেহার সঙ্গে যে কোন সুরা মিলিয়ে সাধারণ সালাত বা নামাযের মত পড়া যায়। তবে সুরা ফাতেহার পর প্রথম রাকাআতে 'সাব্বে হিসমে রাব্বে-কালআলা' দ্বিতীয় রাকাআতে 'কুলইয়া আইয়োহাল কাফেরুন' এবং তৃতীয় রাকাআতে 'কুলহো আল্লাহো আহাদ' সুরা মাঝে মাঝে পড়া উত্তম।

তিন রাকাআত বেতেরের সালাত বা নামাযের নিয়ত কি ?

নিয়ত হল :—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(নাওয়াইতো আন ওস্বাল্লিয়া লিল্লাহেতাআলা সালাসা রাকাআতে স্বালাতিল বেত্‌র ওয়াজেবিল্লাহেতাআলা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতিশ শারিফাতে আল্লাহো আকবার।)

বাংলা ঃ আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পবিত্র কা'আবা শরীফের দিকে মুখ করে বেতেরের তিন রাকাআত ওয়াজেব নামায আদায়ের নিয়ত করছি— আল্লাহো আকবার।

বেতেরের নামায পড়ার নিয়ম কিরূপ ?

প্রথমে নিয়ত করে সানা, আউজোবিল্লাহ বিসমিল্লাহ ইত্যাদি সহ অন্যান্য নামাযের মত প্রথম দু রাকাআত নামায পড়ে তৃতীয় রাকাআতের সময় সুরা ফাতেহার সঙ্গে যে কোন সুরা বা সুরা এখলাস পড়া শেষ করে রুকুতে না গিয়ে তাকবির বলে কান পর্যন্ত দুহাত উঠিয়ে পুনরায় তাহরিমা বেঁধে দোওয়া কুনুত পড়তে হবে। দোওয়া কুনুত পড়া শেষ করে যথারীতি অন্য নামাযের মত রুকু সেজদা করে তাশাহুদ, দরূদ ইত্যাদি পড়ে সালাম বলে নামায শেষ

দোওয়া কুনুত কি ও কখন পড়তে হয় ?

এশার সময় বেতেরের তিন রাকাআত ওয়াজেব নামায পড়ার সময় তৃতীয় রাকাআতে সুরা ফাতেহার পর একটি সুরা পড়ে আল্লাহো আকবার বলে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে আবার হাত নামিয়ে তাহরিমা বেঁধে—দোওয়া কুনুত পড়ে তার রুকু সেজদা করে আত্তাহিয়াতো, দরূদ ও দোওয়া মাসুরা পড়ে নামায শেষ করতে হয়।

দোওয়া কুনুত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ
وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ
وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ
اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ؕ

আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাইনোকা ওয়া নাসতাগফেরোকা ওয়ানুমেনো বেকা ওয়া নাতাওয়াক্কালো আলাইকা ওয়া নোসনী আলাইকাল খায়রা; ওয়া

নাশকোরোকা ওয়ালা নাকফোরোকা ওয়া নাখলাও ওয়া নাতরোকো মাই ইয়াফজোরোকা ; আল্লাহুম্মা ইয়াকা নাআবোদো ওয়ালাকা নোস্বাল্লী ওয়া নাসজোদো ওয়া এলাইকা নাসআ ওয়া নাহফেদো ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিলকোফ্‌ফারে মোলহেক।

বাংলা ঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাহায্য চাই এবং তোমার নিকট ক্ষমা চাই, তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং তোমার উপরই নির্ভর করছি, আমরা সর্বোত্তমপক্ষে তোমার প্রশংসা করছি এবং তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমরা তোমার নিকট অকৃতজ্ঞ নই। আর যারা তোমার অবাধ্য তাদের কুসঙ্গ থেকে দূরে থাকি ও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নই। হে আল্লাহ! আমরা কেবল তোমারই উপাসনা (এবাদাত) করি, তোমার জন্যই নামায পড়ি ও তোমাকেই সেজদা করি এবং তোমার নিকটই দ্রুত ধাবিত হই এবং তোমার সামনে হাজির হই আর তোমারই করুণার প্রত্যাশী এবং তোমার শাস্তিকেই ভয় করি। অবশ্যই অবিশ্বাসীগণ (কাফের) তোমার শাস্তি ভোগ করবে।

দোওয়া কুনুত না জানা থাকলে কি করতে হয়?

যদি কারো দোওয়া কুনুত না জানা থাকে তাহলে দোওয়া কুনুতের পরিবর্তে "আল্লাহুম্মাগফেরলী" অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর অথবা "সোবহানাল মালেকুল কোদ্দুস" অর্থাৎ অতি পবিত্র বিশ্ব প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। অথবা এই মোনাজাত পড়া যায়। যথা:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া কেনা আযাবান্নার।

বেতেরের নামায ওয়াজেব না সুন্নত?

বেতেরের নামায ওয়াজেব। এটা ফরজ নামাযের সমান গুরুত্ব সহকারে আদায় করতে হবে। যদি কাজা হয় তাহলে অন্য সময় বেতেরের নামাযেরও

কাজা আদায় করতে হয়। কোন বৈধ কারণ ছাড়া এই সালাত বা নামায ত্যাগ করলে শক্ত গোনাহ হবে।

বেতের ও অন্য নামায বা সালাতের পার্থক্য কী ?

বেতেরের সঙ্গে অন্য নামায বা সালাতের পার্থক্য হল যে বেতেরের তৃতীয় রাকাআতে দোওয়া কুনুত পড়তে হয় অন্য নামাযে তা হয় না। তৃতীয় রাকাআতে সুরা ফাতেহার পর অন্য একটি সুরা পড়া শেষ করেই 'আল্লাহো আকবার' বলে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে পুনরায় আবার তাহরিমার মত হাত বেঁধে ঐ দোওয়া কুনুত পড়তে হয়। অন্য কোন সালাতের তৃতীয় রাকাআতে এভাবে সালাত আদায়ের নিয়ম নেই।

দশম পরিচ্ছেদ

কাজা সালাত বা নামায

কাজা সালাত বা নামায কাকে বলে ?

কোন নামায বা সালাতের নির্দ্ধারিত সময়কালের মধ্যে সেই নামায বা সালাত না পড়ে অন্যসময় পড়াকে কাজা বলে। সাধারণভাবে সালাত কাজা করা গোনাহ বা পাপ। কোন বৈধ কারণ ছাড়া কোন ফরজ নামায বা সালাত সময়মত আদায় না করা অনুমোদিত নয়। একান্ত নিরুপায় হয়ে যদি কোন ফরজ সালাত সময়মত আদায় করতে না পারা যায় তখন তার কাজা আদায় করতে হবে। কাজা সালাত আদায়ে কোনরকম গাফিলতিও পাপ। মানুষের জীবদ্দশায় যে সকল ফরজ সালাত পড়া হয়নি তার জন্য কোন অনুতাপই (তওবা) যথেষ্ট নয়। ঐ ফরজ সালাত বাকী জীবনের মধ্যে কাজা হিসাবে হলেও অবশ্যই আদায় করে নিতে হবে। কোন কাজা সালাত-ই মাফ হয়না তা আদায় করতেই হবে নইলে বড়ই গোনাহগার হতে হবে। ফরজ নামাযের সঙ্গে বেতেরেরও কাজা আদায় করতে হয়। কাজা নামায বা সালাত নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে আদায় করতে হয়।

নামায কাজা থাকলে ওয়াকতিয়া নামায পড়াও শুদ্ধ হবে না। তেমনি আবার বেতেরের নামায না আদায় করা থাকলে ফজরের ফরজ নামাযও শুদ্ধ হবে না। তবে নিম্নলিখিত কারণে কাজা নামায রেখে ওয়াকতিয়া নামায পড়া যায়। যথা: (১) যদি সময় এত সংক্ষিপ্ত হয় যে কাজা নামায আদায় করতে গেলে ওয়াকতিয়া নামাযের সময় থাকবে না। (২) কাজা নামাযের কথা মনে না থাকলে (৩) পাঁচ ওয়াকতের বেশী নামায কাজা হয়ে থাকলে। এই তিন অবস্থায় কাজা নামায থাকা সত্ত্বেও ওয়াকতিয়া নামায পড়া বৈধ।

কাজা নামায পড়ার সময় ও নিয়ম

কাজা নামায বা সালাত আদায় করার নিয়ম কি?

কাজা নামায আদায় করার সময় আগের নামায আগে ও পরের নামায পরে পড়তে হয়। যেমন যদি কারো জোহর ও আস্বরের নামায কাজা হয়ে থাকে, আর মাগরেবের ফরজ নামাযের আগে ঐ কাজা নামায আদায় করলেও মাগরেবের নামায আদায় করার সময় থাকবে মনে হয়, তাহলে প্রথমে জোহর ও আস্বরের কাজা নামায আদায় করে তারপর মাগরেবের নামায কাজা পড়তে হবে। আর যদি সময় এত কম থাকে যে কেবল এক ওয়াকতের নামায পড়া যাবে তাহলে মাগরেবের আগে কেবল জোহরের কাজা নামায আদায় করে তারপর মাগরেবের নামায পড়ার পর আস্বরের চার রাকাআত কাজা নামায পড়তে হবে।

যদি কারো বেশ কয়েক ওয়াকতের নামায কাজা হয় কিন্তু তা পাঁচ ওয়াকতের কম তা হলে তার জন্য কাজা নামায আদায় না করে কোন ফরজ নামায আদায় করা বৈধ নয়। এক্ষেত্রে প্রথমে তাকে কাজা নামাযগুলি পর পর আদায় করতে হবে তারপর নির্দিষ্ট ওয়াকতের নামায আদায় করতে হবে। কারণ এই পাঁচ ওয়াকত কাজা নামায বাকী রেখে কোন ওয়াকতিয়া নামায পড়া শুদ্ধ হবে না। তবে যদি সময় এত অল্প হয় যে ঐ সকল কাজা নামায আদায় করতে গেলে ওয়াকতিয়া নামাযের সময় থাকবে না বা ঐ ওয়াকতের নামাযও কাজা হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আগে ওয়াকতিয়া নামায আদায় করে তার পরই কাজা নামায আদায় করতে হবে। যে পাঁচ ওয়াকত

বা তার কম নামায কাজা হয়ে গিয়েছে তা আদায়ের সময় অবশ্যই তরতীব অনুযায়ী আদায় করতে হবে অর্থাৎ যে নামায প্রথমে কাজা হয়েছে তা প্রথমে এইভাবে পর পর নামাযগুলি যেভাবে কাজা হয়েছে সেইভাবে আদায় করতে হবে।

ধরা যাক কারো জোহর, আস্বর, মাগরিব ও এশার নামায কাজা হয়েছে। এই কাজা আদায়ের সময় তরতীব অনুযায়ী অর্থাৎ প্রথমে জোহর, তারপর আস্বর, তারপর মাগরিব ও এশার নামায আদায় করতে হবে।

কিন্তু যদি পাঁচ ওয়াকতের বেশী নামায কাজা হয় সেক্ষেত্রে আগে ওয়াকতিয়া নামাযের ফরজ আদায় করে নেওয়া যায়, তারপর ক্রমান্বয়ে কাজা নামায পড়তে হবে। এইভাবে একাধিক ওয়াকতের নামায কাজা থাকলে তা আদায় করার সময় তরতীব অনুযায়ী আদায় করা বাধ্যতামূলক নয় এক্ষেত্রে যেভাবে হোক কাজা আদায় করে নিতে হবে।

যদি কারো একমাস বা তারও অধিক দিনের নামায কাজা হয়ে যায় তাহলে কিভাবে তা আদায় করতে হবে ?

এক মাস বা তারও বেশী সময় যাবত নামায কাজা হয়ে গিয়ে থাকলে প্রত্যেক নামাযের সময় সেই ওয়াকতের কাজা নামায আদায় করতে হয়। যথা: ফজরের সময় ফজরের, জোহরের সময় জোহরের এবং আস্বরের সময় আস্বরের ইত্যাদি। বেতেরের কাজা এশার সময় বেতেরের পর আদায় করার নিয়ম। কারণ সকল ফরজ নামায ও ওয়াজেব নামাযের কাজা আদায় করতে হয়।

কোন্ কোন্ নামাযের কাজা পড়তে হয় ?

সকল ফরজ নামাযের কাজা আদায় করতে হয়। ওয়াজেব নামাযের কাজা পড়াও ওয়াজেব। সুন্নতের কোন কাজা পড়তে হয়না তবে দ্বিপ্রহরের পূর্বেই সেই দিনের ফজরের কাজা পড়লে সুন্নতেরও কাজা পড়তে হবে কিন্তু দুপুরের পরে পড়লে সুন্নতের কাজা পড়তে হবে না। জোহরের ফরজ নামাযের আগের চার রাকাআত সুন্নত যদি জামাআত আরম্ভ হওয়ার জন্য পড়তে না পারা যায় তাহলে ফরজ নামাযের পরের দু'রাকাআত সুন্নতের পূর্বে বা পরে ঐ চার রাকাআত সুন্নতের কাজা পড়ে নিতে হবে। অনুরূপ ভাবে ফজরের

জামাআত আরম্ভ হলে যদি সুন্নত না পড়া হয় তাহলে সুর্যোদয়ের পরে দুপুরের পূর্বে তা পড়ে নিতে হবে। কাজা নামায জামাআতে পড়লে ইমামকে অন্য ফরজ নামাযের নিয়মমত জোরে কেরাত পড়তে হবে। একা একা পড়লে নীরবে বা জোরে পড়া যায়।

কাজা নামাযের নিয়ম কিরূপ ?

কাজা নামাযের নিয়তের সময় "নাওয়াইতো আন ওসাল্লিয়া" না বলে "নাওয়াইতো আন আকজিয়া" বলতে হবে এবং ওয়াকতের আগে 'ফাওতিল' শব্দ যোগ করে বাকী নিয়ত শেষ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে ফজরের কাজা নামাযের নিয়ত উল্লেখ করা হল :—

نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ فَوْتِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

নাওয়াইতো আন আকজিয়া লিল্লাহে তাআলা রাকাআতায় সালাতিল ফাওতিল ফাজরে ফারজুল্লাহে তাআলা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতিশ শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলায় : আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ফজরের দু'রাকাআত ফরজ নামাযের কাজা পড়ার জন্য পবিত্র কাআবার দিকে মুখ করে এই নামায আদায়ের নিয়ত করলাম—আল্লাহো আকবার।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সালাতুল মারীদ(জ) বা অসুস্থের নামায

সালতুল মারাজ বা অসুস্থের নামায বলতে কি বোঝায় ?

ইসলাম ধর্মের বিধানে সালাত বা নামায হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শরীয়তে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সালাত কায়েম করা। শরীয়তের বিধানে

কারও অসুস্থতা তার নামায থেকে বিরত থাকার যথেষ্ট কারণ নয়। যতক্ষণ সুস্থ ও সমর্থ থাকবে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। যদি কেউ অসুস্থ হন এবং দাঁড়াতে সক্ষম না হন তাহলে তাঁকে বসে এবং যদি বসতেও সক্ষম না হন তাঁকে শুয়ে শুয়েও নামায আদায় করতে হবে। কোন অবস্থাতেই নামায থেকে অব্যাহতি নেই। এই ভাবে অসুস্থ থাকা কালে কোন লোককে যে ভাবে নামায আদায় করতে হয় তাকে সালাতুল মারীদ(জ) বা অসুস্থের নামায বলে।

কোন অবস্থায় অসুস্থ লোক বসে সালাত বা নামায আদায় করতে পারে ?

কোন লোক অসুস্থ হয়ে নিম্ন অবস্থায় পৌঁছুলে দাঁড়ানর পরিবর্তে তার জন্য বসে সালাত বা নামায আদায় করা বৈধ। যথা—

(১) নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানর ক্ষমতা না থাকলে।

(২) দাঁড়ান বিশেষ যন্ত্রণা উদ্রেকের কারণ হলে।

(৩) দাঁড়ান রোগ বৃদ্ধির কারণ হলে।

(৪) দাঁড়ান মাথা ঝিমঝিম করে চিন্তাশক্তি রহিত হওয়ার কারণ হলে।

(৫) দাঁড়ানর শক্তি আছে কিন্তু দাঁড়ান অবস্থায় রুকু সেজদা করতে সক্ষম না হলে। তবে দাঁড়াতে সক্ষম হলে দাঁড়িয়ে ইশারায় রুকু সেজদা করে সালাত আদায় করতে হয়।

কোন অসুস্থ লোক যদি বসতে সক্ষম না হন তাঁর করণীয় কি ?

কোন লোক যদি এতটা অসুস্থ হন যে তাঁর বসবারও ক্ষমতা নেই তাহলে তাঁর জন্য শুয়ে শুয়ে নামায আদায় বৈধ। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে কেবলার দিকে পা করে চিৎ-অবস্থায় শুইয়ে দিতে হবে। সম্ভব হলে পা হাঁটু থেকে মুড়ে রাখা ভাল। মাথা তুলতে সক্ষম না হলে মাথা বা পিঠে বালিশ দিয়ে একটু উঁচু করে দেওয়া উচিৎ। এই অবস্থায় সালাত আদায় করতে হবে। ইশারা দ্বারা রুকু সেজদা করতে হবে। তবে যদি রোগের প্রকোপ এত বেশী হয় যে মাথার ইশারায়ও সালাত আদায় সম্ভব নয় বা অজ্ঞান থাকা জনিত অবস্থা হয় তাহলে তাঁর উপর সালাত বা নামায পড়ার দায়িত্ব অর্পিত

হবে না। যদি এমন হয় যে কেউ ঐ অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার অধিক সময়কাল বা কয়েকদিন যাবৎ সর্বক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকে তাহলে তাঁকে ঐ সালাত আদায় করতে হবে না। এমনকি পরে জ্ঞান ফিরে এলে বা মাথার ইশারায় সালাত বা নামায প্রতিষ্ঠায় সক্ষমতা অর্জন করলেও এ নামায বা সালাতের কাজা আদায় করতে হবে না। কিন্তু যদি অজ্ঞানতা বা মাথার ইশারায় সালাত আদায়ের অক্ষমতা দু'তিন ঘণ্টা অথবা ২৪ ঘণ্টার কম সময় স্থায়ী হয় তা হলে সেক্ষেত্রে যে কয় ওয়াকতের সময় এ অবস্থা ছিল তার কাজা আদায় করতে হবে।

এছাড়া অসুস্থতার কারণে রুকু সেজদা করতে সক্ষম না হলে ইশারায় সালাত আদায় বৈধ।

সালাত বা নামায অবস্থায় অসুস্থ হলে কি করণীয়?

যদি কেউ সালাত বা নামায আদায়ের অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দাঁড়াতে সক্ষম না হন তাহলে বসে বাকী সালাত শেষ করতে হবে আর যদি বসতেও সক্ষম না হন শুয়ে সম্ভব হলেও বাকী সালাত বা নামায শেষ করতে হবে।

যদি কোন লোক কিছু সময় দাঁড়াতে সক্ষম হন কিন্তু সম্পূর্ণ সালাতে দাঁড়াতে সক্ষম না হন তার করণীয় কি?

যতক্ষণ দাঁড়াতে সক্ষম ততক্ষণই দাঁড়িয়ে এবং অবশিষ্ট বসে সালাত বা নামায শেষ করবেন। অর্থাৎ এই রকম অবস্থায় আংশিক সালাত দাঁড়িয়ে ও আংশিক বসে আদায় করা বৈধ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সালাতুল মোসাফের বা ভ্রমণকারীর নামায

শরীয়তের নিয়ম অনুসারে মোসাফের বা ভ্রমণকারী কে?

শরীয়তের নিয়ম অনুসারে মোসাফের ঐ ব্যক্তি যিনি ৪৮ মাইল বা ৮০

কিলোমিটার পর্যন্ত ভ্রমণের ইচ্ছা সহকারে বাসস্থান থেকে রওয়ানা হয়েছেন অথবা কোন লোক যদি সাধারণ ভাবে বিশ্রাম সহকারে হেঁটে তিন দিনের পায়ে চলা পথে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে যাত্রা করেন। যদি কোন লোক দ্রুতগামী বাস ট্রেন ইত্যাদিতে ঐ পরিমান দূরত্ব অল্প সময়েও অতিক্রম করেন তাহলেও তাঁকে মোসাফের বলা হবে এবং মোসাফের-এর জন্য নির্দিষ্ট নিয়মেই ফরজ সালাত আদায় করতে হবে। শরীয়ত এই সকল মোসাফের বা ভ্রমণকারীর জন্য সালাত বা নামায আদায়ে কিছুটা সুবিধা অনুমোদন করেছে। যথা :—

১. চার রাকাআত ফরজ নামায বা সালাতের পরিবর্তে তাঁকে দুরাকাআত ফরজ সালাত আদায় করতে হবে।

২. ফজরের দুরাকাআত সুন্নত ছাড়া সকল প্রকার সুন্নত সালাত বা নামায না আদায় করা তাঁর জন্য অনুমোদিত।

৩. যিনি মোসাফের নন তাঁকে 'মুকিম' বা স্থায়ী বসবাসকারী বলে। আর ভ্রমণকারীকে মোসাফের বলে।

মোসাফের বা ভ্রমণকারীর এই সংক্ষিপ্ত সালাতকে ইসলামী পরিভাষায় কি বলে?

ইসলামী পরিভাষায় ভ্রমণকারীকে যে সংক্ষিপ্ত সালাত বা নামায আদায় করতে হয় তাকে 'কসর' বলে। কসর অর্থ সংক্ষিপ্ত।

মোসাফেরের জন্য কখন থেকে ও কতদিন যাবৎ 'কসর' সালাত প্রযোজ্য?

যে কেউ ভ্রমণ শুরু করে তাঁর নিজস্ব এলাকা অতিক্রম করার পর থেকেই তিনি ভ্রমণকারীর জন্য নির্দ্ধারিত 'কসর' সালাত আদায় করবেন। এই সময় থেকেই তিনি মোসাফের বা ভ্রমণকারী গণ্য হবেন। যতক্ষণ না ভ্রমণকারী কোন শহর, নগর বা গ্রামে কমপক্ষে একটানা ১৫ দিন থাকার নিয়ত করেন ততক্ষণ তাঁর জন্য এই 'কসর' পদ্ধতিতেই সালাত প্রযোজ্য। কিন্তু যে মুহূর্তে ভ্রমণকারী ১৫ দিন বা তারও অধিক সময়কাল কোন জায়গায় থাকার নিয়ত করবেন তখনই তাঁর উপর সম্পূর্ণ সালাত আদায় প্রযোজ্য হয়ে যাবে।

তখন তিনি মোসাফের থাকবেন না। কিন্তু কোন লোককে বিশেষ কাজে গিয়ে নিয়ত না করে কাজের জন্য এক তুদিন করে করে ১৫ দিনেরও বেশী সময় এক জায়গায় থাকতে হলেও তার জন্য 'কসর' সালাতই প্রযোজ্য। অর্থাৎ তিনি 'কসর' পদ্ধতিতেই সালাত আদায় করবেন। মোসাফেরের জন্য সম্পূর্ণ চার রাকাআত ফরজ সালাত আদায় গোনাহ্‌র কাজ।

মোসাফের বা ভ্রমণকারী কে? সালাত বা নামায প্রতিষ্ঠার নিয়ম কি?

ভ্রমণকারীর সালাত বা নামায প্রতিষ্ঠার নিয়ম নিম্নরূপ। যথা:

১. যে কোন ভ্রমণকারীর জন্য চার রাকাআত ফরজ নামাযের তুরাকাআত আদায় করা বাধ্যতামূলক। তাঁর জন্য চার রাকাআত ফরজ নামায বৈধ নয়। কিন্তু তু রাকাআত ফরজের ক্ষেত্রে কোন 'কসর' নেই, তুরাকাআতই আদায় করতে হবে।

২. যদি মোসাফের মোকতাদী এবং ইমাম মুকিম (অর্থাৎ ভ্রমণকারী নন) হন তাহলে মোসাফেরকে ইমামের অনুকরণে পূর্ণ চার রাকাআত নামাযই আদায় করতে হবে।

৩. মোসাফেরের জন্য ফজরের তুরাকাআত সুন্নত ছাড়া সমূহ সুন্নত সালাত আদায় না করা বৈধ। তবে যদি কোন তাড়াহুড়া বা ব্যস্ততা না থাকে এবং হাতে যথেষ্ট সময় থাকে তাহলে সুন্নত আদায় করা যুক্তিযুক্ত। সুন্নত ও নফল সালাতের কোন 'কসর' নেই। যদি কোন মোসাফের সুন্নত ও নফল আদায়ের মনস্থ করেন তাঁকে সম্পূর্ণ চার রাকাআত আদায় করতে হবে, কসর করা চলবে না।

৪. যদি মোসাফের ভুল বশতঃ দ্বিতীয় রাকাআতে তাশাহুদ পড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং বাকী তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতও আদায় করেন তবে এক্ষেত্রে তুরাকাআত ফরজ এবং বাকী তুরাকাআত 'নফল' বলে গণ্য হবে। তবে সোহ সিজদা দিতে হবে। যদি সোহ সেজদা না দেওয়া হয় তবে মোসাফেরকে পুনরায় ঐ ওয়াক্তের তুরাকাআত 'কসর' সালাত আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমের চার রাকাআতই 'নফল' বলে গণ্য হবে।

৫. মোসাফের পনের দিন বা তার অধিককাল থাকার নিয়ত করলে তাঁর জন্য 'কসর' প্রযোজ্য হবে না, তাঁকে সম্পূর্ণ চার রাকাআতই আদায় করতে হবে। যদি মোসাফের ১৫ দিন থাকার নিয়ত করার পর ততদিন না থেকে পনের দিনের আগেও চলে আসার মনস্থ করেন তবুও তাঁর জন্য 'কসর' বৈধ নয়। তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থার মতই সালাত আদায় করতে হবে। আবার কোন মোসাফের যদি পনের দিন থাকার নিয়ত না করেও অধিক দিন থাকেন তাহলেও তাঁকে 'কসর' আদায় করতে হবে। এই ভাবে তাঁর অবস্থান বৎসরকাল দীর্ঘস্থায়ী করলেন কিন্তু কোন সময়ই পনের দিন একটানা থাকার নিয়ত করলেন না, সেক্ষেত্রে তাঁকে অবশ্যই 'কসর' আদায় করতে হবে। তিনি সকল সময়ই মোসাফের গণ্য হবেন।

৬. কোন লোক ৪৮ মাইল দূরত্ব পরিমাণ পথে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তাঁর অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করলেন কিন্তু ঐ ৪৮ মাইলের মধ্যবর্তী কোন এলাকায় তার নিজের বসত এলাকা পড়ল সে ক্ষেত্রে তিনি আর ভ্রমণকারী গণ্য হবেন না বা তাঁর জন্য কসর সালাতও বৈধ হবে না যদিও তার ভ্রমণ পথের মোট পরিমাণ ৪৮ মাইল। তার নিজের বসত এলাকা থেকে যে কোন দিকের ভ্রমণ পথ কম করে ৪৮ মাইল হতে হবে তবেই তিনি মোসাফের গণ্য হবেন।

৭. মোসাফের যদি ঋতুবতী স্ত্রীলোক হন এবং তিনি ৪৮ মাইলের বেশী পথে ভ্রমণের জন্য যাত্রা শুরু করেন তাহলে যে জায়গায় তিনি ঋতু থেকে পবিত্র হবেন সেখান থেকে তাঁর ভ্রমণ পথের দূরত্ব গণনা করতে হবে। অর্থাৎ যেখানে তিনি ঋতু অবস্থা থেকে পবিত্র হয়েছেন সেখান থেকে ভ্রমণের দূরত্ব ৪৮ মাইল বা ততোধিক হতে হবে অন্যথায় তিনি মোসাফের গণ্য হবেন না বা তাঁর জন্য 'কসর' সালাত ও বৈধ হবে না। কিন্তু যদি পবিত্র হওয়ার জায়গা থেকে তাঁর ভ্রমণের দূরত্ব ৪৮ মাইল হয় তাহলে তিনি ভ্রমণকারিণী গণ্য হবেন ও তাঁর জন্য কসর প্রযোজ্য হবে।

৮. মোসাফের 'কসর' সালাত আদায় করতে করতেই যদি মনস্থির করেন যে তিনি সেখানে ১৫ দিন অবস্থান করবেন তাহলে তাঁকে সেই সালাতের চার রাকাআতই আদায় করতে হবে।

৯. মোসাফের যদি নিজ বাড়ীর এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন ও কখনও তাঁর নিজের শহরে বা বাড়ীতে আসেন আর তাঁর বর্তমান বাসস্থান থেকে এই দূরত্ব ৪৮ মাইলের বেশী হয় তাহলে এক্ষেত্রে নিজের শহর বা বাড়ীতে এলেও তিনি মোসাফের গণ্য হবেন এবং তাঁকে কসর আদায় করতে হবে।

১০. ভ্রমণকারীর ভ্রমণ অবস্থাতে কোন সালাত কাজা হলে তা যদি ভ্রমণ শেষে নিজ বাড়ী বা শহরে আদায় করা হয় সে ক্ষেত্রে ঐ কাজা সালাতকে কসর আকারেই আদায় করতে হবে। অর্থাৎ জোহর, আসর ও এশার কাজা আদায়ের সময় ফরজ সালাতের দুরাকাআত কসরই আদায় করতে হবে। আবার যদি বাড়ীতে থাকাকালীন কোন সালাত কাজা হয়ে থাকে আর ভ্রমণকারী যদি ভ্রমণের সময় ঐ কাজা আদায় করেন সে ক্ষেত্রে চার রাকাআতই আদায় করতে হবে। কসর আকারে আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে না।

১১. কোন মহিলা বিয়ের পর স্বামীগৃহে স্থায়ী বসবাসের জন্য চলে গেলে তাঁর পিতৃগৃহ তাঁর জন্য আর স্থায়ী বসবাসের ঘর বলে গণ্য হবে না। ঐ মহিলা যদি পরবর্তীকালে পিত্রালয়ে যান এবং স্বামীগৃহ থেকে পিত্রালয়ের দূরত্ব ৪৮ মাইল বা ৮০ কিলোমিটারের বেশী হয় এবং একাদিক্রমে ১৫ দিন থাকার নিয়ত না করেন তাহলে এক্ষেত্রে ঐ মহিলা পিত্রালয়ে ভ্রমণকারিণী গণ্য হবেন এবং তাঁকে কসর সালাত আদায় করতে হবে।

১২. ভ্রমণকারীকে চলন্ত ট্রেন, বাস জলজাহাজ ইত্যাদিতে ভ্রমণকালেও সালাত আদায় করতে হবে যদি দাঁড়িয়ে সম্ভব না হয় তাহলে বসে আদায় করলেও শুদ্ধ হবে। চলন্ত যান যদি গতি পরিবর্তন করে তাহলে সালাতের মধ্যে ভ্রমণকারীকে মুখ ঘুরিয়ে কেবলা বরাবর করতে হবে।

ভ্রমণকারা ইমাম হলে কিভাবে নামায পড়তে হয়?

যদি ইমাম ভ্রমণকারী হন তাহলে তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাতে 'কসর' আদায় করবেন। এক্ষেত্রে ইমাম দুরাকাআতের পর 'আসসালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলে দুদিকে মুখ ফিরিয়ে যথারীতি সালাত শেষ করবেন কিন্তু মোকতাদিগণ যথারীতি সালাম না বলে

অর্থাৎ সালাত শেষ না করে বাকী দুরাকাআত সালাত একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে নিজে নিজে আদায় করবেন তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে সুরা ফাতেহা ও কোন সুরা বা আয়াত পড়তে হবে না। চতুর্থ রাকাআত সালাত শেষে সকলেই সালাম বলে নিজ নিজ সালাত শেষ করবেন। মোসাফের ইমাম হলে সালাম বলার পর أَتِمُّوا صَلٰوتَكُمْ فَاَنَا قَوْمٌ سَفَرٌ "আতেমমো সালাতাকুম ফা-আনা কাওমুন সাফারুন" অর্থাৎ আমি মোসাফের তোমরা তোমাদের সালাত শেষ কর' বলা মোস্তাহাব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সোহ সেজদা

সোহ সেজদা বলতে কি বোঝায়?

সোহ আরবী শব্দ যার অর্থ ভুল বা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি। অনেক ক্ষেত্রেই সালাতের মধ্যে ভুল বশতঃ অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে যায়। এই সকল বিচ্যুতি ও অনিচ্ছাকৃত বা ভুল জনিত ত্রুটির সংশোধনের জন্য সালাত শেষ করার পূর্ব ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে একবার সালাম উচ্চারণ করার পরই বামদিকে ফিরে আর একবার সালাম না বলে অর্থাৎ সালাত শেষ না করে তাকবির বলে দুটি সেজদা করে সে ত্রুটি সংশোধন করা হয় তাকে বলে সোহ সেজদা। তবে যদি ইচ্ছাকৃত কোন ভুল করার পর সোহ সেজদা করা হয়ও তা হলেও সালাত শুদ্ধ হবেনা। ঐ সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে।

সালাতের কি ধরনের ত্রুটির জন্য সোহ সেজদা প্রয়োজন?

সালাতে নিম্নলিখিত অবস্থা ও ত্রুটি ঘটলে সোহ সেজদা দ্বারা সালাতকে শুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক অন্যথায় ঐ সালাত শুদ্ধ হবেনা পুনরায় তা আদায় করতে হবে। যথা :—

১. যদি সালাতের মধ্যকার একাধিক ওয়াজেব কাজে বিস্মৃতি বা ভুল জনিত ত্রুটি হয়ে যায়। ২. যদি কেউ ভুলবশতঃ দুবার রুকু বা তিনবার সেজদা করে ফেলেন তাহলে সোহ সেজদা করতে হবে। ৩. যদি সালাতের

মধ্যে কেরাত ভুলে গিয়ে কি পড়বে তা ঠিক করে উঠতে না পারা যায় এবং তিনবার সোবহানাল্লাহ্ পড়ার সময় অর্থাৎ তিন চার সেকেণ্ড এইভাবে কেটে যায় তাহলে সোহ সেজদা দিতে হবে। ৪. তিন ও চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরজ সালাতের প্রথম বৈঠকে ভুলবশতঃ দুবার তাশাহুদ পড়ে ফেললে সোহ সেজদা দিতে হবে। ৫. তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরজ সালাতের প্রথম বৈঠকে (দুরাকাআতের পর) তাশাহুদ পড়ার পর ভুল বশতঃ দরূদ পড়া শুরু করে 'আল্লাহুমা সাল্লেআলা মোহাম্মাদিন' পর্যন্ত পড়ার পর শুধরে নিলেও সোহ সেজদা দিয়ে এই ভুল সংশোধন করতে হবে। তবে যদি কেবলমাত্র 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা' পর্যন্ত বলার পর শুধরে নেওয়া সম্ভব হয় তাহলে আর সোহ সেজদার প্রয়োজন হবে না। ৬. ভুল বশতঃ যদি একই বৈঠকে দুবার তাশাহুদ পড়া হয়ে যায় তাহলে সোহ সেজদা দিতে হবে। ৭. ভুলবশতঃ যদি দ্বিতীয় রাকাআতের পর বসতে ভুলে গিয়ে উঠে দাঁড়ানর সময় মনে পড়ে যায় এবং তখনও সম্পূর্ণ দাঁড়ানর অবস্থার না হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে না দাঁড়িয়ে বসে পড়তে হবে এক্ষেত্রেও সোহ সেজদা দিতে হবে। আর সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে পড়লেও সালাতের শেষে নিয়ম মত সোহ সেজদা দিতে হবে। ৮. যদি ফরজ সালাতের চতুর্থ বা শেষ রাকাআতে বসতে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার উপক্রম হওয়ার সময় মনে পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ে সালাত শেষ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে কোন সোহ সেজদা দিতে হবে না। আর যদি দাঁড়িয়ে পড়ার পর মনে পড়ে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়তে হবে এবং সোহ সেজদা দিতে হবে। ৯. আর যদি অতিরিক্ত এক রাকাআতের পর স্মরণ হয় এবং যদি তিন রাকাআত ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে হয় তা হলে এই চতুর্থ রাকাআত পূর্ণ করতে হবে এবং কোন সোহ সেজদারও প্রয়োজন হবে না। ঐ সালাত নফল গণ্য হবে। কিন্তু পুনরায় ঐ ফরজ সালাত আদায় করতে হবে। আর যদি চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে হয় তাহলে পঞ্চম রাকাআতের সঙ্গে আরও এক রাকাআত আদায় করে ষষ্ঠ রাকাআতে সালাত শেষ করতে হবে এবং সোহ সেজদা দিতে হবে। এই ছয় রাকাআত সালাতের দুরাকাআত নফল আর চার রাকাআত ফরজ গণ্য হবে এবং পুনরায় ফরজ চার রাকাআত আদায় করতে হবে না। ১০. তিন বা চার

রাকাআত ফরজ সালাতের নিয়ত করে ভুলবশতঃ দ্বিতীয় রাকাআতের পরই সালাম বলে সালাত শেষ করে ফেলার পর যদি মনে পড়ে যায় এবং তখনও নামায নষ্টকারী কোন আচরণ না হয়ে থাকে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বাকী সালাত আদায় করে সোহ সেজদা দিতে হবে। ১১. বেতের নামাযের প্রথম বা দ্বিতীয় রাকাআতে ভুলে দোওয়া কুনুত পড়া হয়ে গেলও তৃতীয় রাকাআতে যথারীতি দোওয়া কুনুত পড়তে হবে এবং সোহ সেজদা দিতে হবে। ১২ সালাতে একই ধরনের ভুল অনেকগুলি হলেও একবারই সোহ সেজদা দিতে হবে। একবার সোহ সেজদা দেওয়ার পর আবার ঐ ধরনের ভুলের জন্য কোন সোহ সেজদা দিতে হবে না। ১৩. যদি সালাতের কোন ওয়াজেব কাজ ইচ্ছাকৃত ভাবে ভঙ্গ করা হয় তাহলে পুরো সালাতই পুনরায় আদায় করতে হবে, সোহ সেজদা দ্বারা ঐ সালাত শুদ্ধ হবে না। ১৪. সোহ সোজদা দিতে ভুলে গিয়ে সালাত শেষ করে দিলে যদি তখনও নামায নষ্টকারী কোন কাজ না ঘটে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সোহ সেজদা দিতে হবে। আর যদি এমন কাজ হয়ে যায় যাতে নামায নষ্ট হয়ে যায় যেমন কথা বলা, কেবলার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ঐ সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। অর্থাৎ সোহ সেজদা ওয়াজেব এমন ত্রুটি হওয়া সত্ত্বেও সোহ সেজদা না দিলে সালাত শুদ্ধ হবে না। পুনরায় তা আদায় করতে হবে। তা ভুলবশতঃই হোক আর ইচ্ছাকৃতই হোক।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সালাতে তেলাওয়াতের সেজদা

তেলাওয়াতের সেজদা কি ?

তেলাওয়াত অর্থ হল কোরআন পাঠ করা বা কোরআনের কোন আয়াত পাঠ করা। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় এমন কিছু আয়াত ছড়িয়ে আছে যা পাঠ করলেই একটি করে সেজদা দিতে হয়। সমগ্র কোরআনে এরকম চোদ্দটি আয়াত আছে এবং কোরআন তেলাওয়াতের জন্য চোদ্দটি সেজদাও নির্দ্ধারিত আছে। সালাতের মধ্যে যদি ঐ আয়াত গুলির কোনটি পড়া হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই একটি সেজদা দিতে হয়। এই সেজদাকে তেলাওয়াতের সেজদা বলে।

সালাতের মধ্যে সেজদার আয়াত পড়লে কি ভাবে সেজদা করতে হয়।

যদি সালাতের কেরাতে কেউ সেজদার আয়াত পড়েন তাহলে নিম্ন পদ্ধতি ও অবস্থায় সালাতের মধ্যে সেজদা করতে হয়। যথা :—

১. সালাতের মধ্যে সেজদার আয়াত পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকবির বলে তেলাওয়াতের সেজদা করে নিতে হবে। তেলাওয়াতের সেজদার পর তাকবির বলে উঠে দাঁড়িয়ে যথারীতি পরবর্তী আয়াত পড়ে রুকু সেজদা নিয়ম মত করে সালাত শেষ করতে হবে। ২. যদি সালাতের মধ্যে সেজদার আয়াত পড়ে তেলাওয়াতের সেজদা না করে আরও দুই বা তিন আয়াত কেরাত পড়ার পরও তেলাওয়াতের সেজদাহ করতে পারেন। আর যদি সেজদার আয়াত পড়ার পর তেলাওয়াতের সেজদা না করে তিন আয়াতের বেশী কেরাত পড়েন তা হলে তিনি গোনাহগার হবেন। ৩. সালাতের মধ্যে সেজদার আয়াত পড়লে সালাতের মধ্যেই যদি তেলাওয়াতের সেজদা না করা হয় তা হলে সালাতের পরে আর ঐ সেজদা করা বৈধ হবে না। তখন তওবা করে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। ৪. সেজদার আয়াত পড়া শেষ করেই অর্থাৎ আর পরের আয়াত না পড়ে যদি রুকুতে যাওয়া হয় এবং যদি নিয়ত করে যে এটা সেজদা তেলাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতেই এবং যথারীতি সালাতের সেজদায় চলে গেলে আর পৃথক ভাবে তেলাওয়াতের সেজদা না দিলেও চলবে। এমনকি রুকুর সময় সেজদা তেলাওয়াতের নিয়ত না করলেও চলবে কিন্তু শর্ত এটাই সেজদার আয়াত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুকু সেজদা করতে হবে। ৫ সালাত আদায়ের সময় যদি কেউ অন্যের সেজদার আয়াত পড়া শোনেন তা হলে সালাত শেষ করে তাঁকে ঐ তেলাওয়াতের সেজদা করতে হবে।

সালাত ছাড়া অন্য সময় সেজদা তেলাওয়াতের নিয়ম কি ?

সেজদা তেলাওয়াতের শুদ্ধ নিয়ম হল :—সোজা দাঁড়িয়ে আল্লাহো আকবার বলে একেবারে সেজদায় গিয়ে সেজদার তসবীহ পড়ে আবার তাকবির বলে সোজা ওঠা।

তৃতীয় অধ্যায়

সালাতুল জামাআত বা সমবেত নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

জামাআত ও ইমাম

কোন্ কোন্ সালাত জামাআতে পড়া বাধ্যতামূলক ?

কিছু কিছু সালাত জামাআত ছাড়া আদায় হবে না। যেমন জুমআর সালাত ও দুই ঈদের সালাত। এই সালাতগুলি একক ভাবে আদায়ের বিধান নেই। কেউ একা-একা এই সালাত আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে না। অবশ্যই জামাআত করে এই সালাত আদায় করতে হবে।

জামাআত কখন ফরজ ওয়াজেব সুন্নত ও মোস্তাহাব ?

১. জুমআ ও দুই ঈদের সালাত জামাআতে পড়া ফরজ বা বাধ্যতা মূলক। ২. পাঁচ ওয়াকত ফরজ সালাত জামাআতে পড়া ওয়াজেব। কোন বৈধ কারণ ছাড়া জামাআতে ফরজ সালাত না পড়া পাপ। ৩. তারাবীহ চন্দ্র, সূর্য গ্রহণের (কসুফ ও খসুফ) সালাতের জামাআতে পড়া সুন্নতে মোয়াক্কদাহ (অবশ্য পালনীয় সুন্নত) ৪. রমজানে বেতেরের সালাত জামাআতে পড়া মোস্তাহাব। ৫. জানাযার সালাত প্রকৃত অর্থে মৃতের জন্য প্রার্থনা তাই এই সালাতও জামাআত করে আদায় করা বিশেষ জরুরী।

ইমাম কাকে বলে ও মোক্তাদি কারা ?

সমবেত জনমণ্ডলী বা একাধিক লোক একত্রিত হলে যিনি ফরজ সালাত বা পরিচালনার জন্য সকলের সামনে একক ভাবে একটি পৃথক লাইনে দাঁড়িয়ে সকলের নামাযের নেতৃত্ব দেন তাঁকে ইমাম বলে। সমবেত অন্য সকলেই ইমামের পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে ইমামকে অনুসরণ করে ফরজ নামায আদায় করেন। এই সমবেত সকলকে মোক্তাদি বা অনুসরণ কারী বলে।

মোক্তাদি কত রকম ?

জামাআতে যোগদানকারী মোক্তাদি সাধারণতঃ তিন রকম। যথা : মোদরেক, লাহেক ও মাসবুক।

মোদরেক : যাঁরা জামাআতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকেন তাঁরা হলেন মোদরেক।

লাহেক : যাঁরা প্রথমে জামাআতে যুক্ত ছিলেন কিন্তু ওজু নষ্ট হওয়া বা কোন কারণে নামায ছেড়ে দিতে হয়েছে ফলে নামাযের কিছু অংশ ছেড়ে গেছে তাঁদের লাহেক বলে।

মাসবুক : যাঁরা জামাআত আরম্ভ হয়ে এক দুই বা তিন রাকাআত নামায পড়া হয়ে যাওয়ার পর জামাআতে যোগ দেন অর্থাৎ যারা জামাআতের কিছু অংশ হয়ে যাওয়ার পর যুক্ত হন তাদের মাসবুক বলে।

কি কারণে লাহেকের নামায ছেড়ে যাওয়া বৈধ এবং তা পুনঃ আদায়ের নিয়ম কি ?

প্রথমতঃ জামাআতে যোগ দেওয়ার পর যদি কারও ওজু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার জন্য জামাআত ছেড়ে দেওয়া বৈধ। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি জামাআত ছেড়ে দিয়ে আবার ওজু করবেন ও পুনরায় জামাআতে যোগ দেবেন। লাহেকের জন্য এই সময় কথা বলা বা এমন কাজ করা বৈধ নয় যাতে সালাত বা নামায নষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ লাহেকের কোন রাকাআত ছেড়ে গেলেও তিনি মোদরেকের মতই বিবেচিত হবেন সুতরাং তাঁকে কোন কেরাত পড়তে হবে না বরং শুধু মাত্র মোদরেকের মতই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে অবশিষ্ট সালাত শেষ করবেন।

তৃতীয়ত : লাহেকের যদি পুনরায় জামাআতে যোগ দেওয়া সময়ের মধ্যে কোন রাকাআত ছেড়ে যায় তাহলে প্রথমে একক ভাবে সেই ছেড়ে যাওয়া সালাত আদায় করতে হবে এবং তা করার সময়ের মধ্যে যদি জামাআত শেষ না হয় তাহলে পুনরায় জামাআতে যোগ দেবেন আর যদি তাঁর ছেড়ে যাওয়া সালাত শেষ করতে করতে জামাআত শেষ হয়ে যায় তাহলে অবশিষ্ট সালাত বা নামায একা একাই শেষ করবেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় :—

যদি কারো দ্বিতীয় রাকাআতে ওজু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তিনি নামায ছেড়ে ওজু করতে যাবেন। ওজু করে ফিরে এসে যদি তিনি দেখেন যে ইমাম তখন শেষ অর্থাৎ চতুর্থ রাকাআত নামায পড়ছেন তাহলে তাঁকে কি করতে হবে? তিনি ফিরে জামাআতের কাতারেই দাঁড়াবেন এবং প্রথমে তাঁকে তার যে কয় রাকাআত নামায ছেড়ে গেছে সেই কয় রাকাআত নামায আদায় করতে হবে। কোন ছেড়ে যাওয়া নামায আদায় না করে কোন ভাবেই তার পক্ষে ইমামের সঙ্গে যুক্ত হওয়া চলবে না। তাঁর দ্বিতীয় রাকাআতে ওজু নষ্ট হয়েছে সুতরাং তাঁকে প্রথমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকাআত নামায কেরাআত ছাড়া আদায় করতে হবে। আর যদি লাহেক ব্যক্তির দু রাকাআত আদায়ের পরও জামাআত থাকে তাহলে অবশিষ্ট নামায ইমামের সঙ্গেই আদায় করতে হবে। নতুবা একা একাই নামায শেষ করবেন।

ধরা যাক কারো এশার ফরজের প্রথম রাকাআতে ওজু নষ্ট হওয়ায় নামায ছেড়ে দিতে হল। ঐ ব্যক্তি খুব দ্রুত নতুনভাবে ওজু করে এসে দেখল যে ইমাম দ্বিতীয় রাকাআতের তাশাহুদ পড়ছেন তাহলে লাহেক ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে জামাআতে যোগ দিয়ে ছেড়ে যাওয়া রাকাআতগুলি আদায় করে নেবেন আর যদি এমন হয় যে লাহেক ব্যক্তি তৃতীয় রাকাআত নামায পড়ে দেখলেন ইমাম তখন চতুর্থ রাকাআত পড়ছেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ইমামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চতুর্থ রাকাআত নামায আদায় করবেন।

জামাআতে নামাযের গুরুত্ব কতটা ?

জামাআতে সালাত বা নামাযকে ইসলামে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞজন জামাআতে নামায পড়াকে 'ফরজ' বা 'ওয়াজেবের' মত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। জামাআতে নামাযের মহত্বগুলি নিম্নরূপ। যথা :—

১. একক ভাবে সালাত বা নামায অপেক্ষা জামাআতে ২৭ গুণ বেশী পুণ্য (সওয়াব) লাভ হয়। ২. জামাআতে সালাত বা নামাযের পদ্ধতি প্রচলনের ফলে মুসলমানগণ প্রতিদিন পাঁচবার একত্রিত হওয়ার সুযোগ পান, তাতে পরস্পরের খোঁজ খবর জানা যায়, নিজেদের মধ্যে পরিচয় গভীর হয়। ভালবাসা ও ঐক্য বর্দ্ধিত হয়। সৎ স্বভাব, সৎভাব ও সৎচরিত্র গঠনে

বহু আদর্শ অনুকরণ সম্ভব হয়। ফলে সভ্যতা সংস্কৃতি ও ও কৃষ্টি বিনিময় দ্বারা সমাজকে উন্নত মানে উন্নীত করার পথ সুগম হয়। আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পায়। ৩. মহান আল্লাহ্ জামাআতের দ্বারা সংব্যক্তিবর্গের সৌজন্যে বহু সাধারণ লোকের সালাত বা নামায কবুল (গ্রহণ) করেন ৪. জামাআতের দ্বারা বহু সাধারণ লোক বিজ্ঞ, জ্ঞানী আলেমের সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হন এবং তাঁদের উন্নত চিন্তায় নিজেকে আলোকিত করার সুযোগ লাভ করেন। ৫. জামাআতের দ্বারা সকল মুসলমান প্রতিবেশীর অভাব অনটন, সমাজের দুরবস্থা ইত্যাদি বিষয় জানতে পারা যায়। ৬. সর্বোপরি জামাআতের দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে নামাযের আগ্রহ অধিক পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ৭. জামাআতে সালাত আদায় সমাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়। এই সকল কারণে আমাদের নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) মুসলমানদের সমবেত হয়ে প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ সালাত বা নামায আদায় করার জন্য বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং নিজে আজীবন জামাআতের মাধ্যমে সকল ফরজ নামায, দু ঈদের নামায, তারাবিহর নামায আদায় করেছেন।

কাদের জামাআতে সালাত বা নামায পড়া থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে?

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের জন্য জামাআতে সামিল না হওয়া অনুমোদিত। **যথা:** নারী, শিশু, অসুস্থ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, অতিবৃদ্ধ এবং অন্ধ ব্যক্তিগণ জামাআতে যোগদান না করলেও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না অর্থাৎ এদের জন্য জামাআতে যোগ না দেওয়া অনুমোদিত।

মহিলাগণ জামাআতের নামাযে গেলে কি করবেন?

জামাআতে গেলে মহিলাগণকে মসজিদে বা নামাযের জায়গার পিছনের দিকের সারিতে দাঁড়াতে হবে। একই সারি বা কাতারে মহিলা ও পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়ান নিষেধ এবং পর্দাহীন অবস্থায় মহিলাদের জামাআতে যোগ দেওয়াও নিষেধ। যেখানে মহিলাদের জন্য পৃথক জায়গা আছে সেখানে মহিলাদেরকে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াতে হবে। পবিত্র কাআবা শরিফের

মসজিদে হেরেমে এবং মদিনা মানোওয়ারায় রাসুলুল্লাহ্‌র মসজিদে নাবাবীতে একই ইমামের পিছনে মহিলা ও পুরুষগণ পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করে থাকেন। মসজিদে নাবাবীতে ও কাআবার হেরেম শরিফের মসজিদে মহিলাদের জন্য নির্দ্ধারিত জায়গা আছে। সৌদীআরবের বহু মসজিদে পেছনের দিকে মহিলাদের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করা আছে। মদিনার মসজিদে নাবাবীর একটি দরজার নাম 'বাবুন্ নেসা' বা মহিলাদের প্রবেশ দ্বার। এই দরজা দিয়ে কেবলমাত্র মহিলাগণই মসজিদে প্রবেশ করেন।

কি কি কারণে জামাআতে সালাত বা নামায না পড়লে চলে ?

নিম্নলিখিত অবস্থায় জামাআতে সালাত বা নামায আদায় না করা অনুমোদিত। যথা: ১. প্রবল বর্ষণ ও দুযোগপূর্ণ আবহাওয়ার সময়। ২. মসজিদের পথ পঙ্কিল কর্দমাক্ত বা গলিত তুষারাবৃত হলে। ৩. রাত্রিতে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হতে থাকলে। ৪. শৈত্য প্রবাহ বইতে থাকলে। ৫. ট্রেন, জাহাজ বা উড়ো জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার সময় হয়ে থাকলে বা ঐ সকল যানবাহনে ভ্রমণকালে। ৬. প্রাকৃতিক প্রয়োজন (প্রস্রাব পায়খানা) জোরদার হলে। ৭. কোন ক্ষুধিত লোকের সামনে খাবার সরবরাহ করা হলে।

জামাআতের জন্য কম পক্ষে কতজন দরকার ?

কমপক্ষে দুজন হলেই জামাআত করে সালাত আদায় করা যায়। দুজন হলে একজন ইমাম হবেন ও অপরজন তাঁকে অনুসরণ করবেন। এক্ষেত্রে দুজনই পাশা পাশি দাঁড়াবেন যিনি ইমাম হবেন তাঁর ডানদিকে অপর জনকে তাঁর তুলনায় চার আঙ্গুল পিছিয়ে দাঁড়াতে হবে। যদি দুই এর অধিক অর্থাৎ তিন বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হন তাহলে ইমাম আগের লাইনে একা এবং বাকী দুজনকে এক লাইন পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। প্রথম জন ইমামের ঠিক সোজা পিছনে এবং দ্বিতীয় জনকে তাঁর ডানদিকে একই সারিতে ইমামের অনুসরণ করে নামায বা সালাত আদায় করতে হবে।

জামাআতে সালাত বা নামায আদায়ের নিয়ম কিরূপ ?

প্রথমে সালাত বা নামায পরিচালনার জন্য ইমাম মনোনীত করে নিতে

হবে। যদি স্থায়ী ইমাম থাকেন ভাল, নইলে সমবেত লোকের মধ্য থেকেই উপযুক্ত লোক নির্বাচন করতে হবে। এবার ইমামের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় ইমাম দাঁড়াবেন বাকী সকলে সারিবদ্ধ হয়ে পিছনের সারিতে দাঁড়াবেন। মোয়াজ্জেন কিম্বা তাঁর অনুমোদিত কোন লোক ইমামের ঠিক পেছনের সারিতে ইমামের সোজা দাঁড়িয়ে তাকবির বলবেন। মোয়াজ্জেন "হাইয়া আলাস সালাহ" বললে ইমাম ও মোকতাদিগণের দাঁড়িয়ে যাওয়া দরকার। এবার মোক্তাদিগণ নিজ নিজ লাইন ঠিক করে নেবেন। পরস্পর গোড়ালি সমান রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাযে দাঁড়াতে হবে। মোয়াজ্জেন 'কাদ কামাতিস সালাহ' বলার সঙ্গে ইমাম সহ সকলে নিয়ত শুরু করবেন। সকলেই নির্দিষ্ট ফরজ নামাযের নিয়ত করবেন। ইমাম নিয়ত করার সময় মোতাওয়াজ্জেহান শব্দ বলার আগে বলবেন 'আনা এমামুন লেমান হাজারা ওয়া মাই ইয়াহ জোর' বা যারা উপস্থিত আছেন এবং যারা উপস্থিত হবেন আমি তাদের ইমাম। অপর দিকে মোক্তাদীগণ অর্থাৎ অবশিষ্ট সকলেই ঐ একই ভাবে 'মোতাওয়াজ্জেহান' শব্দের আগে "একতাদাইতো বে হাযাল ইমাম" অর্থাৎ এই ইমামের অনুসরণে বলে নিয়তের বাকী অংশ শেষ করবেন। নিয়ত করে ইমামকে উচ্চস্বরে ও মোক্তাদিগণকে মনে মনে তাকবির বলে তাহরিমা বাঁধতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ইমামের তাকবির বলার আগে কারো তাকবির বলা না হয়। ইমাম এবার সানা আউজোবিল্লাহ····বিসমিল্লাহ ···মনে মনে পড়ে উচ্চস্বরে সুরা ফাতেহা ও কোরআন শরিফ থেকে কিছু আয়াত বা সুরা সশব্দে পড়তে থাকবেন। মোক্তাদীগণ সানা, আউজোবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ মনে মনে পড়ার পর একাগ্রতার সঙ্গে ইমামের পড়া শুনতে থাকবেন।

ইমাম মাগরেব ও এশার ফরজের প্রথম দুরাকাআতে এবং জুমআর ফজর নামাযে; তারাবীহ ও দুই ঈদের এবং রমজানের বেতের নামাযের প্রত্যেক রাকাআত নামাযে কেরাত জোরে পড়বেন এবং জোহর আসরের ফরজের প্রথম দুরাকাআতেও কেরাত নীরবে মনে মনে পড়বেন। মোকতাদীগণ মনে মনে তাকবির ও সালাম বলে ইমামের সঙ্গে রুকু, সেজদা করবেন ও রুকু সেজদার তসবিহ পড়বেন। যদি ইমাম কোন জায়গায়

ভুল করেন তা হলে মোকতাদিগণ 'আল্লাহো আকবার' বলে সতর্ক করে ভুল ধরিয়ে দেবেন।

তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে ইমাম কেবল মাত্র প্রথম 'দুরাকাআতেই সুরাফাতেহা ও অন্য একটি সুরা বা আয়াত সশব্দে পড়বেন. বাকী রাকাআতে মনে মনে কেবল মাত্র সুরা ফাতেহা পড়বেন কিন্তু সব তাকবীর ও সালাম জোরে বলবেন।

ইমাম নামায শুরুর পরে কেউ উপস্থিত হলে কি করতে হবে ?

ইমাম কেরাত পাঠ আরম্ভ করার পর যদি কেউ উপস্থিত হন তবে তাঁকেও নিয়ত করে তাহরিমা বেঁধে জামাআতের সঙ্গেই দাঁড়াতে হবে। তাহরিমা বেঁধে আর 'সানা' পড়তে হবে না কেবলমাত্র মনোযোগ সহকারে ইমামের কেরাত পাঠ শুনতে থাকবেন। আলহামদোর সুরা পাঠ শেষ হলে সকল মোকতাদিকেই মনে মনে 'আমীন' বলতে হবে। যথারীতি সকলেই রুকু সেজদার তাকবির ও তসবিহ নিয়ম মত পড়বেন। ইমাম যখন রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানর সময় "**সামেআল্লাহো লেমান হামেদা**" বলবেন তখন সকল "মোক্তাদী"কে মনে মনে "**রাব্বানা লাকাল হামদ**" বলতে বলতে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। জামাআতে ইমামের সঙ্গে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন কোন ভাবে ইমামের রুকু সেজদার আগে রুকু সেজদা বা কোন কাজ না করা হয়ে যায়। এরকম করা গর্হিত অন্যায় বা মহাপাপ।

জামাআতে হোক আর একা একা হোক যে কোন ফরজ নামাযের ক্ষেত্রে প্রথম দুরাকাআতে সুরা ফাতেহার সঙ্গে অন্য একটি সুরা বা কোরআনের আয়াত পড়তে হবে বাকী রাকাআতে শুধু আলহামদোর সুরা পড়তে হবে। জামাআতের ক্ষেত্রে মোকতাদিগণ কোন রাকাআতে কোন কিছু না পড়ে চুপ থেকে ইমামের অনুসরণ করবেন। তবে সুরা ফাতেহা পড়া উত্তম বলে ইমাম আবু হানিফা ছাড়া অন্য ইমামগণ ও ইমাম বোখারী মত প্রকাশ করেছেন। আবার ইমাম আবু হানিফার মতে কিছু না পড়ে চুপ থাকা উত্তম।

জামাআতের কয়েক রাকাআত নামাযের পর কেউ উপস্থিত হলে কি করতে হবে?

যদি কেউ উপস্থিত হয়ে দেখেন জামাআতের এক, দুই বা তিন রাকাআত হয়ে গিয়েছে তা সত্ত্বেও যে অবস্থায় জামাআত চলছে উপস্থিত ব্যক্তিকে সে অবস্থাতেই নিয়ত করে জামাআতের সামিল হতে হবে। এক্ষেত্রে নিয়ত করে তাহরিমা বেঁধেই জামাআতের অনুসরণ করতে হবে। সানা ইত্যাদি পড়তে হবে না চুপচাপ ইমামের অনুকরণ করতে হবে। ইমাম ডান-বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাম বলে নামায শেষ করলে তাকবির বলে উঠে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট নামায শেষ করতে হবে। এই ভাবে যারা আংশিক জামাআতে অংশ গ্রহণ করেন তাদের মাসবুক বলে।

মাসবুকের সালাত বা নামাযের নিয়ম কি?

যদি কোন লোক চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাত বা নামাযের এক রাকাআত বাকী থাকার সময় জামাআতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন তা হলে তাঁকে ইমাম সালাত বা নামায শেষ করার পর তাকবির বলে উঠে দাঁড়িয়ে 'সানা আউযোবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ পড়তে হবে; তারপর আলহামদোর সুরা পড়ে তার সঙ্গে অন্য একটি সুরা বা কোরআন শরীফের কিছু আয়াত পড়ার পর যথা নিয়মে রুকু, সেজদা করে তসবীহ পড়ে বসে তাশাহুদ পড়তে হবে। এবার তাকবির বলে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াতে হবে। এবারেও পূর্ব রাকাআতের মত বিসমিল্লাহ্, সুরা ফাতেহা ও তার সঙ্গে অন্য একটি সুরা বা কোরআনের কয়েকটি আয়াত পড়ে এই রাকাআতের প্রয়োজনীয় রুকু সেজদা করে সোজা সোজা দাঁড়াতে হবে এবং কেবলমাত্র আলহামদো বা সুরা ফাতেহা পড়ে চতুর্থ রাকাআত শেষ করে বসে তাশাহুদ, দরূদ ও দোওয়া মাসুরা পড়ে সালাম বলে নামায শেষ করতে হবে। আর যদি কেউ দুরাকাত বা এক রাকাআত নামাযের পর জামাআতে যোগ দেন তাহলে জামাত শেষ হলে বাকী ঐ দুই বা এক রাকাআত নামায একা একা নামায পড়ার নিয়মে শেষ করবেন। যদি কেউ ফজরের নামাযের শেষ রাকাআতে এবং মাগরেবের নামাযের দ্বিতীয় রাকাআতের জামাআতে যোগ দেন তাহলে

ইমাম সালাম বলে নামায শেষ করার পর তাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে সানা আউযোবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সহ সুরা ফাতেহা ও অন্য সুরা পড়ে রুকু সেজদা করে বসে তাশাহুদ, দরূদ ও দেওয়া মাসুরা পড়ে সালাম বলে নামায শেষ করতে হবে।

একক ভাবে নামায আরম্ভ করে দেওয়ার পর জামাআত শুরু হলে কি করতে হবে ?

যে কোন ফরজ নামাযের জামাআত শুরু হওয়ার আগেই কোন লোক যদি একা একা কোন ফরজ নামায শুরু করে থাকেন এবং প্রথম রাকাআতের সেজদা না করা হয়ে থাকে তাহলে নামায ছেড়ে জামাআতে যোগ দিতে হবে। আবার দুই বা তিন রাকাআতের নামাযের ক্ষেত্রে যদি প্রথম রাকাআতের সেজদা করা হয়ে গিয়েও থাকে তাহলেও নামায ছেড়ে জামাআতে যোগ দিতে হবে। আর যদি চার রাকাআত বিশিষ্ট নামায হয় এবং প্রথম রাকাআতে সেজদা করা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় রাকাআত পড়ে সালাম বলে নামায শেষ করে জামাআতে যোগ দিতে হবে। কিন্তু চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের তিন রাকাআত এবং তিন রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের দুই রাকাআত একা একা পড়া হয়ে গিয়ে থাকলে আর জামাআতে যোগ না দিয়ে একক ভাবেই নামায শেষ করতে হবে। এক্ষেত্রে এক রাকাআতের জন্য নামায ছেড়ে জামাআতে যোগ দিতে হবে না।

কোন অবস্থায় জামাআতে যোগ দিলে রাকাআত পাওয়া গণ্য হবে ?

যদি ইমামের রুকু থেকে দাঁড়ানর সময় কিংবা তারপর কেউ জামাআতে যোগ দেন তাহলে তাঁর ঐ রাকাআত নামায পাওয়া গণ্য হবে না। নিয়ত করে তাকবীর বলে তাহরিমা বেঁধে রুকুতে এমামের সঙ্গে যোগ দিতে পারলে তবে ঐ রাকাআত নামায পাওয়া গণ্য হবে। অর্থাৎ ঐ রাকাআতের কেরাআতে যোগ না দিলেও কেবল রুকুতে যোগ দিতে পারলেই ঐ রাকাআত নামায পাওয়া গেল বলে গণ্য করতে হবে এবং জামাআত শেষে আর ঐ রাকাআত পড়তে হবে না।

সুন্নত নামায বাদ দিয়ে জামাআতে যোগ দেওয়া বৈধ কি ?

যদি ফজরের সময় সুন্নত পড়লে জামাআতে যোগ দেওয়া যাবে না বা জামায়াতের কোন রাকআতেই যুক্ত হওয়া যাবে না এমন হয় তাহলে সুন্নত ছেড়ে দিয়ে জামাআতে যোগ দিতে হবে। তবে যদি সুন্নত শেষ করে জামাআতের এক রাকাআত বা তাশাহুদে যোগ দেওয়া সম্ভব হবে মনে হয় তাহলে অন্যত্র সুন্নত শেষ করে জামাআতে যোগ দিতে হবে। জোহরের প্রথম সুন্নত আদায়ে জামাআতে যুক্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকুক বা থাকুক উভয় ক্ষেত্রেই সুন্নত ছেড়ে জামাআতে যোগ দিতে হবে এবং জামাআতের শেষে দুরাকাআত সুন্নতের আগে বা পরে পূর্বের ঐ চার রাকাআত সুন্নত কাজা পড়ে নিতে হবে।

কিরূপ ব্যক্তি ইমাম হওয়ার উপযুক্ত ?

যোগ্যতার দিক থেকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইমাম হওয়ার উপযুক্ত। যথা (১) শিক্ষিত জ্ঞানবান ব্যক্তি—যিনি নামাযের প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন ভাল জানেন এবং সঠিক পথে চলেন (২) যে ব্যক্তির কোরআন সম্পর্কে ভাল জ্ঞান আছে এবং অপেক্ষাকৃত সঠিক ভাবে কোরআন তেলাওয়াতে সক্ষম। (৩) যিনি আল্লাহ্‌কে বেশী ভয় করেন। (৪) যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ। (৫) যিনি মহৎ চরিত্রের অধিকারী ও সৎ স্বভাব বিশিষ্ট। (৬) যিনি অধিক সৌম্য ও সুদর্শন এবং সম্মানের অধিকারী। (৭) যিনি সৎ ও উচ্চ বংশজাত। (৯) যিনি সুন্নতের অধিক অনুসারী।

তবে যদি কোথাও স্থায়ী ইমাম থাকেন তাহলে অপেক্ষাকৃত অনেক যোগ্য ব্যক্তি থাকলেও নির্দিষ্ট ইমামই শ্রেয়। তিনিই ইমামতী করার অধিকারী।

কোন প্রকার ইমামের পিছনে সালাত বা নামায আদায় করা মাকরূহ ?

বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ইমাম নিযুক্ত করে সালাত আদায় করা মাকরূহ। (১) যিনি ইসলাম ধর্ম নতুন গ্রহণ করেছেন। (২) যিনি ধর্মীয় নিয়ম ও বিধান লঙ্ঘনকারী। (৩) অশিক্ষিত দাস।

(৫) মূর্খ সংস্কৃতিহীন গ্রাম্য অসভ্য। কিন্তু দাস বা গ্রাম্য ব্যক্তি যদি শিক্ষিত জ্ঞানবান হন তবে তিনি ইমামের উপযুক্ত ও তাঁর পিছনে সালাত সম্পূর্ণ বৈধ। (৫) বিবেক বর্জিত অন্ধ—কিন্তু যদি অন্ধ ব্যক্তি শিক্ষিত বিবেক-বান হন এবং ভাল ও শুদ্ধ কোরআন পাঠে সক্ষম হন তাহলে তিনি ইমামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। (৬) অজ্ঞ জারজ সন্তান। কিন্তু যদি এমন হয় যে ঐ জারজ ব্যক্তি যথেষ্ট শিক্ষিত জ্ঞানবান ও ন্যায়ের পথিক আর উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উত্তম ব্যক্তি নেই তাহলে ঐ জারজের ইমামতী করায় কোন অপরাধ হবে না এবং তার পিছনে সালাত বা নামায সম্পূর্ণ বৈধ হবে।

কি ধরনের লোকের পিছনে সালাত বা নামায আদায় নিষেধ?

নিম্নলিখিত ব্যক্তির পিছনে সালাত বা নামায আদায় সম্পূর্ণ নিষেধ।

১. উন্মাদ, মাতাল, বহু ঈশ্বরবাদী ও অবিশ্বাসী (কাফের) ব্যক্তির পিছনে।

২. পূর্ণ বয়স্ক সাবালক ব্যক্তির নাবালক শিশুর পিছনে এবং পুরুষের মহিলার পিছনে।

৩. অনুরূপ ভাবে কোন স্বাভাবিক অঙ্গবিশিষ্ট ওজু করা ব্যক্তির অঙ্গহীন বিকলাঙ্গ ব্যক্তি যাঁর ওজু সম্ভব নয় তায়াম্মুম করতে হয় তাঁর পিছনে।

৪. যাঁর 'সতর' সম্পূর্ণ আবৃত তার পক্ষে যাঁর 'সতর' অনাবৃত তাঁর পিছনে।

৫. যাঁকে ইশারায় সালাতের রুকু সেজদা করতে হয় না এমন লোকের পক্ষে যাকে সালাতে রুকু সেজদা ইশারার বা ইঙ্গিতের দ্বারা করতে হয় তাঁর পিছনে।

৬. নফল সালাত আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর সালাত বৈধ নয়।

৭. কোন জোহর সালাত বা নামায আদায়কারীর পিছনে আস্বরের সালাত বা নামায আদায় বৈধ নয়। অর্থাৎ একই ওয়াক্তের সালাত আদায়কারী না হলে তাঁর একতেদা (অনুসরণ) করা যাবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জুমআ বা শুক্রবারের সালাত বা নামায

জুমআর সালাত বা নামায ফরজ, ওয়াজেব না সুন্নত ?

জুমআর সালাত বা নামায সকল মুসলমান পুরুষের জন্য ফরজ। জুমআর দিন জোহরের সালাত পড়তে হয় না। জোহর অপেক্ষা জুমআর সালাতের উপর অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জুমআর দিনে জোহরের ওয়াক্তের সময় কালেই দুরাকাত সালাত জামাআতে পড়া ফরজ। জুমআর সালাত একা একা পড়া যায় না।

জুমআর সালাত বা নামায কি সকল মুসলমানের জন্য ফরজ ?

যে সকল মুসলমান স্বাধীন, সাবালক, জ্ঞানবান শারীরিক দিক থেকে সক্ষম, দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন তেমন সকল মুসলমান পুরুষের জন্য জুমআর নামায ফরজ। সুতরাং এই নামায দাস, নাবালক, শিশু, অসুস্থ, অন্ধ, খঞ্জ, স্ত্রীলোক ও ভ্রমণকারীর জন্য ফরজ নয়। তবে যদি স্ত্রীলোক, অন্ধ, অক্ষম, ভ্রমণকারী জুমআর সালাতে যোগ দেন তবে তাঁদের সালাত বৈধ হবে এবং তাঁদেরকে আর জোহরের সালাত বা নামায আদায় করতে হবে না।

জুমআর সালাত বা নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত কি ?

নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি পরিপূর্ণ হলেই জুমআর সালাত ফরজ হয়। যথা :

১. জোহরের সময়কাল হল জুমআর সময়।

২. শহর, নগর ও বড় গ্রাম এবং যেখানে বাদশাহ, কাজী বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন।

৩. জুমআর ফরজ সালাতের পূর্বে খোতবা পড়া ;

৪. ইমাম ছাড়া কম পক্ষে আরও তিনজন উপস্থিত থাকা ;

৫. মুসলিমদের জন্য মসজিদে প্রবেশে কোন বাধা নিষেধ না থাকা এবং মসজিদের দরজা বন্ধ না থাকা ;

৬. জুমআর নামাযের খোতবা পড়া।

জুমআর সালাত বা নামায মোট কত রাকাআত ও কি কি ?

জুমআর সালাত বা নামায মোট চোদ্দ রাকাআত। তবে জুমআর সালাতের জন্য ওজু করে আরও দুরাকাআত তাহিয়াতুল ওজু ও দুরাকাত দোখুলুল মাসজেদ নামক সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ সালাত পড়া উত্তম। জুমআর চোদ্দ রাকাআত সালাত বা নামায নিম্নরূপ :

ক. চার রাকাআত কাবলাল জুমআ—এই সালাত সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ ;

খ. দু'রাকাআত ফরজ।

গ. চার রাকাআত বাআদাল জুমআ—এই সালাত সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ।

ঘ. দু'রাকাআত ওয়াকতুস সুন্নতে—এই সালাত সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ।

ঙ. দু'রাকাআত নফল।

চ. এছাড়া দু'রাকাআত তাহিয়াতুল ওজু, দুরাকাআত দোখুলুল মসজিদ ও জুমআয় সন্দেহ হলে চার রাকাআত আখেরীজ জোহর নামাযও জুমআর নামাযের সময় পড়া হয়, এই নামাযগুলি সহ মোট নামায বাইশ রাকাআত।

জুমআর সালাত বা নামায পড়ার নিয়ম কি ?

জুমআর দিন ওজু করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে মসজিদে যাওয়া উচিৎ। প্রথমে দুরাকাআত তাহিয়াতুল ওজু তারপর দুরাকাআত দোখুলুল মাসজিদ সালাত পড়তে হয়। এরপর চার রাকাআত কাবলাল জুমআর সুন্নত সালাত পড়তে হবে। এবার সময় হলে ইমাম ফরজ সালাতের পূর্বে মিম্বরে উঁচু জায়গায় উঠে বসবেন এবং মোয়াজ্জেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়বার স্বাভাবিক স্বরে আযান দেবেন। আযান শেষ হলে ইমাম উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত মুসলমানের সামনে খোতবা পড়বেন। খোতবা দু অংশে বিভক্ত যেমন প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশ পাঠ করার পর ইমাম বসবেন এবং তিন তসবিহ পরিমাণ বসার পর পুনরায় উঠে দাঁড়িয়ে খোতবার শেষাংশ পড়বেন। খোতবা পড়া শেষ হলে মোয়াজ্জেন 'একামত' বলতে শুরু করবেন। একামত বলা শুরু হলে মুসল্লীগণকে উঠে দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে নিতে হবে। মোয়াজ্জেন 'কাদকামাতিস সালাহ' বলার পর দু'রাকাআত ফরজ সালাতের নিয়ত শুরু করতে হবে। এবার ইমাম জোরে তাকবির বলার পর মুসল্লীগণও মনে মনে তাকবির বলে কান পর্যন্ত

হাত উঠিয়ে তাহরিমা বাঁধবেন এবং সাধারণ সালাতের নিয়ম অনুসারে ইমামের সঙ্গে সালাত শেষ করবেন।

সালাত শেষ করার পর প্রথম চার রাকাআত বা'আদাল জুমআ পড়তে হয়। অনেকে চার রাকাআত বা'আদাল জুমআর সুন্নতের পর চার রাকাআত আখেরীজ জোহর পড়ে থাকেন। জুমআর সালাতে কোন রকম সন্দেহ বা অসুবিধার কারণে এই সালাত পড়তে হয়। তাই এই সালাতের নিয়তে সুন্নত, ওয়াজেব, নফল কিছুই বলতে হয় না, এবং এই সালাত না পড়লেও জুমআর সালাতের কোন ক্ষতি হয় না।

এর পর দুরাকাআত সুন্নত ও দুরাকাআত নফল সাধারণ সুন্নত ও নফলের নিয়ত করে আদায় করতে হয়।

জুমআর খোতবা কি আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় পড়া যায়?

জুমআর সালাতে আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় খোতবা পড়া কাম্য নয়। তবে নিজ মাতৃ ভাষায় ধর্মীয় নৈতিকতা ও মুসলিম চেতনা বৃদ্ধি মূলক উপদেশ দিলে তা অবৈধ হবে না। অর্থাৎ অন্য ভাষাতে খোতবা নিষিদ্ধ নয় তবে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খোতবা পড়ার জন্য আল্লাহ্ অপেক্ষাকৃত কম সওয়াব দেবেন। তা ছাড়া এর ফলে বিশ্ব মুসলিম ঐক্য ও নষ্ট হবে। সুতরাং প্রথমে নিজ নিজ ভাষায় উপদেশ দানের পর খোতবা আরবীতে পড়াই যুক্তিযুক্ত।

জুমআর খোতবার সময় কি কি করা নিষিদ্ধ?

খোতবা শ্রবণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এমন যে কোন কাজ এই সময় নিষেধ। বিশেষতঃ নিম্নলিখিত কাজ একান্তই অবাঞ্ছনীয়। যথা:—

(১) কথাবার্তা বলা ও পরস্পর বাক্য আদান প্রদান করা (২) সুন্নত ও নফল সালাত আদায়ে লিপ্ত হওয়া। (৩) পানাহার করা (৪) কোন বিষয় মন্তব্য করা ও কারো কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া (৫) কোরআন তেলাওয়াত করা। ইমাম খোতবার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল কাজ বন্ধ করতে হবে।

জুমআর সব নামায বা সালাতের নিয়তগুলি কি পরপর বল ঃ

প্রথমে দুরাকাত তাহিয়্যাতুল ওজুর নিয়ত হ'ল :—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّحِيَّةِ
الْوُضُوْءِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

নাওয়াইতো আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তাআলা রাকাআতে সালাতিল তাহিয়্যাতুল ওজুয়ে সুন্নাতে রাসুলিল্লাহ তাআলা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতিশ শারিফাতে—আল্লাহো আকবার।

বাংলা ঃ আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পবিত্র কাআবা শরিফের দিকে মুখ করে দুরাকাঅত তাহিয়্যাতুল ওজুর সালাতের নিয়ত করছি—আল্লাহো আকবার।

এরপর দুরাকাত দোখুলুল মাসজিদ সুন্নত সালাত।

নিয়ত পূর্বের মতই কেবল 'তাহিয়্যাতুল ওজু' শব্দের জায়গায় "দোখুলুল মাসজিদ" বলতে হবে।

এবার চার রাকাআত কাবলাল জুমআ সালাত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ
قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ
الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

নাওয়াইতো আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তাআলা আরবাআ রাকাআতে সালাতে কাবলাল জুমআতে সুন্নাতে রাসুলিল্লাহে তাআলা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতিশ শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলা ঃ আমি মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কাআবা শরিফের দিকে মুখ

করে চার রাকাআত কাবলাল জুমআর সুন্নত সালাতের (নামাযের), নিয়ত করছি— আল্লাহো আকবার।

এবার দুরাকাআত ফরজ সালাত নিয়ত যথা :—

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ اَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ

رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى

جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

নাওয়াইতো আন উসকেতা আন যিম্মতি ফারজুজ জোহরে বেআদায়ে রাকআতায় সালাত্তিল জুমআতে ফারজুল্লাহে তাআলা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতেশ শরীফাতে—আল্লাহো আকবার।

বাংলা : আমি মহান আল্লাহ্‌র জন্য পবিত্র কাআবা শরীফের দিকে মুখ করে আমার উপর হতে জোহরের ফরজ আদায় করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুরাকাআত জুমআর ফরজ সালাতের নিয়ত করছি—আল্লাহো আকবার।

এবার চার রাকাআত বাআদাল জুমআর নিয়ত :—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ

بَعْدَ الْجُمُعَةِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى

جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

নিয়ত কাবলাল জুমআর অনুরূপ কেবল মাত্র 'কাবলাল জুমআ' শব্দের জায়গায় 'বাআদাল জুমআ' বলতে হবে।

চার রাকআত আখেরীজ জোহর এর নিয়ত কি ?

আখেরীজ জোহরের নিয়ত হল :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ
اٰخِرِ ظُهْرٍ اَدْرَكْتُ وَقْتَهٗ وَلَمْ اُصَلِّهٖ بَعْدَهٗ مُتَوَجِّهًا اِلٰى
جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

নাওয়াইতো আন উস্বাল্লিয়া লিল্লাহে তাআলা আরবাআ রাকাআতে সালাতে আখেরিজ্জোহরে আদরাকতো ওয়াকতোহু ওয়ালাম উস্বাল্লেহি বাআদাহু মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতেশ শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলা : আমি মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে পবিত্র কাআবা শরীফের দিকে মুখ করে চার রাকাআত আখেরীজ্জোহর নামাযের নিয়ত করছি—আল্লাহো আকবার।

এর পর দুরাকাআত ওয়াকতুস সুন্নতের নামায পড়তে হয়। তার নিয়ত হল :

"নাওয়াইতো আন উস্বাল্লিয়া লিল্লাহে তাআলা রাকআতায় সালাতিল ওয়াক্তিস সুন্নাতে, সুন্নাতে রাসুলিল্লাহে তাআলা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতিশ শরিফাতে—আল্লাহো আকবার।

এবার দুরাকাত নফল : নিয়ত সাধারণ নফল সালাতের অনুরূপ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সালাতুত তারাবীহ্ বা তারাবীহ্‌র সালাত

তারাবীহে্র সালাত বা নামায কি ?

যে সন্ধ্যায় রমজান মাসের চাঁদ দেখা যায় ঐ রাত থেকে এশার সালাতের পর, কিন্তু বেতের সালাতের আগে দুরাকাআত করেকুড়ি রাকাত সুন্নত সালাত পড়তে হয়। এই সালাতকে তারাবীহ্‌র সালাত যা নামায বলা হয়। অর্থাৎ

যেদিন থেকে রমজানের রোজা রাখা হয় ঠিক তার পূর্বরাত্রি থেকেই এই সালাত আদায় করতে হয়। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সকল সমর্থ নারী পুরুষকে এই সালাত আদায় করার জন্য জোরের সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছেন। এই সালাত পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্। এই সালাত জামাআত করে পড়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে কেউ বাড়ীতে একাকী আদায় করলে কোন অপরাধ হবে না। কিন্তু কোন এলাকায় তারাবীহ্‌র জামাআতের আয়োজন না করে সকলেই নিজ ঘরে একাকী সালাত আদায় করে আর মহল্লাহর কাছে দায়ী হবেন।

তারাবীহ্‌র সালাত বা নামায আদায়ের / পড়ার নিয়ম কি ?

তারবীহ্‌র সালাত জামাআতে বা একাকী পড়া যায়। জামাআতে পড়লে অন্য ফরজ সালাতের মত ইমাম প্রত্যেক রাকাআতে সুরা ফাতেহা ও কেরাত পড়বেন এবং মোকতাদীগণ চুপচাপ শুনবেন ও ইমামের সঙ্গে রুকু সেজদা করবেন। প্রত্যেক সময় দুরাকাআতের নিয়ত করে দুরাকাআতের পর বসে আত্তাহিয়াতো ও দরুদ পড়ে সালাম বলে নামায শেষ করতে হবে। প্রতি চার রাকাআতের পর একটু বিশ্রাম করার জন্য অল্পক্ষণ বসতে হয় আর এই সময় তারাবীহ্‌র সালাতের নির্দিষ্ট দোওয়া পড়তে হয়। এই দোওয়া ইমাম সহ সকলেই একবার বা তিন বার পড়বেন। তারাবীহ্‌র জন্য হাফেজ ইমাম নিযুক্ত করে সমগ্র কোরআন শরীফকে ভাগ করে ৩০ দিনে বা নির্দিষ্ট দিনে পড়া সুন্নত। আর হাফেজ না হলে প্রত্যেক রাকাআতে সুরা ফাতেহার পর অন্য একটি সুরা মিলিয়ে পড়তে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথম রাকাআতে সুরা ফাতেহার পর আলামতারা (সুরা ফিল) থেকে শুরু করে কুল আউজো-বেরাব্বিন নাস (সুরা নাস) পর্যন্ত পড়ে আবার একই ভাবে পরবর্তী দশ রাকাআত পুর্বের মত পড়ে তারাবীহ্ শেষ করা যায়। এইভাবে দু দু রাকাআত করে কুড়ি রাকাআত তারাবীহর সালাত পড়ে রমজান মাসে বেত্বেরের ওয়াজেব সালাতও জামাআতে পড়তে হয়। কেউ একাকী তারাবীহ্ আদায় করলেও অন্য ফরজ সালাতের মত উচ্চ স্বরে আদায় করবেন। মহিলাগণ একাকী আদায়ের সময় একই নিয়মে নিঃশব্দে আদায় করবেন। প্রতি চার রাকাআতের পর মোনাজাত করা যায়। মনে রাখতে হবে

মোনাজাতের সঙ্গে কোন সালাতেরই কোন সম্পর্ক নেই। তবে যেহেতু সালাত আল্লাহ্‌র সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবাদাত সেহেতু ধরে নেওয়া হয় যে সালাতের পরের প্রার্থনা বা মোনাজাত আল্লাহ মঞ্জুর করে থাকেন, কিন্তু কোন ভাবেই সালাতের পর মোনাজাত বাধ্যতামূলক নয়।

তারাবীহ্‌র সালাতের বা নামাযের নিয়ত কি?

তারাবীহ্‌র সালাতের নিয়ত হল :—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ

سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

(নাওয়াইতো আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তাআলা রাকআতায় সালাতিত্ তারাবীহে সুন্নাতো রাসুলিল্লাহে তাআলা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতিশ শারীফাতে—আল্লাহো আকবার)।

বাংলা : আমি মহান আল্লাহর জন্য কাআবা শরীফের দিকে মুখ করে তারাবীহের দুরাকাআত সুন্নত সালাত আদায়ের নিয়ত করছি—আল্লাহো আকবার।

তারাবীহ্‌র পৃথক দোওয়া কি ও দোওয়াটি কখন পড়তে হয়?

প্রত্যেক চার রাকাআত নামায শেষে বসে একবার বা তিনবার পড়তে হয়। তারাবীহর নামাযের দোওয়া হল :

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ

وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ *

(সোবহানা যিল মুলকে ওয়াল মালাকুতে সোবহানা যিল ইজ্জাতে ওয়াল

আজমাতে ওয়াল হায়বাতে ওয়াল কুদরাতে ওয়াল কিবরিয়ায়ে ওয়াল জাবুরাতে, সোবহানাল মালেকিল হাইয়িল লাযি লা ইয়ানামো ওয়ালা ইয়ামুতো আবাদান আবাদা, সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বোনা ওয়া রাব্বুল মালায়েকাতে ওয়াররূহ।)

বাংলা : আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু পবিত্র। সম্ভ্রম, মহত্ত্ব, ভীতি ক্ষমতা, গৌরব ও প্রতাপের মালিক পবিত্র। সদা জীবিত প্রভু যিনি কখনও নিদ্রা যান না আর কখন তিনি মৃত্যু বরণ করবেন না-- তিনি পবিত্র। আমাদের আর ফেরেশতাদের ও জিব্রাইল (আঃ)-এর প্রভু অতি পবিত্র ও সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ।

তারাবীহ্‌র সালাতের পর কিরূপ মোনাজাত করতে হয়?

তারাবীহ্‌র সালাতের জন্য বিশেষ মোনাজাত হল :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ

الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ

يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ٭

(আল্লাহুম্মা ইন্না নাস আলোকাল জান্নাতা ওয়া নাউজোবেকা মেনান নারে ইয়া খালেকাল জান্নাতে ওয়ান নারে বে রাহমাতেকা ইয়া আজীজো, ইয়া গাফ্‌ফারো, ইয়া কারীমো, ইয়া সাত্তারো, ইয়া রাহীমো, ইয়া জাব্বারো, ইয়া খালেকো, ইয়া বাররো, আল্লাহুম্মা আজের না মিনান নারে ইয়া মুজীরো, ইয়া মুজীরো, ইয়া মুজীরো বেরাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন।)

বাংলা : হে আল্লাহ্, আমরা তোমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করছি আর জাহান্নাম থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টি কর্তা! হে সর্বজয়ী, হে পরম ক্ষমাশীল, হে মহান দয়ালু হে বৃহৎ দোষ আচ্ছাদনকারী, হে কৃপাময়, হে মহান শক্তিধর, হে মহান সৃষ্টিকর্তা,

হে উপকারী, হে ত্রাণকর্তা, হে রক্ষাকারী, হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু তোমারই করুণা তোমারই অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কোরআনের কয়েকটি সুরা

কমপক্ষে পবিত্র কোরআনের ক'টি সুরা হলে সকল প্রকার নামায আদায় করা সম্ভব।

পাঁচওয়াক্ত নামায সহ দুই ঈদ, জুমআ ও তারাবীহ্‌র নামাযের জন্য কম পক্ষে দশটি সুরা প্রয়োজন। যাঁরা কোরআন শরিফ পড়তে পারেন তাঁরা যে কোন জায়গা থেকে তিন আয়াত পরিমাণ কোরআনের আয়াত মুখস্থ করে পড়তে পারবেন। কিন্তু যাঁরা কোরআন শরিফ পড়তে পারেন না তাদের জন্য এই দশটি সুরা মুখস্থ করে নেওয়া প্রয়োজন এবং সুরাগুলি থেকে যে কোন নামাযে যে কোন সুরা পড়া যাবে। তবে প্রথম রাকাআতের দ্বিতীয় রাকাআতে অপেক্ষাকৃত ছোট সুরা পড়তে হয়। পর পর দশটি সুরার উল্লেখ করা হল। যথা :—

১। সুরা ফাতেহা

এই সুরাকে সাধারণ ভাবে সুরা আলহামদো বা আলহামদোর সুরাও বলে। কিন্তু আসলে এই সুরার নাম হল—সুরা ফাতেহা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۵ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

উচ্চারণ : "বিসমিল্লাহ্ হির রাহমা নির রাহিম"। আলহামদো লিল্লাহে রাব্বিল আ-লামিন, আর রাহ্‌মানির রাহিমে, মালেকে ইয়াওমিদ্দীন

ইয়্যাকা নাআবোদো ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তায়ীন। এহ্‌দেনাস্‌ সেরাত্বাল মোসতাকীম, সেরাত্বাল লাজিনা আন্‌আমতা আলায়হিম, গায়রীল মাগদুবে আলায়হিম ওয়ালাদ দোয়াল্লিন। (আমিন)

অর্থ ঃ "দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে"। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌-তায়ালার জন্য (যিনি) সমস্ত জগতের প্রতিপালক, দাতা ও দয়ালু এবং বিচার দিনের কর্তা। আমরা কেবল তোমারই উপাসনা (এবাদাত) করি। আমাদের সরল পথ দেখাও ; তাঁদের পথ, যাঁদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ ; তাদের পথ নয়---যারা তোমার অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট। (আমিন—হে আল্লাহ্‌! কবুল কর।)

২। সুরা ফীল

এই সুরাকে সাধারণভাবে 'আলামতারা সুরা' বলা হয়। কিন্তু এটি এর নাম নয়। এর প্রকৃত নাম সুরা ফীল।

سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ

كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝

উচ্চারণ ঃ "বিসমিল্লাহ হির রাহমা নির রাহিম"। আলামতারা কায়ফা ফাআলা রাব্বোকা বে আস্‌হা বিল্‌ ফীল্‌। আলাম ইয়াজআল কায়দাহুম ফি তাদ্‌লিলেও, ওয়া আরসালা আলায়হিন্‌ তায়রান্‌ আবা-বিল্‌। তারমীহিম্‌ বেহেজারাতিম মিন্‌ সিজ্জিলিন্‌ ফাজাআলাহুম্‌ কায়াস ফিম্‌ মা'কুল।

অর্থ ঃ "দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে"। তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর প্রতি কী করেছিলেন ? তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি ? ওদের বিরুদ্ধে, তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান। যারা ওদের উপর কাঁকর নিক্ষেপ করে। তারপর তিনি তাদের ভক্ষিত তৃণের মত করে তোলেন।

৩। সুরা কোরায়েশ

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعُ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا
رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

উচ্চারণ ঃ "বিসমিল্লাহির রাহমা নির রাহিম"। লেইলা-ফে কোরায়শিন্, ইলা ফেহিম্ রেহলাতাশ শেতায়ে ওয়াস্ স্বায়ফে, ফালইআ'বোদু রাব্বা হা-যাল বায়তেল্লাযি আত্বআমাহুম্ মেন জুএও, ওয়া আমানাহুম্ মিন খাওফ।

অর্থ ঃ "দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে"। যেহেতু কোরায়েশের আসক্তি আছে। আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের। ওরা এবাদত করুক এই গৃহের রক্ষকের,[১] যিনি ওদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে ওদেরকে নিরাপদ করেছেন।

৪। সুরা মাউন

سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعُ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَ
لَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

উচ্চারণ ঃ "বিসমিল্লাহির রাহমা নির রাহিম"। আরা আয় তাল্লাজি ইউকাজ্জেবো বিদ্দীন। ফাজালেকাল্লাজি ইয়াদ'উল ইয়াতিমা, ওয়ালা ইয়াহোদ্দো আলা ত্বায়ামিল মিসকীন, ফাওয়ায়লুল্লিল মোস্বাল্লিনাল লাজিনা

১. এখানে 'রাব্বা' শব্দটি রক্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

হুম আন স্বালাতেহিম সাহুন। আল্ লাজিনা হুম ইওরা-উনা ওয়া ইয়াম-নাউনাল মাউন।

অর্থ : "দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে"। তুমি কি তাকে দেখেছ যে দ্বীনকে[১] প্রত্যাখ্যান করে? সে তো সেই যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। এবং সে অভাবগ্রস্থকে অন্নদানে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং দুর্ভোগ সেই সমস্ত সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন। যারা ওটা[২] করে লোক দেখানোর জন্য এবং গৃহস্থালীর[৩] প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।

৫। সুরা কাওসার

"বিসমিল্লাহ হির রাহমা নির রাহিম"

إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ○ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ○ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ○

উচ্চারণ : ইন্না আত্বায়না কালকাওসার। ফাস্বাল্লে লেরাব্বেকা ওয়ানহার, ইন্না শা-নেয়াকা হোয়াল আবতার।

অর্থ : "দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে"। আমি তোমাকে প্রচুর মঙ্গল[৪] দান করেছি। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর ও কোরবাণী কর। যে তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে সেই তো নির্বংশ।

---

১. দ্বীন অর্থ ধর্ম, ন্যায়বিচার ও কর্মফল।

২. ওটা অর্থ এখানে সালাত বা নামায।

৩. এখানে 'মাউন' শব্দের অর্থ গৃহস্থালী উল্লেখ করা হয়েছে তবে এই শব্দের অর্থ 'জাকাত' ও হয়।

৪. 'কাওসার' শব্দের অর্থ কিছুর আধিক্য, বিশেষ অর্থে মঙ্গলের প্রাচুর্য; জান্নাত বা বেহেশতের একটি বিশেষ প্রস্রবনকেও কাওসার বলা হয়।

৬। সূরা কাফেরুন

سُورَةُ الْكٰفِرُونَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّ آيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

উচ্চারণঃ "বিসমিল্লাহ হির রাহমা নির রাহিম"। কোল্ ইয়া আইওহাল কাফেরুনা, লা-আ বোদা মা তাআবোদুন. ওয়ালা আনতুম আ-বেদুনা মা আ'বোদ ওয়ালা আনা আ'বেদুম মা আবাদতুম, ওয়ালা আনতুম আ'বেদুনা মা আ'বোদ, লাকুম দীনোকুম ওয়ালে ইয়া দ্বীন।

অর্থঃ "দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে"। বল, হে সত্য প্রত্যাখ্যান-কারীগণ আমি তার এবাদত (উপাসনা) করি না যার এবাদত (উপাসনা) তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁর এবাদতকারী (উপাসনাকারী) নও যাঁর এবাদত (উপাসনা) আমি করি এবং আমি এবাদতকারী (উপাসনাকারী) হবোনা তার যার এবাদত (উপাসনা) তোমরা করে আসছ। এবং তোমরাও এবাদতকারী (উপাসনাকারী) হবে না তাঁর যাঁর এবাদত (উপাসনা) আমি করি। তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) তোমাদের, আমার দ্বীন (ধর্ম) আমার।

৭। সূরা নাসর

سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلٰثُ آيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

উচ্চারণঃ "বিসমিল্লাহ হির রাহমা নির রাহিম"। এযা জা-আ নাসরুল্লাহে ওয়াল্ফাৎহো। ওয়া-রায়তান্ নাসা ইয়াদখোলুনা ফী দ্বীনিল্লা-হে আফ-

ওয়াজান্। ফাসাব্বেহ্ বেহামদে রাব্বেকা ওয়াসতাগফেরহু। ইন্নাহু কানা তাওয়াবা।

অর্থ ঃ “দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে”। যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীন (ধর্ম) গ্রহণ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনা করো, তিনি তো ক্ষমাপরবশ।

৮। সুরা মাসাদ[১]

سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا

كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ

الْحَطَبِ ۝٤ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

উচ্চারণ ঃ “বিসমিল্লাহ হির রাহমা নির রাহিমা”। তাব্বাৎ ইয়াদা আবি লাহাবেঁও ওয়া তাব্বা, মা আগ্‌না আন্‌হো মা লোহু ওয়া মা কাসাবা। সাইয়্যাস্বলা নারান্ যাতা লাহাবেঁও ওয়ামরাতোহু, হাম্মা লাতাল হাত্বাবে ফী জীদেহা হাবলুম্ মিম মাসাদ।

অর্থ ঃ “দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে”। ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ও ধ্বংস হোক আবু লাহাব।[২] তার ধনসম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসে নি। সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে এবং তার স্ত্রীও—যে ইন্ধন (জ্বালানী কাঠ) বহন করে তার গলদেশে খর্জুর-বৃক্ষের আঁশের দৃঢ় রজ্জু নিয়ে।

---

১. এই সুরাকে সুরা ‘**লাহাব**’ ও বলা হয়।
২. এখানে ‘আবুলাহাব’ শব্দটি উহ্য আছে।

৯। সূরা এখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

"বিসমিল্লাহ হির রাহমা নির রাহিম"

উচ্চারণ ঃ কুল-হো আল্লাহো, আহাদ। আল্লা-হুস স্বামাদ। লাম ইয়্যালেদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কোফোয়ান আহাদ।

অর্থ ঃ "দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে"। বল, (হে মোহাম্মদ!) তিনি আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের নির্ভর। তিনি জনক নহেন এবং জাতকও নহেন। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

১০। সূরা ফালাক

"বিসমিল্লাহ হির রাহমা নির রাহিম"

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

উচ্চারণ ঃ কুল আউযো বেরাব্বিল ফালাকে। মিন্ শার্‌রে মা-খালাকা। ওয়া মিন্ শার্‌রে গাসেকীন এযা ওয়াকাবা। ওয়া মিন্ শার্‌রিন্ নাফ্‌ফাসাতে ফিল ওকাদে। ওয়া মিন্ শার্‌রে হাসেদিন্ এযা হাসাদা।

অর্থ ঃ "দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে"। বল, (হে মোহাম্মাদ!) আমি শরণ নিচ্ছি উষার স্রষ্টার। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাত্রির অনিষ্ট হতে, গিঁট-এ ফুঁ দিয়ে যাদু করে তেমন নারীদের অনিষ্ট হতে; হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট হতে।

১১। সুরা নাস

"বিসমিল্লাহ হির রাহমা নির রাহিম"

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٥﴾
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

উচ্চারণ ঃ কুল আউযো বেরাব্বিন্নাসে ; মালেকিন্নাসে ; এলাহিন্নাসে ; মিন্ শাররিল ওয়াস ওয়াসিল্ খান্নাস। আল্লাযি ইউওয়াস বেসো ফী স্বোদুরিন্নাসে মিনাল্ জিন্নাতে ওয়ান্নাস।

অর্থ ঃ "দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে"। বল, (হে মোহাম্মাদ !) আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের। মানুষের অধীশ্বরের, মানুষের প্রভুর। তার কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে যে সুযোগ মত আসে ও সরে পড়ে।[১] জ্বিন ও মানুষের মধ্য হতে যে মানুষের হৃদয়ে কুমন্ত্রণা দেয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বাওম বা রোযা ও এঅতেকাফ

রোযা কত প্রকার ও কি কি ?

রোজা তিন রকম। যথা (১) **ফরজ**—রমজানের সম্পূর্ণ মাসে রোযা রাখা। (২) **ওয়াজেব** নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট যে কোন প্রকারের মানত ও ও কাফ্ফারার রোযা। (৩) **নফল ঃ** কিছু কিছু রোযা পালন করলে সওয়াব হয় কিন্তু না করলে কোন গোনাহ বা ক্ষতি হয় না। যেমন মহরম

১. এখানে 'খান্নাস' শব্দের আভিধানিক অর্থ দেওয়া হল। আসলে 'শয়তান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাসের ৯, ১০ তারিখে আশুরার রোযা ; ঈদুল ফেতেরের পর সাওয়াল চাঁদে ছ'দিন রোযা ইত্যাদি। ফরজ ওয়াজেব ছাড়া যাবতীয় রোযাই নফল। **(৪) হারাম বা নিষিদ্ধ :** দুই ঈদের দিন ও ঈদুজ্জোহার পর তিন দিন রোযা রাখা হারাম। **(৫) মাকরূহ :** আশুরার দিন কেবল একটি রোযা রাখা মাকরূহ তানাযিহ্।

রোযা রাখার নিয়ম কি ?

রমজানের চাঁদ দেখা গেলে ঐ দিন এশার সময় তারাবিহ্‌র নামায পড়ে শেষ রাতে অর্থাৎ সোবহে সাদেকের সময় কালের পূর্বে সেহরী খেয়ে রোজার নিয়ত করতে হবে। সেহরী খাওয়া সুন্নত। খাবার ইচ্ছা না থাকলেও সামান্য কিছু আহার করা বিশেষ পুণ্যের কাজ।

রোযার নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا
لَّكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

(নাওয়াইতো আন আসুমা গাদাম মিন শাহরে রামাজানাল মোবারাকে ফারজাল্লাকা ইয়া আল্লাহো ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম।)

বাংলা : আগামীকাল পবিত্র রমজান মাসের ফরজ রোযা রাখার ইচ্ছা করলাম। হে আল্লাহ্ তুমি তা কবুল কর। অবশ্যই তুমি শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।

যদি কেউ সেহরী খাওয়ার পর নিয়ত না করে সকালে নিয়ত করেন তাহলে 'আসুমাগাদাম' শব্দের পরিবর্তে 'আসুমাল ইয়াওমা' বলতে হবে। রোযা ভঙ্গের কোন কারণ না ঘটিয়ে থাকলে দুপুরের মধ্যে ঐ দিনের রোযার নিয়ত করা যায়। দুপুরের পর নিয়ত করলে রোযা হবে না। আর কাজা, কাফ্‌ফারা, অনির্দিষ্ট মানতের রোযার নিয়ত সেহরী খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই করতে হবে। সকালে করলে শুদ্ধ হবে না। সেহরী খাওয়াকেও নিয়ত গণ্য

করা যায়। সোবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার থেকে বিরত থেকে সূর্যাস্ত গেলে নিয়ত করে এফতার করতে হবে।

এফত্বারের নিয়ত ঃ

اللهم صمت لك وتوكلت على رزقك وافطرت برحمتك يا ارحم الراحمين *

(আল্লাহুম্মা লাকা সুমতো লাকা ওয়া তাওয়াক্কালতো আ'লা রেযকেকা ওয়া আফত্বারতো বে রাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন)

বাংলা ঃ হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছিলাম আর তোমার প্রদত্ত আহার্য সামগ্রী দিয়ে এফ্তার করছি।

রোযা ভঙ্গের কারণ কি ও কি কি অবস্থায় কাযা ও কাফ্ফারা দুইই প্রযোজ্য হয় ?

কতকগুলি কারণে রোযা ভাঙ্গলে রোযার কাজা আদায় করতে হবে এবং কাফ্ফারাও দিতে হবে। কাজা বলতে এক রোযার পরিবর্তে একদিন রোযা রাখা বোঝায় আর কাফ্ফারা বলতে এক রোযার পরিবর্তে ক্রমাগত দুমাস রোযা রাখা এবং রোযা রাখতে অক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক রোযার জন্য ৬০ জন দরিদ্রকে দুবেলা পেট ভরে খাওয়ান বুঝায়। (১) যদি কেউ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে রমজান মাসে আহার করে রোযা নষ্ট করে। (২) যদি কেউ সেচ্ছায় সঙ্গম করে এই উভয় ক্ষেত্রেই রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং তার কাযা ও কাফ্ফারা দুই আদায় করতে হবে। এছাড়া নিম্ন কারণে রোযা নষ্ট হলে শুধু কাজা আদায় করলে চলবে।

কি কি কারণে রোযা নষ্ট হলে কাফ্ফারা দিতে হয় না কেবল কাযা আদায় করলে চলে ?

(১) কুল্লি করার সময় হঠাৎ পেটের ভিতর পানি প্রবেশ করলে। (২) জোর পূর্বক কেউ কিছু পানাহার করালে। (৩) পায়খানা বা প্রস্রাব দ্বারে ঔষধ প্রয়োগ করলে। (৪) নাকে, কানে বা মস্তিষ্ক ও উদরের ক্ষতস্থানে

ওষুধ দিলে তা যদি পেটে যায় কিংবা মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। (৫) মাটি, পাথর, কাঠ বা এই ধরনের কিছু গিলে ফেললে। (৬) মুখ ভরে বমি হলে। (৭) সোবহে সাদেকের পর সেহরী খেলে বা সূর্যাস্তের পূর্বেই ভুল করে এফতার করলে। (৮) ভুলবশতঃ পানাহারে রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে রোযা ভেঙ্গে ফেললে। (৯) চুম্বন ও স্পর্শ ইত্যাদি দ্বারা বীর্যপাত ঘটলে। (১০) মুখে লেগে থাকা ছোলার পরিমাণ খাদ্যবস্তু খেয়ে ফেললে। রোযার নিয়ত না করার জন্য আহার করলে। (১১) পান খেয়ে মুখে পান থাকা অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে।

কি কি কারণে রোযা মাকরূহ হয়?

বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রধান প্রধান কারণগুলি দেওয়া হল। যথা: (১) বিনা প্রয়োজনে কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করলে কিংবা চিবিয়ে ফেললে। (২) রোযা রেখে নির্বাক ও নিশ্চুপ হয়ে বসে বা শুয়ে থাকলে (রোযাতে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও সৎ আলোচনা দরকার)। (৩) অকারণে ওজু ছাড়া অন্য সময় কুল্লি করলে ও নাকে পানি দিলে। (৪) মাজন দ্বারা দাঁত মাজলে (৫) পানিতে নেমে পানির মধ্যে কাজকর্ম করলে। (৬) স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা রাখা। (৭) দিন রাত্রি অনাহারে থেকে রোযা রাখা। (৮) সারা বছর রোযা রাখা।

কি কি কারণে রোযা না রাখা অনুমোদিত?

নিম্ন অবস্থায় রোযা না রাখা অনুমোদিত তবে পরে তা কাজা রাখতে হবে। যথা: (১) ভ্রমণকারী হলে কিন্তু যদি সম্ভব হয় রোযা রাখা উত্তম। (২) পীড়িত বা অসুস্থ হলে, যদি এমন হয় যে রোযাই অসুস্থতা আরও বৃদ্ধির কারণ হবে। (৩) একান্ত বার্ধক্য পীড়িত হলে। (৪) নারীর গর্ভাবস্থায় ও শিশুকে দুগ্ধ পান করানোর সময়কালে বিশেষতঃ যদি গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে বা গর্ভের শিশুর ক্ষতির আশংকা থাকে। (৫) যদি ক্ষুধা বা তৃষ্ণা মৃত্যু ঘটার কারণ হয়। (৬) মহিলাদের মাসিক ঋতু স্রাবের সময়। (৭) অন্য কেউ রোযা না রাখতে বাধ্য করলে।

কি কি কাজের দ্বারা রোযা ভঙ্গ বা নষ্ট হয় না?

নিম্নলিখিত কাজগুলিতে রোযা নষ্ট হয় না। যথা: (১) রোযা অবস্থায়

ভুলে পানাহার করে ফেললে। (২) তেল মাখলে। (৩) সুরমা লাগালে। (৪) অন্যের দোষত্রুটি আলোচনা করলে। (৫) অল্প বমি করলে। (৬) কানে পানি দিলে। (৭) ধূলা, ধোঁয়া কিংবা মাছি গলায় গেলে। (৮) পুকুরে বা পানিতে ডুব দেওয়ার সময় কানে কি গলায় পানি গেলে। (৯) কান চুলকালে বা খৈল বের করলে, এই সকল অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন। কিন্তু হুকার কিংবা অন্য কোন ধোঁয়া ইচ্ছাকৃত ভাবে গলাধঃকরণ করলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়।

কোন্ কোন্ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ বা হারাম?

ঈদুল ফিৎরের দিন এবং ঈদুল আজহা ও তার পরের তিনদিন—মোট এই পাঁচদিন রোযা রাখা হারাম বা নিষিদ্ধ।

রোযার শর্ত কি?

রোযার শর্তাবলী তিন রকম। (১) **রোযা শুদ্ধ হওয়া শর্ত ঃ** অর্থাৎ রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য রোযা পালনকারী ব্যক্তিকে নিয়ত সহ রোযা রাখতে হয়। নিয়ত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে অভ্যাস বশতঃ উপবাস করছেন না বরং এবাদাতের জন্য উপবাস বা রোযা করছেন। (২) **রোযা ওয়াজেব হওয়া শর্ত ঃ** অর্থাৎ (ক) রোযাদারকে মুসলমান হতে হবে। (খ) সাবালক বা পূর্ণ বয়স্ক হতে হবে। (গ) জ্ঞানবান হতে হবে। সুতরাং অমুসলমান, নাবালক ও উন্মাদের জন্য রোযা নয়। (৩) **রোযা রাখা ওয়াজেব হওয়ার শর্ত ঃ** অর্থাৎ (ক) শারীরিক সুস্থ হওয়া। (খ) ভ্রমণকারী না হওয়া।

এঅতেকাফ (মসজিদে নির্জনতা অবলম্বন)

এঅতেকাফ বলতে কি বোঝায়?

এঅতেকাফ বলতে নিজেকে মসজিদের নির্জনতায় আবদ্ধ রেখে আল্লাহ্-কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আরাধনাকে বোঝায়। এমন মসজিদে এই নির্জনতা অবলম্বন করতে হবে যেখানে জামাআতে নামায হয়। রমজান মাসের শেষ দশদিন এঅতেকাফ করার সময়। এঅতেকাফ করা সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ। সর্বনিম্ন একদিন ও এক রাত হল এঅতেকাফের সময়। বেশী সময় এঅতেকাফ করা নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এঅতেকাফ দিনে করলে রাত্রেও করা

বাধ্যতামূলক। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) রমজানের শেষ দশদিন এইভাবে মসজিদে ধ্যানস্থ থাকতেন। মহিলাগণ নিজ বাসগৃহেই এঅতেকাফ করবেন অর্থাৎ নির্জনতায় ধ্যানস্থ থাকবেন। মসজিদে সর্বক্ষণ এবাদাত বন্দেগী ও কোরআন শরীফ, দরূদ শরীফ, তসবীহ তেলাওয়াত, জেকের আজকার ও নফল নামাযের মধ্যে নিমগ্ন থাকতে হয়। পার্থিব সকল প্রকার মায়া মমতা ত্যাগ করে এঅতেকাফের সংকল্প নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে ধ্যানস্থ থাকাই হল এঅতেকাফ।

এঅতেকাফের সময় প্রস্রাব, পায়খানা, ওজু গোসল ইত্যাদি জরুরী কাজ ছাড়া মসজিদের বাইরে বের হওয়া নিষেধ। রোযা ছাড়া এঅতেকাফ হতে পারে না। এঅতেকাফের সময় মসজিদে আহার ও শয়ন করা অনুমোদিত। এঅতেকাফ তিন রকম। যথা: (১) মানত করে এঅতেকাফ করা ওয়াজেব। (২) রমজানের শেষ দশদিন এঅতেকাফ করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। (৩) ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় এতেকাফ করা মুস্তাহাব।

কয়েকটি কাজের দ্বারা এঅতেকাফ নষ্ট হয়ে যায়। যথা: (১) ভ্রান্তিবশতঃ মসজিদ থেকে বেরিয়ে চলে এলে। (১) এঅতেকাফের সময় কোন রকম যৌন ক্রিয়া করলে। (৩) প্রাকৃতিক প্রয়োজনের জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে এসে বাড়ীতে অধিক সময় অবস্থান করলে। (৪) অসুস্থ বা ভয়ে মসজিদ ছেড়ে চলে এলে। এই সকল কাজ করলেই এঅতেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সালাতুল ঈদাইন বা দুই ঈদের নামায

দুই ঈদের নাম কি ?

বিশ্ব মুসলমানের পালনীয় সবকিছুই চান্দ্র মাস ও চান্দ্র-বছর অনুযায়ী হয়ে থাকে। প্রতি চান্দ্র বছরে মুসলমানকে দুবার দুরাকাআত করে ওয়াজেব সালাত আদায় করতে হয়। এই দুই ওয়াজেব সালাতের দিনকে দুই ঈদের

দিন বলা হয়। প্রথমটি হয় রমজান মাসের রোযার পর সাওয়ালের চাঁদের প্রথম তারিখে—এটির নাম ঈদুল ফেত্বর। আর দ্বিতীয়বার আরবী যিল-হজ মাসের ১০ তারিখে যে ঈদের সালাত হয় সেই ঈদের নাম হল ঈদুল আজহা।

ঈদুল-ফেত্বরের তাৎপর্য কি?

রমজান মাসের চাঁদ ওঠার দিন থেকে সম্পূর্ণ রমজান মাসে সিয়াম বা রোযা পালন করা প্রত্যেক বয়স্ক ও সমর্থ মুসলসানদের জন্য ফরজ। এই সিয়াম বা রোযা পালনের পর সাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ঈদুল-ফেত্বর অনুষ্ঠান। দীর্ঘ এক মাসের কৃচ্ছ্র সাধনার ও জীবনের বহু স্বাভাবিক নিয়মের ক্ষেত্রে অপরিসীম সংযম অভ্যাসের পর পুনরায় জগৎ সংসারের স্বাভাবিক নিয়মে ফিরে আসার জন্য একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর স্বরূপ দুরাকাআত ওয়াজেব সালাত বাধ্যতামূলক। তেমনি আবার কৃচ্ছ্র সাধনা ও সংযমের পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য সমগ্র মুসলিম জাহান এক শুচি সুন্দর অনাবিল আনন্দে ও খুশীর জোয়ারে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। তাই এই দিনের নাম ঈদ। ঈদ আরবী শব্দ এর অর্থ খুশী। একমাসের তিতিক্ষা সংযম ও সাধনার পর স্বাভাবিক জীবন শুরু করার জন্য ইসলামের মহান সংস্কারক হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যে সকল নীতি ও সামাজিক আচার প্রবর্তন করেছেন তার সবগুলোই তৃপ্তি ও সামাজিক আনন্দের উপকরণে ভরপুর। এই দিনে যাতে দুঃস্থ আতুর কেউ এই মুসলিম জাতীয় আনন্দ উৎসব থেকে বঞ্চিত না থাকেন তার জন্যও প্রবর্তন করেছেন বাধ্যতামূলক নির্দিষ্ট হারে দানের প্রথা। তাকে বলা হয় ফেত্বরা। এই ফেত্বরা তথা নির্দিষ্ট হারে বাধ্যতামূলক দানের দ্বারা দুঃস্থ গরীব আতুর জনও সমৃদ্ধ হয়ে এই জাতীয় আনন্দউৎসবে যোগ দিতে পারবে এটাই ফেত্বরার সামাজিক তাৎপর্য। এজন্য এই ঈদকে 'ঈদুল-ফেত্বর' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ঈদুল-আজহার তাৎপর্য কি?

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর আগে আল্লাহ্‌র নবী হযরত

ইব্রাহিম (আঃ) স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে আল্লাহ্‌র আদেশে ১০ই যিলহজ্জ তারিখে নিজ পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে কোরবানী দেওয়ার আয়োজন করেছিলেন। তাঁর সেই আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের এবং আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও ভক্তির নিদর্শনের পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন। চোখ বেঁধে ছেলেকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোরবানী করে চোখ খুলে দেখলেন ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে আর বিনিময়ে কোরবানী হয়েছে এক দোম্বা জাতীয় জানোয়ার। খুশীতে আর কৃতজ্ঞতায় তার অন্তর ভরে গেল এ যেন আল্লাহ্‌র অলৌকিক অবদানে। তাঁরই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তুরাকাআত ওয়াজেব নামায প্রচলিত হয়ে আসছে সেই কোন আবহমান কাল থেকে। আর ত্যাগ আত্মোৎসর্গ ও নিষ্ঠার পুরস্কারের আনন্দে এই দিনটিকেও ঈদ বা খুশীর দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যেহেতু এই দিনে উজহিয়া বা কোরবানী দিতে বলা হয় তাই এই ঈদকে ঈতুল-আজহা বা কোরবানীর ঈদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর ত্যাগ ভক্তি ও আত্মোৎসর্গের স্মৃতিকে চিরভাস্বর করে নিজের মধ্যে ঐ আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্মে এই দিন কোরবানী দেওয়ার প্রথার প্রচলন করা হয়েছে। একদিকে ত্যাগের সাফল্য অন্যদিকে ত্যাগের পুরস্কার প্রাপ্তির আনন্দই ঈতুল-আজহার বৈশিষ্ট্য।

ঈদের সালাত বা নামায আদায় করা কি ?

১. ঈতুল-ফেত্বর ও ঈতুল-আজহার তুরাকাআত করে সালাত জামায়াতে আদায় করা ওয়াজেব।

২. ঈদের সালাতের জন্য খোত্ববা পড়া সুন্নত এবং তা শোনা ওয়াজেব।

কিভাবে ঈদের সালাত বা নামায আদায় করতে হয় ?

ঈদের দিন সকালে সূর্যোদয়ের পর থেকে দিনের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে এই নামায পড়তে হয়। এই নামায ময়দানে বা ঈদগাহে সমবেত হয়ে আদায় করা উত্তম। তবে মসজিদেও এই নামায আদায় করা যায়। এবার প্রথমে তুরাকাআত ওয়াজেব নামাযের নিয়ত এইভাবে করতে হবে।

ঈদুল ফেত্বর নামাযের নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۞

নাওয়াইতো আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তাআলা রাকাআতায় সালাতে ঈদুল-ফেত্বর মাআ সেত্তাতে তাকবিরাতে ওয়াজেবিল্লাহে তাআলা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতিশ শারিফাতে আল্লাহো আকবার।

বাংলায় ঃ আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কাআবা শরীফের দিকে মুখ করে ছয় তাকবিরের সঙ্গে এই ইমামের অনুসরণে দু'রাকাআত ঈদুল ফেত্বরের ওয়াজেব নামায পড়ার নিয়ত করছি—আল্লাহো আকবার।

ঈদুল আজহার নামাযের নিয়ত ঃ

নিয়ত ঈদুল ফেত্বরের নামাযের মতই শুধুমাত্র 'ঈদুল ফেত্বর' শব্দের পরিবর্তে 'ঈদুল আজহা' শব্দ বলতে হবে।

২. নিয়তের পর ইমামকে সশব্দে আল্লাহো আকবার বলে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে অন্য নামাযের মতই তাহরিমা বেঁধে মনে মনে 'সানা' পড়তে হবে।

৩. সানা পড়ার পর ইমাম তিন বার 'আল্লাহো আকবার' বলে হাত উঠাবেন। তাকবির বলে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে আগের মত তাহরিমা না বেঁধে প্রত্যেক বারেই হাত সোজা দুপাশে নামিয়ে দিতে হবে। মোক্তাদিগণও নীরবে তাকবির বলে একই ভাবে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে সোজা দুপাশে নামিয়ে দেবেন।

৪. তৃতীয় তাকবির বলার পর যথারীতি অন্য নামাযের মতই তাহরিমা বেঁধে দাঁড়াতে হবে। ইমাম এবার আউজোবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ পড়ে কেরাত পড়বেন—(সূরা ফাতেহা ও তার সঙ্গে কোরআনের আয়াত)।

৫. কেরাত পড়া শেষ করে অন্য নামাযের নিয়ম মতই রুকু সেজদা করে প্রথম রাকাআত শেষ করতে হবে।

৬. প্রথম রাকাআত শেষ করে ইমাম দাঁড়িয়ে যথারীতি দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য সূরা ফাতেহা ও কোরআনের আয়াত পড়বেন। এই কেরাত শেষ করে ইমাম 'আল্লাহো আকবার' বলে রুকুতে না গিয়ে কান পর্যন্ত হাত ওঠাবেন ও তাহরিমা না বেঁধে হাত সোজা দুপাশে নামিয়ে দেবেন। ইমাম এইভাবে তিনবার তাকবির বলবেন ও হাত সোজা নামাবেন। মোক্তাদিগণও তাই করবেন। এবার চতুর্থবার ইমাম আল্লাহো আকবার বলে হাত না উঠিয়ে রুকুতে যাবেন এবং এই রাকাআতের অবশিষ্ট নামায অন্য নামাযের মত শেষ করবেন। মোক্তাদিগণও ইমামের অনুসরণে একই ভাবে নামায শেষ করবেন।

৭. নামায শেষ করে ইমাম সাহেব দুটি খোত্বা পড়বেন। সকলকেই নীরবে কোন কথাবার্তা না বলে চুপচাপ নিজের জায়গায় বসে এই খোত্বা শুনতে হবে। খোত্বা শোনা ওয়াজেব।

ঈদের নামাযের জন্য কি কি কাজ সুন্নত?

ঈদের দিন নিম্নলিখিত কাজগুলি সুন্নত। যথা: (১) গোসল করা, মেসওয়াক করা বা দাঁত মাজা। (২) যথাসম্ভব ভাল পোষাকে সজ্জিত হওয়া। (৩) সুগন্ধি ব্যবহার করা। (৪) ঈদুল ফেত্বরের নামাযের জন্য ঈদগাহে যাওয়ার আগে খেজুর বা মিষ্টি খাওয়া। (৫) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া। (৬) এক রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া ও অন্য রাস্তায় আসা। (৭) ঈদের নামাযের আগে ফেত্বরা প্রদান করা। (৮) ঈদগাহে যাওয়ার সময় তাকবিরে তাশরিক পড়া।

ঈদুল-আজহার জন্য অতিরিক্ত করণীয়গুলি কি কি?

যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে সূর্যোদয় থেকে দুপুরের আগে পর্যন্ত এই নামাযের সময়। কোন কারণে ঐ দিন নামায পড়া সম্ভব হলে ১১ই বা ১২ই যিলহজ্জ দুপুরের আগে পড়তে পারা যায়। ঈদুল ফেত্বর ও ঈদুল আজহার সুন্নত কাজগুলি একই। ঈদুল আজহার দিন তাকবিরে তাশরিক

সশব্দে পড়তে পড়তে ঈদগাহে যেতে হয়। ঈদুল আজহার নামাযের আগের দিন ফজরের নামায থেকে (অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ ফজর থেকে) ১৩ই যিলহজ্জ আস্বর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর তাশরিক সশব্দে পড়তে হয়। ঈদের নামাযের পূর্বে কিছু আহার না করে কোরবানীর মাংস দ্বারা আহার আরম্ভ করা মোস্তাহাব।

ফেত্বরা কি ও কাকে বলে এবং কার দেয় ?

রমযানের রোযায় যে সকল ভুলত্রুটি হয় তার সংশোধন এবং নিঃস্ব ও দরিদ্র জনগণ যাতে ঈদের খুশীতে সমভাবে অংশ নিতে পারে তার জন্য তাঁদের কে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান বাধ্যতামূলক অর্থাৎ ওয়াজেব। যাঁরা আহলে নেসাব অর্থাৎ সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা বা সাড়ে সাত তোলা সোনা বা তার মূল্যের পরিমাণ অর্থ সম্পদের মালিক তাঁদের জন্য ফেত্বরা আদায় দেওয়া ওয়াজেব। আহলে নেসাব ব্যক্তিগণকে তাঁদের অধীন সকলের জন্য ফেত্বরা আদায় করতে হবে। ফেত্বরার পরিমাণ হল দুসের (কে. জি.) গম অথবা দেশের প্রধান খাদ্য বা তার সমপরিমাণ মূল্য মাথা পিছু হারে দেয়। ফেত্বরা গরীব, অভাবী আতুর ও অনাথদের প্রাপ্য। একজনের ফেত্বরা একজনকে দেওয়া উত্তম তবে একাধিক লোককেও দেওয়া চলে।

কোরবানী কাদের উপর ওয়াজেব এবং কোরবানীর মাংস কি করতে হবে ?

যাঁদের উপর ফেত্বরা ওয়াজেব এবং যাঁরা আহলে নেসাব তাঁদের উপর কোরবানীও ওয়াজেব। ১০ই যিলহজ্জ ঈদুল আজহার নামাযের পর থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোরবানী করা বৈধ। কোরবানী কেবলমাত্র নিজের জন্য ওয়াজেব। পরিবারের অধীন সদস্য, সন্তান সন্ততির পক্ষ থেকে কোরবানী করা ওয়াজেব নয়। কোন নাবালক সন্তান সন্ততির নামে কোরবানী করলে তা নফল কোরবানী হবে।

কোরবানীর মাংস দীন দরিদ্র পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধুদের বণ্টন করতে হবে এবং নিজে ও পরিবারবর্গ তা আহার করবেন। মোট মাংসকে তিনভাগ করে একভাগ দীন দরিদ্রদের, একভাগ আত্মীয় প্রতিবেশী ও

পরিজনকে বিতরণ করতে হবে এবং অবশিষ্ট একভাগ নিজের ও নিজের পরিবারের আহারের জন্য ব্যবহার করতে হবে। কোরবানীর প্রাণীর চামড়া দান করে দিতে হয় কিংবা বিক্রি করে ঐ অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে দান করে দিতে হয়।

কোরবানীর প্রাণী কিরূপ হবে?

কোরবানীর পশু সবল, সুস্থ, সুন্দর, সতেজ ও নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন। গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ছাড়া অন্য কোন প্রাণী কোরবানীর জন্য বৈধ নয়। গরু, মহিষ ও উট হলে সাত জনের নামে অর্থাৎ সাত জন যৌথ ভাবে এই প্রাণীগুলি কোরবানী দিতে পারেন। অন্যগুলি এক একজনের জন্য এক একটি কোরবানী দিতে হবে। কোরবানীর গরু ও মহিষের বয়স কম করে দুবছর, উটের বয়স পাঁচ বছর, ছাগল ভেড়া দুম্বার বয়স এক বছর হতে হয়। কোরবানীর প্রাণীর কোন অঙ্গের এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হলে সেই প্রাণী কোরবানীর অনুপযুক্ত গণ্য হবে।

তাকবিরে তাশরিক কি ও কখন পড়তে হয়?

তাকবিরে তাশরিক হল :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

৯ই যিলহজ্জ ফজরের ফরজ নামাযের পর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ আসরের ফরজ নামাযের পর পর্যন্ত কম পক্ষে এক বার করে প্রত্যেক ফরজ নামাযের জামাআতের পর পুরুষের জন্য সশব্দে ও স্ত্রী লোকের জন্য নীরবে পড়া ওয়াজেব। অবশ্য স্ত্রী লোকেদের জন্য পড়া ওয়াজেব নয় তবে পড়া কর্তব্য। মোসাফেরের জন্যও তাকবিরে তাশরিক ওয়াজেব নয়। ইমাম যদি বিস্মৃত হয়ে যান তাহলে মোক্তাদিগণ নামায শেষ করেই পড়া শুরু করে দেবেন, ইমামের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

ঈদের জামাআত আরম্ভ হওয়ার পর উপস্থিত হলে কি করতে হবে?

১. কেউ যদি প্রথম রাকাআতের তাকবির বলার পর উপস্থিত হন তাঁর

করণীয় হল ঃ (ক) যদি উপস্থিত ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হন যে তিনি নিয়ত করে তাকবির বলার পরও ইমামের সঙ্গে রুকুতে যোগ দিতে পারবেন তাহলে তাঁকে নিয়ত করে প্রথম রাকাআতের সবকটি তাকবির বলে জামাআতে দাঁড়াতে হবে ও তিনি যথারীতি ইমামের সঙ্গে রুকু সেজদা করে নামায শেষ করবেন। (খ) আর যদি উপস্থিত ব্যক্তি বোঝেন যে নিয়ত করে তাকবির বলতে গেলে ইমামের সঙ্গে রুকুতে যুক্ত হতে পারবেন না তাহলে শুধু নিয়ত করেই ইমামের সঙ্গে রুকুতে সামিল হবেন এবং রুকুর মধ্যে তসবিহ পড়ার বদলে তাকবির গুলি নীরবে বলে নেবেন কিন্তু হাত উঠাবেন না। যদি তাকবির শেষ করার আগে ইমাম রুকু শেষে উঠে পড়েন তাহলে ইমামেরই অনুকরণ করতে হবে, অবশিষ্ট তাকবির আর বলতে হবে না।

২. আর যদি কারো ঈদের নামাযের পুরো একটা রাকাআত ছেড়ে যায় তাহলে তাঁকে এই ভাবে তা আদায় করতে হবে :—

ইমাম সালাম বলে নামায শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে কেরাত পড়ে ও তাকবির বলে বাকী নামায সাধারণ নামাযের নিয়ম মতই শেষ করতে হবে।

কোরবানীর দোওয়া কি ?

কোরবানী দোওয়া হল :

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَاِلَيْكَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ
وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ
وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ - اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ
بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া এলাইকা, ইন্না স্বালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন। লা শারিকালাহু

ওয়া বেযালেকা উমেরতো ওয়া আনা আউয়ালুল মুসলেমিন। আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন ফোলানেব্‌নে ফোলানিন[১]। বিস মিল্লাহে আল্লাহো আকবার।

বাংলা : হে আল্লাহ্‌! আমরা তোমারই সৃষ্ট এবং তোমার কাছেই শেষ প্রত্যাবর্তন। অবশ্যই আমার নামায, কোরবানী, জীবন, মৃত্যু সবই তোমার জন্য। তোমার কোন শরীক নেই আর কোরবানী আমার উপর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, আর সর্বাগ্রে আমি মুসলমান। হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুকের[১] পক্ষ থেকে এই কোরবানীকে কবুল করে নিও। আমি তোমারই নামে কোরবানী করলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সালাতুল জানাযা বা জানাযার নামায

জানাযার নামায কি ও নামাযের পূর্ব শর্ত কি?

'জানাযা' অর্থ শব, মৃতদেহ বা মৃত ব্যক্তি। জানাযার নামায প্রকৃত অর্থে মৃতের জন্য প্রার্থনা বা দোওয়া। অন্যান্য নামাযের যা যা শর্ত জানাযার নামাযের শর্তও তাই। যে কোন মৃতের জানাযার নামায পড়া ফরজে কেফায়া। সমাজের কোন কোন লোক এই নামায আদায় করলে সকলের জন্যই তা আদায় হয়ে যায়। নিম্ন অবস্থায় জানাযার নামায পড়তে হয়। যথা: ১. মৃত ব্যক্তি মুসলমান হওয়া। ২. মৃতকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিয়ম মত গোসল দেওয়ান হওয়া। ৩. পরিষ্কার কাপড় দ্বারা শব-দেহ আচ্ছাদিত হওয়া অর্থাৎ কাফন পরান থাকা ৪. কাফন দ্বারা 'সতর' আবৃত থাকা। ৫. জানাযার নামাযের জন্য মৃতদেহকে ইমামের সামনে রাখা। যে কোন মুসলমান ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাঁকে অনুরূপভাবে সাজিয়ে তার আত্মার মঙ্গল কামনার জন্য তার সামনে দাঁড়িয়ে যে নামায পড়া হয়

---

১. মিন শব্দের পর 'ফোলানেবনে ফোলানিন শব্দ না বলে যার নামে কোরবানী হবে তার ও তার পিতার নাম বলতে হবে।

তাকেই সালাতুল জানাযা বা জানাযার নামায বলে। জানাযার নামাযের জন্য জামাআত হওয়া বাধ্যতামূলক শর্ত নয়। যদি একজন লোক পুরুষ বা স্ত্রী যে কেউ জানাযার নামায আদায় করেন তা হলেই সকলের পক্ষ থেকে এই নামায আদায় হয়ে যাবে। তবে যেহেতু এটি মাইয়্যাত বা মৃতের জন্য দোয়া সেহেতু জামাআত বাঞ্ছনীয়।

জানাযার নামায পড়ার নিয়ম কি?

প্রথমে মৃতকে উত্তর দিকে মাথা করিয়ে ইমামের সামনে রাখতে হবে। ইমাম মৃতের বুক বরাবর দাঁড়াবেন। মোক্তাদিগণের ইমামের পিছনে তিন কাতারে (সারিতে) দাঁড়ান মোস্তাহাব। অধিক লোক হলে বিজোড় সংখ্যায় যত খুশী কাতারে মোক্তাদিগণ দাঁড়াতে পারেন। যেমন যদি কোন জানাযার জন্য সাত জন উপস্থিত হন তাহলে একজন ইমাম তারপরের সারিতে তিন জন, তারপরের সারিতে দু'জন এবং শেষ সারিতে একজন দাঁড়াবেন। নাবালক ছেলেরাও জানাযার নামাযে যোগ দিতে পারে এবং সকলের সঙ্গেই কাতারে দাঁড়াতে পারে। এই নামাযে রুকু সেজদা নেই তবুও এটা নামায এবং সকল শর্তও অন্য নামাযের অনুরূপ। জানাযার জামাআত ছেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করে নামাযে দাঁড়ান যায়। যে কোন অবস্থায় সামিল হলে ইমামের তাকবির বলার জন্য অপেক্ষা করে যে কোন তাকবির থেকে জামাআতে যুক্ত হতে হবে। এই নামায দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সালাম বলে শেষ করতে হয়।

কিভাবে জানাযার নামায পড়তে হবে?

প্রথমে নিয়ত করতে হবে :

"নাওয়াইতো আন ওয়াদ্দিয়া লিল্লাহে তাআলা আরবাআ তাকবীরাতে স্বালাতিল জানাযাতে ফারজিল কেফায়াতে, আসসানাও লিল্লাহে তাআলা আস্বসালাতো আলান নাবিয়ে ওয়াদ্দোয়াও লেহাজাল মাইয়্যাতে মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতিল কাআবাতিশ শরীফাতে—আল্লাহো আকবার"।

বাংলা : আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে চার তাকবির সহ আল্লাহ্ তাআলার জন্য সানা, নবী করিমের (দঃ) উপর দরূদ এবং মাইয়্যাতের জন্য দোওয়া চাওয়ার উদ্দেশ্যে জানাযার ফরজে কেফায়া নামায আদায়ের নিয়ত করছি—আল্লাহো আকবার।

অথবা সংক্ষেপে এ ভাবেও নিয়ত করা যায় যথা :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ صَلٰوةَ الْجَنَازَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَدُعَاءً لِّلْمَيِّتِ ؕ

("নাওয়াইতো আন উস্বাল্লিয়া স্বালাতাল জানাযাতে লিল্লাহে তাআলা ওয়া দোয়াআন লিল মাইয়্যাতে"।)

বাংলা : আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ও মাইয়্যাতের জন্য দোওয়া চাওয়ার কারণে এই জানাযা নামাযের নিয়ত করছি।

নিয়ত করে আল্লাহো আকবার বলে হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে সাধারণ নামাযের মতই তাহরিমা বাঁধতে হবে ও সানা পড়তে হবে। সানা পড়ার পর তাহরিমা বাঁধা অবস্থায় আবার তাকবির বলতে হবে কিন্তু হাত ওঠাতে হবে না। এবার দরূদে ইব্রাহিম অর্থাৎ এই দরূদ পড়তে হবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؕ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؕ

[উচ্চারণ ও অর্থের জন্য ১২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

পড়া শেষ করে ঐ একই অবস্থায় আবার তাকবির বলতে হবে। এবারও হাত ওঠাতে বা আকাশের দিকে চোখের ঈশারা করতে হবে না। এরপর মৃত যদি পূর্ণ বয়স্ক হয় তাহলে নীচের দোওয়া পড়তে হবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا
وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ
عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ

(আল্লাহুম্মাগফের লেহাইয়েনা ওয়া মাইয়্যাতেনা ওয়া শাহেদেনা ওয়া গায়েবেনা ওয়া সাগিরেনা ওয়া কাবিরেনা ওয়া যাকারেনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহ্‌ইয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহ্‌য়েহী আলাল ইসলামে অ মান তাওয়াফ্‌ফায়তাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আলাল ইমান)।

বাংলা : হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত বালক ও বৃদ্ধ, পুরুষ ও স্ত্রীলোকেদের ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাদের জীবিত রাখ ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখো আর যাদের মৃত্যু দান কর তাদের ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দিও।

মৃত পূর্ণবয়স্ক না হয়ে যদি শিশু হয় এবং বালক হয় তাহলে উপরোক্ত দোওয়ার পরিবর্তে এই দোওয়া পড়তে হবে। যথা :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّ
اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

(আল্লাহুম্মাজ আলোহু লানা ফারাত্বওঁ ওয়াজআলোহু লানা আজরাওঁ ওয়া মোখরাওঁ ওয়াজআলহু লানা শাফেয়াওঁ ওয়া মোশাফ্‌ফেআন।)

বাংলা : হে আল্লাহ্‌, একে আমাদের জন্য অগ্রণী করো আর আমাদের পুরস্কার ও সম্বলের উপলক্ষ্য করো এবং আমাদের জন্য একে অনুরোধ ও প্রার্থনাকারী করো।

আবার যদি মৃত শিশু বালক না হয়ে কন্যা হয় তবে "শাফেআওঁ ওয়া মোশাফ্‌ফেআন" শব্দের পরিবর্তে "শাফেয়াতাওঁ ওয়া মোশাফ্‌ফেআতান" বলতে হবে।

এবার ঐ তাহরিমা বাঁধা অবস্থায় থেকেই চতুর্থবার তাকবির বলে ডান ও বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাম বলে নামায শেষ করতে হবে। ইমাম উচ্চস্বরে ঐ চার তাকবির ও সালাম বলবেন এবং মোক্তাদিগণ নীরবে তাকবির বলবেন, এবং সবকটি দোওয়া নীরবে পড়বেন।

মৃতের গোসল দেওয়ার নিয়ম কি ?

গোসলের জন্য ঈষদুষ্ণ পানির ব্যবস্থা করতে হয়। এই পানিতে কুলপাতা দেওয়া উত্তম। শরীরের ডান দিক থেকে ও ওজুর অঙ্গ সমূহ থেকে গোসল দেওয়া শুরু করতে হবে। তিনবার, পাঁচবার বা সাতবার অর্থাৎ বিজোড় সংখ্যক বার পানি ঢেলে সকল প্রকার ময়লা ও অপবিত্রতা পরিষ্কার করে গোসল দিতে হবে। পুরুষ মৃতকে পুরুষগণ এবং মহিলা মৃতকে মহিলাগণ গোসল করাবেন, তবে স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীর গোসল দেওয়ান বৈধ কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামীর গোসল দেওয়ান বা স্পর্শ করা হারাম বা নিষিদ্ধ। কারণ স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলেও স্ত্রীর স্বামীর সঙ্গে ইদ্দতকালীন সম্পর্ক থাকে।

মৃতকে গোসল দেওয়ার পূর্বে লাশের কাছে সুগন্ধি জ্বালিয়ে দুর্গন্ধ দূর করতে হয়। এবার পরিষ্কার কাপড় দিয়ে সতর ঢেকে তবে পরিধেয় বস্ত্র সরাতে হবে। কুল্লি না করিয়ে ও নাকে পানি প্রবেশ না করিয়ে প্রথমে ওজু করাতে হবে। সাবান দিয়ে মাথা ও দাড়ি ধুইয়ে দিতে হবে। এবার বামদিকে কাত করে ডানদিক এবং তারপর ডান দিকে কাত করে বাম দিক পরিষ্কার করে ধোয়াতে হবে। এরপর ঘাড়ে হাত দিয়ে বসানোর ভঙ্গিতে মাথা তুলে পিঠে ঠেস দিয়ে পেটে মৃদু চাপ দিয়ে নিতে হবে। এভাবে কোন ময়লা বের হলে তা ধুয়ে দিতে হবে। কিন্তু পুনঃ ওজু করাতে বা গোসল দিতে হবে না। হাতে টুকরো কাপড় জড়িয়ে পেচ্ছাব পায়খানার জায়গা ঘসে ধুয়ে দিতে হবে। আঙ্গুলে কাপড় জড়িয়ে দাঁত পরিষ্কার করে দিতে হবে। এবার শুকনো কাপড় দিয়ে সারা দেহ মুছে দাড়ি ও মাথায় সুগন্ধি মাখাবে এবং সেজদার জায়গায় কর্পূর মাখাতে হবে। এবার কাফন পরাতে হবে।

মাথা বা দাড়িতে চিরুণী দিতে হবে না নখ ও চুল কাটা যাবে না বা খাতনা দেওয়া যাবে না।

মৃতকে কাফন দেওয়ার নিয়ম কি?

মৃতকে কাফন পরান জীবিতের উপর ওয়াজেব। পুরুষের জন্য তিনখানা কাপড়। যথা (১) ইজার (২) লেফাফা অর্থাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকার কাপড় এবং (৩) পিরহান অর্থাৎ ঘাড় থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে। ঐ কাপড় সুতী, সাদা এবং ইয়ামান দেশের তৈরী। তাই কাফন সাদা ও সুতী হওয়াই উত্তম।

মহিলাদের জন্য পাঁচখানা কাপড় প্রয়োজন। পাঁচখানা কাপড়ে মহিলাগণের কাফন দেওয়া সুন্নত তরিকা. অতিরিক্ত দুটি হল সিনাবন্দ ও শিরবন্দ। সিনাবন্দ বগল থেকে কোমর, রান ও জানুদ্বয় পর্যন্ত ঢাকা পড়ার মত লম্বা। কাফন পরানোর সময় সিনাবন্দ পিরহানের নীচে থাকবে এবং পেঁচানোর সময় পিরহানের উপর থাকবে। শিরবন্দ অর্থাৎ মাথার ওড়না স্বরূপ যা দিয়ে চুল ঢাকা বা বাঁধা যায়। কাফন পরানোর সময় সব সময় ডানদিক থেকে শুরু করতে হয়।

পুরুষের কাফন পরানোর নিয়ম কি?

প্রথমে কাফন বিছিয়ে তার উপর লাশ রাখতে হয়। কাফন বিছানর নিয়ম হল :—পুরুষের ক্ষেত্রে প্রথমে লেফাফা তার পর ইজার এবং সবার উপরে কামিজের বা পিরহানের একদিক বিছাতে হবে। এবার তার উপর লাশ রেখে প্রথমে কামিজের কাটা অংশ থেকে মাথা গলিয়ে বুকের উপর থেকে লম্বা করে দিতে হবে, এবার পর পর প্রথমে ডান দিক ও পরে বাম দিকের কাপড় মুড়ে দেহের উপর দিয়ে পা ও মাথার কাফনের দু প্রান্ত আলগা রেখে দিতে হবে।

স্ত্রীলোকের কাফন পরানোর নিয়ম কি?

স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রথমে কামিজ পরিয়ে মাথার চুল দুভাগ করে

মস্তকাবরণী দ্বারা জড়িয়ে বুকের উপর রাখতে হবে—তারপর ইজার ও লেফাফা দিয়ে একই নিয়মে আবৃত করে কাফনের দুই প্রান্ত ও মধ্যভাগ বেঁধে দিতে হবে। অর্থাৎ কাফন বিছানর সময় ইজারের উপর বক্ষ-আবরণী বিছিয়ে তার উপর কামিজ বিছালে কাফন পেঁচানর সুবিধা হবে।

দাফন বা কবরস্থ করার নিয়ম কি ?

জানাযার নামায পড়া শেষ হলেই লাশের খাটিয়া চারজন কাঁধে করে কবরস্থানে নিয়ে যাবেন। যাবার সময় খাটিয়ার ডানদিক থেকে আরম্ভ করে কম পক্ষে দশ পা করে চল্লিশ পা গুণে চলা মোস্তাহাব। সকলের জানাযার পিছনে পিছনে চলা মোস্তাহাব। কবর উত্তর দক্ষিণে লাশের মাপ মত লম্বা ও পরিমাণ মত চওড়া করে কম পক্ষে পূর্ণ বয়স্ক মানুষের সিনা বরাবর গভীর করে খুঁড়তে হয়। লাশ কবরের পশ্চিমদিকে নিয়ে গিয়ে উত্তর দিকে মাথা রেখে কবরে নামাতে হবে। কবরে দুজন নেমে গিয়ে লাস নামাতে সাহায্য করবেন। ধীর স্থির ভাবে কবরের মাটিতে লাশ রেখে কাফনের মাথা ও পায়ের দিকের বাঁধন খুলে দেবেন। লাশ কবরে নামিয়ে মাটিতে রাখার সময় পড়ার দোওয়া হল :—

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

"বিসমিল্লাহে আলা মিল্লাতে রাসুলিল্লাহ". এবার যাঁরা কবরে নেমেছেন তাঁরা লাশের মাথা ঘুরিয়ে কেবলামুখী করে দেবেন। স্ত্রী লোকের ক্ষেত্রে কবরে নামবেন মোহরাম ব্যক্তি। কোন বেগানা লোকের নামা চলবে না এবং স্ত্রী লোকের ক্ষেত্রে কবরের উপরে একটা চাদর ঘিরে পর্দা করতে হবে। এবার কবরের উপর বাঁশ বা তক্তা ইত্যাদির পাটাতন বিছিয়ে তার উপর মাটি দিতে হবে। প্রথমে মাটি এক এক মুষ্ঠি আকারে নিয়ে পাটাতনের উপর তিনবার রাখতে হবে এবং এই নিয়মে দোওয়া পড়তে হবে।

প্রথম বারে : মিনহা খালাক নাকুম

দ্বিতীয় বারে : ওয়াফীহা নয়ীদোকুম

তৃতীয় বারে : অমিনহা নোখরেজো কুম তারাতান উখ্রা

এবার খোঁড়া মাটি কবরের উপর পুরু করে বিছিয়ে দিতে হবে। সাধারণ ভাবে আধহাতের মত উঁচু করে কবরের উপরিভাগকে উটের পিঠের ন্যায় করে দিতে হবে।

সাবধান! কোন বেদআত কাজ যেন না হয়। কোন ভাবে কবরস্থানে হাঁড়ি, কলসী কোদাল ফেলে আসা, কবরস্থানে আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালান বেদাআত। এসব মৃতের আত্মার কষ্টের কারণ হয় এবং এ বিষয় মৃতকে তাঁর পরিজন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

বরং সব শেষে কোরআনের আয়াত, কালেমা, দরূদ ইত্যাদি পড়ে সমবেত ভাবে এবং তিনবার সুরা ফাতেহা (আলহামদো), দশবার সুরা এখলাস (কুলহো আল্লাহ্) এবং এগারবার দরূদ শরীফ পড়ে মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)-এর সুপারিশের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতে হয়। কেবলামুখী হয়ে মৃতের জন্য দোওয়া চেয়ে কবরস্থান ত্যাগ করা উত্তম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আরও কতিপয় সুন্নত নামায

(এস্তেসকা, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ, এস্তেখারার, তাহাজ্জুদ, এশরাক, আওয়াবীন, শবে বরাত ও শবে কদরের নামায।)

এস্তেসকা নামায :

এস্তেসকা অর্থ বৃষ্টির জন্য দোওয়া। এস্তেসকা শুধুমাত্র নামাযের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নামায ছাড়াও বৃষ্টির জন্য কান্নাকাটি করা ও দোওয়া করার মধ্যেও এস্তেসকা সম্পন্ন হতে পারে। এস্তেসকার নামাযে আযান একামত হবেনা। জামাআত করে ইমাম সশব্দে ক্বরাআত নামায পড়বেন ও মোক্তাদিগণ তাঁকে অনুসরণ করবেন। নামাযের নিষিদ্ধ সময়ে এই নামায পড়া যাবে না। অতিবৃষ্টি ও ক্ষয়ক্ষতির জন্যও অনুরূপ দোওয়া ও নামায পড়া যায়।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণকালীন নামায :

চন্দ্রগ্রহণের কোন ঘটনা হযরতের আমলে বর্ণিত হয়নি তবে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের গ্রহণের তাৎপর্য সমপর্যায়ের বর্ণনা করে উভয় গ্রহণের সময়েই নামায, জেকের, দোওয়া, এস্তেগফার ও দানধ্যান করা কর্তব্য। সূর্যগ্রহণের নামাযকে কসুফের নামায বলা হয়। হযরত সর্বদাই সূর্যগ্রহণের সময় নামায পড়তেন ও অন্যকে পড়ার ইঙ্গিত করতেন। তাই সূর্যগ্রহণ শুরু হলেই সকলে একত্রিত হয়ে দুরাকাআত নামায আদায় করা কর্তব্য। এই নামায সুন্নত। এই নামায জামাআত করে আদায় করতে হয়। এই নামাযে বড় সুরা পড়া রুকু সেজদাকে অনেক বেশী দীর্ঘ করা কর্তব্য। যতক্ষণ সূর্যগ্রহণ থাকে ততক্ষণই এইভাবে একত্রিত হয়ে নামায পড়া তেলাওয়াত ও নানারূপ এবাদাতের মধ্যে আত্মস্থ থাকা প্রয়োজন।

কেবলামুখী হয়ে দুরাকাআত সুন্নত নামাযের নিয়ত করে সাধারণ নামাযের মতই আদায় করতে হয়। এই নামাযে কোন আযান বা একামত নেই। চন্দ্রগ্রহণের নামাযকে খসুফের নামায বলে।

এস্তেখারার নামায :

বিশেষ কোন কাজ উপলক্ষ্যে তার ভালমন্দ জানার জন্য বা কোন কাজ আরম্ভ করার আগে তার শুভাশুভ অবগত হওয়ার জন্য তা আরম্ভের পূর্বে দুরাকাআত বা ততোধিক নামায পড়ে আল্লাহ্র প্রতি ধ্যান ও একাগ্রতা সহকারে এস্তেখারার জন্য দোওয়া পড়তে হয়। এই ব্যবস্থা অবলম্বনকে 'এস্তেখারা' বলে। এস্তেখারা অর্থ হল আল্লাহ্র কাছে কাজের ভালর জন্য প্রার্থনা। নামায পড়ার নিয়ম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম উল্লেখ আছে। কেউ বলেন প্রত্যেক রাকাআতে সুরা ফাতেহার পর পর্যায়ক্রমে প্রথম রাকাআতে আশশামসো ৭ বার, দ্বিতীয় রাকাআতে অললাইলে ৭ বার, তৃতীয় রাকাআতে আদ্দোহাহা ৭ বার, চতুর্থ রাকাআতে সুরা ইনশেরাহ ৭ বার, পঞ্চম রাকাআতে সুরাতীন ৭ বার, ষষ্ঠ রাকাআতে সুরা কদর ৭ বার পড়ে এস্তেখারার দোওয়া পড়ার পর নিদ্রা গেলে ভালমন্দ বোঝা যায়। এশার

নামাযের পর কয়েক বার দরূদ শরীফ পড়ে এই দোওয়া ১০০ বার পড়ে আবার কয়েক বার দরূদ শরীফ পড়ে নির্দিষ্ট বিষয় চিন্তা করে ঘুমালে স্বপ্নে ভাল মন্দ জানা যায়। দোওয়াটি হল : "সোবহানাকা লা ইলমালানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলীমুল হাকিম।"

তাহাজ্জুদের নামায :

তাহাজ্জুদের নামায সুন্নত কিন্তু অতি মঙ্গলময় ও কল্যাণকর নামায। এই এবাদাত আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষ পছন্দনীয় এবাদাত। ইসলামের প্রথম যুগে এই নামায ফরজ ছিল এবং সময় ও পরিমাণ নির্দ্ধারিত ছিল রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ বা অর্দ্ধ কিংবা তৃতীয়াংশ। তাহাজ্জুদ ফরজ হওয়া রহিত হওয়ার পরও আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসুলকে সম্বোধন করে বলেছেন, "—রাত্রের অংশবিশেষে আপনি তাহাজ্জুদ পড়ুন—যা (পাচ ওয়াক্তের উপর) অতিরিক্ত নামায আপনারই মঙ্গল ও লাভের জন্য। আশান্বিত থাকুন আপনার পরওয়ার দেগার আপনাকে 'মাকামে মাহমুদ' দানে গৌরবান্বিত করবেন।" কোরআন ১৫ পাঃ ৯ রুকু) হযরত বলেছেন ফরজের পর সর্বাধিক ফজিলতের নামায হল তাহাজ্জুদ। হযরত কখনও চার, কখনও আট ও কখনও বার রাকাআত পড়তেন। তাহাজ্জুদের নামাযে কেরাত দীর্ঘ করতেন। তাহাজ্জুদের নামায দুরাকাআত করে বার রাকাআত পড়া উত্তম। তাহাজ্জুদের নামাযে গোনাহ মাফ হয়। মক্কা শরীফের মাসজিদুল হারামে এই নামায আযান সহ জামাআতে পড়া হয়। এই নামায সাধারণ নামাযের মত পড়া যায় তবে সুরা দীর্ঘ করা উচিৎ। আবার নিম্ন নিয়মেও পড়া যায়।

নিয়ত করে সুরা ফাতেহার পর প্রথম রাকাআতে সুরা এখলাস (কুলহোআল্লাহ) ১২ বার, দ্বিতীয় রাকাআতে ১১ বার এইভাবে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক রাকাআতে একবার কমাতে কমাতে শেষ রাকাআতে একবার পড়ার পর নামায শেষ করা। আবার অনেকে প্রত্যেক রাকাআতে সুরা ফাতেহার পর প্রত্যেক রাকাআতে তিনবার সুরা এখলাস পড়ে থাকেন। বুজর্গ লোকগণ তাহাজ্জুদের নামাযে সুরা মোজাম্মেল, আয়াতুলকুর্শী, আলাম নাশরাহলাকা, সুরা ইয়াসীন ইত্যাদি দীর্ঘ সুরা পড়ে থাকেন। প্রিয় নবী এই নামাযের বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন।

নিয়ত ঃ আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কেবলামুখী হয়ে তাহাজ্জুদের দু'রাকাআত সুন্নত নামায আদায়ের নিয়ত করছি—আল্লাহো আকবার।

এশরাকের নামায ঃ

এই নামায সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ। সূর্য ওঠার পর দু-ঘন্টার মধ্যে এই নামায পড়তে হয়। ফজরের নামায শেষ করে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্‌র তসবিহ ইত্যাদিতে কাটিয়ে দু রাকাআত এশরাকের নামায পড়তে হয়। দু-থেকে ছয় রাকাআত পর্যন্ত এই নামায দু-দু'রাকাআত করে পড়তে হয়। সাধারণ সুন্নত নামাযের যা নিয়ম এই নামাযেরও ঐ একই নিয়ম।

আওয়াবীনের নামায ঃ

মাগরেবের নামাযের পর থেকে এশার নামাযের সময়ের পূর্বেই এই নামায পড়তে হয়। এই নামায মোট ছয় রাকাআত, দুই দুই রাকাআত করে পড়তে হয়। এ নামায সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ। সাধারণ নামাযের নিয়মে এই নামায পড়তে হয়। তবে এই নামাযে সুরা ফাতেহার পর প্রথম রাকাআতে আয়াতুল কুরসী, দ্বিতীয় রাকাআতে তিনবার সুরা এখলাস পড়া উত্তম। এই নামাযে অধিক পুণ্য সঞ্চয় হয়।

শবে বরাতের নামায ঃ

শাবান মাসের ১৫ তারিখের এশার নামাযের পর থেকে সোবহে কাজেব পর্যন্ত এই নামায পড়তে হয়। শবে বরাতের নামাযকে লায়লাতুল বারাতের নামায বলে। এই নামায কমপক্ষে বার রাকাআত পড়তে হয়, আর যত বেশী পড়া যায় উত্তম। শবে বরাতের রাতে সারারাত জেগে এবাদাত করা বিশেষ পুণ্যের কাজ। এই রাতে কোনরকম বাজী পোড়ান বা আনন্দ-ফুর্তি করা পাপ ও ঘোরতর অন্যায়। দুই রাকাআতের নিয়ত করে সাধারণ নামাযের মতই শবে বরাতের নামায পড়া যায়। তবে প্রত্যেক রাকাআতে সুরা ফাতেহার পর দশবার করে সুরা এখলাস পড়লে অধিক পুণ্য সঞ্চয় হয়।

শবে কদরের নামায ঃ

রমজান মাসের শেষ দশ দিনের বিজোড় সংখ্যক দিনগুলির কোনদিনই শবে কদর বা লাইলাতুল কদর। এই রাত সহস্র মাসের রাত হতে শ্রেষ্ঠ

রাত। যাঁরা এই রাতে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবাদাত করেন তাঁরা অধিক পুণ্য সঞ্চয় করেন ও তাদের গোনাহ মাফ হয়। এই রাতে সমস্ত রাত্রি জেগে নামায, কোরআন পাঠ, তসবিহ পড়া ইত্যাদির মধ্যে নিজেকে আত্মস্থ রাখা দরকার। অনেকে ২৭শে রমজানই শবে কদরের রাত বলে উল্লেখ করেছেন।

শবে কদরের রাতের নামায নফল নামায। দুই রাকাআত করে এই নামায আদায় করতে হয়। কমপক্ষে বার রাকাআত। তবে যত বেশী সম্ভব পড়া ভাল। সাধারণ নফল নামাযের মত একই নিয়মে পড়তে হয়। আর সুরা ফাতেহার পর সুরা কদর আর সুরা এখলাস বেশী করে পড়া উত্তম।

নিয়ত: আমি আল্লাহ্‌র জন্য কাআবা শরীফের দিকে মুখ করে শবে কদরের দু'রাকাআত নফল নামায আদায়ের নিয়ত করছি—আল্লাহো আকবার।

নবম পরিচ্ছেদ

আরও কয়েকটি মুসলিম পর্ব

আখেরী চাহার শোম্বা

আখেরী চাহার শোম্বা কাকে বলে ও ঐদিন কি ঘটেছিল এবং করণীয় কি?

আরবী সফর মাসের শেষ বুধবারকে আখেরী চাহার শোম্বা বলে। সফর মাসের এই দিনে ইসলাম ধর্মের মহান সংস্কারক হযরত মোহাম্মাদ(সাঃ) অসুস্থ হয়েছিলেন আর এই মাসের শেষ বুধবারে তিনি রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ হন। এই দিনটিকে মুসলমানগণ বিশেষ পুণ্যের দিন হিসাবে গণ্য করেন। তাই এই দিনে বিপদ, দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তির আশায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য দান করা, নিঃস্ব দরিদ্রকে পানাহার করান, আতুর, দুঃখী, অসুস্থকে সাহায্য করা, কোরআন পাঠ, নফল নামায, দোওয়া দরূদ পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা। নিজের অপরাধের মার্জনা চাওয়া বিশ্ব মুসলমানের

মঙ্গল কামনা করা একান্ত কর্তব্য। এসকল ভাল কাজ করলে বিশেষ পুণ্যলাভ হবে।

ফাতেহা দোয়াজ দাহাম

ফাতেহা দোয়াজ দাহাম কি ?

আরবী রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ হল ফাতেহা দোয়াজ দাহামের দিন। আসলে দিনটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব, শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্ম ও ইহলোক ত্যাগের দিন। এই দিনকে 'নবী দিবস' ও বলা হয়। তাই এই দিনটি একদিকে যেমন বিশ্ব মুসলমানের আনন্দের দিন তেমনি আবার দুঃখ ও শোকের দিনও। এই দিন সকলেরই হযরতের জীবনাদর্শ, ত্যাগ তিতিক্ষা, ধর্মাচরণ বিষয় আলোচনার মাধ্যমে সেই আদর্শে জীবন গড়ে তোলার শপথ নেওয়ার দিন। এই মহামানবই একমাত্র মানুষ যিনি যা বলেছেন তার সবটাই ব্যক্তিগত জীবনে করে দেখিয়েছেন। অতি তুচ্ছ জিনিষ বা বিষয়ও তিনি না করে কাউকে তা পালনের নির্দেশ দেননি। পৃথিবীতে আজও এমন একজনও অনুরূপ নেতার আবির্ভাব ঘটেনি যিনি তাঁর সকল নীতিকে বাস্তবায়িত করে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ইসলাম ধর্মের যা যা নীতি নির্দ্ধারণ করেছেন সবটাই বাস্তবে নিজে করে দেখিয়েছেন।

তাই তাঁর জীবনের আলোকে জীবন গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের মাধ্যমে, কোরআন পাঠ, দোওয়া দরূদ পাঠ করে হযতর মোহাম্মাদ (সাঃ) এর সুপারিশক্রমে তা মঞ্জুরের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা ইত্যাদি সহ নানা জনহিতকর সামাজিক কাজ ও আল্লাহ্‌র আরাধনা, উপাসনা এবং হযরতের জীবনাদর্শের আলোচনা সভা—মিলাদ মহফিল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উদযাপন করা প্রয়োজন।

ফাতেহা ইয়াজ দাহাম

রবিউস সানি মাসের ১১ তারিখকে ফাতেহা ইয়াজ দাহাম বলে। এই দিন সুবিখ্যাত মনীষী হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)

ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি ওলিকুল শ্রেষ্ঠ তাপস হিসাবে বিশ্ব বরেণ্য। তাঁর মহৎ আদর্শ মানব চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়ক। এই দিন ধর্ম সভা ধর্মালোচনা সর্বোপরি নানা রকম উপাসনা আরাধনা করে তাঁর আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করা পুণ্যের কাজ।

শবে মেরাজ

শবে মেরাজ কী?

রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতে বোরাকে আরোহণ করে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সশরীরে জান্নাত ও জাহান্নাম পরিভ্রমণ করেন এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। ঐ দিনকে শবে মেরাজ বলে। এই রাতে প্রথমে জমজম ও মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যবর্তী স্থান থেকে তিনি জিব্রাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে বোরাকে আরোহণ করে বায়তুল মোকাদ্দাস যান। সেখানে মসজিদুল আকসায় দুরাকাত নামায পড়েন। তারপর পুনরায় বোরাকে উঠে সপ্ত আকাশ অতিক্রম করেন এবং যথাক্রমে হযরত আদম (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মুসা (আঃ), হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করেন। এরপর তিনি সিদরাতুল মুনতাহায় উপস্থিত হন। জিব্রাঈল (আঃ) এখানে গিয়ে থেমে যান। তাঁর আর অগ্রসর হওয়ার অনুমতি ছিল না। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একাই অগ্রসর হন। আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছায় তিনি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করেন। আল্লাহ্ সৃষ্টির বহু গোপন রহস্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জানান। আল্লাহ্‌র দরবার থেকে ফিরে আসার সময় তিনি উম্মতদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায মঞ্জুর করিয়ে আনেন। শবে মেরাজ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর হিজরতের এক বৎসর পরে সংঘটিত হয়।

২৭শে রজবের মাহাত্ম্য কি ও করণীয় কি?

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন রজব আল্লাহ্‌র মাস। তিনি আরও বলেছেন—এই মাস আল্লাহ্‌র রহমতের জন্য নির্দিষ্ট এবং এই মাসে ঝগড়া-বিবাদ করা হারাম। এই মাসে আল্লাহ্‌তায়ালা নবীদের তওবাহ কবুল করেছেন। এ মাসে রোযা রাখলে আল্লাহতায়ালা যাবতীয় পাপ ক্ষমা

করে দেন। অবশিষ্ট দিনগুলিতে পাপ করা থেকে বিরত রাখেন এবং কেয়ামতের দিন তাকে পিপাসার্ত করেন না। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, রজব মাসের প্রথম জুমআর রাত ঘুমিয়ে কাটিও না। ঐদিন আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত ফেরেশতা কাআবা ও কাআবার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রার্থনার জন্য বলেন। ফেরেশতাগণ বলেন—প্রভু রজব মাসের রোযাদার ব্যক্তিদের ক্ষমা করে দেন। হযরত (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার রোযা রাখে এবং মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাআত করে বার রাকাআত নামায আদায় করে এবং প্রত্যেক রাকাআতে সুরা ফাতেহার পর তিনবার সুরা কদর ও বারো বার সুরা এখলাস পাঠ করে নামায শেষ করবেন। পরে সত্তর বার বলতে হবে :

"আল্লাহুম্মা স্বাল্লেআলা সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদান নাবীয়্যিল উম্মী ওয়া আলা আলেহি ওয়া সাল্লাম।" তারপর সেজদাহ দিয়ে সত্তর বার পড়তে হবে—

সুব্বুহুন, কুদ্দুসুন রাব্বানা ওয়া রাব্বুল মালায়েকাতে ওয়ার রূহ। মাথা তুলে সত্তর বার বলতে হবে—

"রাব্বিগ্‌ ফিরলী ওয়ার্‌হাম্‌ ওয়াতা জাওয়াযু আম্মা তা'লাম ফাইন্নাকা আন্‌তাল্‌ আযীযুল আযামে।"

উপরোক্ত ভাবে দ্বিতীয় সেজদাহ করে ও দোওয়া পাঠ করে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলে আল্লাহ্‌ তা কবুল করবেন। হযরত (সাঃ) বলেছেন রজবের সাতাশ তারিখে রোযাকারী ষাট মাস রোযা রাখার পুণ্য সঞ্চয় করে। এই দিনে হযরত জিব্রাইল (আঃ) নবুয়ত সহ হযরত (সাঃ)-এর কাছে আসেন। হযরত (সাঃ) বলেছেন রজব মাসে দোওয়া পাঠ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। তাকে বিপদাপদ থেকে মুক্ত করেন। তেমনি রজব মাসে পাপ করলে তার দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে।

মহরম ও আশুরা

আশুরা: মহরম একটি আরবী মাসের নাম। এই মাসের ১০

তারিখকে আশুরা বলে। আশুরার দিনের গুরুত্ব অন্য মাসের তুলনায় অনেক বেশী। এই দিন আল্লাহ্ তায়ালা বিশ্ব জগতের বহু উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় সৃষ্টি করেছেন। আর বহু সৃষ্টির বিবর্তনও ঘটেছে এই দিন। হযরত মুসা (আঃ)-এর যুগে এই দিন একটি রোজা রাখা ফরজ ছিল। হযরত আদম (আঃ) তাঁর ক্রুটির জন্য এই দিন ক্ষমা লাভ করেন, এই দিন হযরত মুসা (আঃ) ও বনি ইস্রাইল জাতি আল্লাহ্র নির্দেশে লোহিত সাগর অতিক্রম করেন ও বাদশাহ নমরূদ সৈন্যসহ লোহিত সাগরের অতল জলে নিমজ্জিত হন। এই দিন হযরত ঈশা (আঃ)-কে খ্রীষ্টানদের হত্যার হাত থেকে রক্ষা করে জীবিত অবস্থায় চতুর্থ আকাশে উঠিয়ে নেন। এই তারিখে মহাপ্লাবনের পর হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকা তীরে নোঙ্গর করে। এই দিন নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) কারবালা প্রান্তরে অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রাণ বিসর্জন দেন। সমগ্র পৃথিবীতে এই ঘটনা এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। আজও শিয়া সম্প্রদায় এই যুদ্ধের স্মৃতি হিসাবে ঐ দিনে তাজিয়া ইত্যাদি করে থাকেন। তবে এগুলি ইসলাম ধর্মের ধর্মাচরণের অঙ্গ নয়। কারণ মুসলমানদের নিকট এই দিন আনন্দের দিন নয় শোকের দিন। মৃতের আত্মার শান্তি কামনার দিন। এই চাঁদের ৯ ও ১০ তারিখে রোজা রাখা খুবই পুণ্যের কাজ। এই দিন লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, ঢোল, তবলা, তাজিয়া ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা না জায়েজ।

আশুরার রাত কি ? ঐ রাতে কি করতে হবে ?

মহরম মাসের ৯ তারিখের দিনগত রাত্রিকে আশুরার রাত বলে। এই রাত্রে ওজু গোসল করে নফল নামায পড়া, কোরআন পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করা হল ইসলামী বিধানে পুণ্যের কাজ। কম করে এই রাত্রে চার রাকাআত নফল নামায পড়া প্রয়োজন। এই চার রাকাআত নামাযের প্রত্যেক রাকাআতে সুরা ফাতেহার পর পাঁচবার করে সুরা এখলাস পড়লে বৎসরের নানা বিপদ আপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় অথবা রাতের শেষ ভাগে এই চার রাকাআত নফল নামাযের প্রত্যেক

রাকাআতে সুরা ফাতেহার সঙ্গে আয়াতুল কুরশী একবার এবং সুরা এখলাস তিন বার পড়তে হবে। এবার তিনবার সুরা ফাতেহা ১০ বার সুরা এখলাস ও ১১ বার দরূদ শরিফ পড়ে কারবালার শহীদান উদ্দেশ্যেও অন্য সকল বিষয় প্রার্থনা করলে আল্লাহ মঞ্জুর করেন।

আশুরার দিন রোজা রাখলে দশ হাজার শহীদের দশ হাজার হাজি ও ওমরাকারীদের মত পুণ্যলাভ হয়।

আশুরার দিনের মহত্ত্ব কি এবং এই দিনে কি ঘটেছিল ?

যে চারটি মাসে ঝগড়াবিবাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি কাজ করা অবৈধ, মহরম মাস হলো তার অন্যতম। এই মাসের ১০ তারিখ হলো আশুরা। এই দিনের এবাদতের জন্য আল্লাহতায়ালা অগণিত পুণ্য দান করেন।

আশুরার দিন আল্লাহ্ আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র, লাওহো ও কালাম সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম (আঃ)-কে আশুরার দিন সৃষ্টি করেছেন ও বেহেশতে স্থান দিয়েছেন। এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং এই দিনই তাঁর পুত্রকে কোরবানী করেন। এই দিনেই ফেরআউন নীলনদে নিমজ্জিত হয়। হযরত আইয়ুব (আঃ) এই দিনেই রোগমুক্ত হন। এই দিন আল্লাহ্তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-এর তওবাহ কবুল করেন। হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্তায়ালা এই দিন ক্ষমা করেন। আশুরার দিন হযরত ঈসা (আঃ) ভূমিষ্ট হন এবং এই দিনই পৃথিবী ধ্বংস হবে। আশুরার দিন আল্লাহ্তায়ালা আরশে সমাসীন হয়েছেন। প্রথম বৃষ্টি ও আল্লাহ্র রহমত আশুরার দিন অবতীর্ণ হয়েছে।

মোহরম মাসে আশুরার দশটি রোযা রাখলে দশ হাজার ফেরেশতার পুণ্য লাভ করে। শুধুমাত্র আশুরার দিন রোযা রাখলে দশ হাজার শহীদের পুণ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া দশ হাজার হাজী ও ওমরাহকারীদের সওয়াব মেলে। আশুরার দিনে রোযাদার ও রাতে এবাদতকারী ষাট বছর এবাদতের পুণ্য লাভ করে। আশুরার দিন এতীম বালকবালিকার প্রতি স্নেহেরবাণী প্রদর্শন করলে উক্ত এতীমের মাথার চুলের পরিমাণ বেহেশতের প্রকোষ্ঠ লাভ করা যায়। কোন মোমেনকে তৃপ্তি সহকারে আহার করালে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-

এর সমস্ত উম্মতকে আহার করানোর সওয়াব মেলে। এদিন গোসল করলে মৃত্যু রোগ ব্যতীত আর কোন রোগ তার দেহে থাকে না। এদিন কোন রোগীর শুশ্রূষা করলে সমস্ত মানবকুলকে শুশ্রূষা করার পুণ্যলাভ হয়। আশুরার দিন কাউকে শরবত পান করালে চব্বিশ ঘণ্টা এবাদতের পুণ্য লাভ হয়। আশুরার দিন প্রত্যেক রাকাআতে সুরা ফাতেহার পর পঞ্চাশবার সুরা এখলাস পাঠ করে চার রাকাত নামায পড়লে পঞ্চাশ বছর আগের ও পঞ্চাশ বছর পরের গোনাহ আল্লাহতায়ালা মাফ করে দেন।

তবে মনে রাখতে হবে এই পুণ্যলাভ নির্ভর করে উদ্দেশ্য একাগ্রতা, আল্লাহ্‌র ধর্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ইসলাম সম্মত জীবনযাপন করার উপর।

দশম পরিচ্ছেদ

সালাম বা অভ্যর্থনা

সালাম বা অভ্যর্থনা কি? এটি কখন করতে হয়?

সৌজন্যবোধ, আন্তরিকতা ও সামাজিকতা প্রকাশের জন্য পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে ইসলামী নীতি অনুসারে যেভাবে অভিবাদন ও অভ্যর্থনা জানাতে হয় তাকে সালাম বলে। মানবতা, আন্তরিকতা ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধকে সুদৃঢ় করার জন্য পরিচিত অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম জানানো সুন্নত। সালামের পর মোসাফাহ্‌ বা করমর্দন করা ও কুশল জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য।

একই ভাবে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সালাম জানানো সুন্নত। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে প্রথমে সালাম জানিয়ে কথা আরম্ভ করে।" সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজেব।

সালাম কিভাবে জানাতে হয়?

যিনি প্রথম সম্ভাষণ জানাবেন তাঁকে বলতে হয় আসসালামো

আলায়কুম অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি (মঙ্গল) বর্ষিত হোক। উত্তরে অপরপক্ষ বলবেন—ওয়া আলায় কুমুস সালাম। অর্থাৎ আপনার উপরও শান্তি (মঙ্গল) বর্ষিত হোক। তারপর মোসাফাহ্ বা করমর্দনের সময় একে অপরকে বলতে হয়—ইয়াগফেরুল্লাহা লানা অ লাকুম অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের ও আপনাদের ক্ষমা করুন। করমর্দনের সময় দুহাত বাড়িয়ে অপরের দুহাতের যুক্ত-হস্ততালু ধরে রাখার নিয়ম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পানাহার

মানুষের জীবন রক্ষার জন্য পানীয় ও আহার গ্রহণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু নামায, রোযা ইত্যাদির মত আহার ও পানীয় দ্রব্য হালাল হওয়া ফরজ। ইসলামের দৃষ্টিতে আহার্য বস্তু সর্বদাই পবিত্র ও সম্মানীয়। একে কোনভাবেই অপবিত্র মনে করা ও অসম্মান দেখানো পাপ। তাই আহার্য গ্রহণের সুশৃঙ্খল সামাজিক নিয়ম বিধি তৈরী করা হয়েছে। যাতে বিশ্ব ব্যাপী মানুষের আহার্য গ্রহণ পদ্ধতি একই নিয়মে হয় সেজন্য ইসলামী বিধানে নির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে।

আহার কি পরিমাণ করা উচিত ?

যতটা আহার করলে চলাফেরা জীবনযাত্রা নির্বাহ ও ধর্ম পালন করা যায় ততটা আহার করা মোস্তাহাব। পেট ভরে আহার করা মোবাহ্। আধপেট আহার করা সুন্নত। সুদ, ঘুষ, নাচ, গান ইত্যাদি সামাজিক অপরাধমূলক কাজের বিনিময়ে উপার্জিত অর্থে প্রস্তুত করা আহার্য হারাম বা নিষিদ্ধ। স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে আহার করাও হারাম।

আহারের নিয়ম কয়টি ?

আহারের নিয়ম ও সুন্নত সাতটি। যথা—(১) বিসমিল্লাহ্ বলে আহার

শুরু করা (২) খাওয়ার পূর্বে ও পরে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধোওয়া। (৩) ডান হাত দ্বারা খাওয়া (৪) আঙ্গুলের অগ্রভাগের সাহায্যে খাওয়া। (৫) আহারের পাত্র পরিচ্ছন্ন করে খাওয়া। (৬) দস্তরখান বিছিয়ে খাওয়া। (৭) খাওয়ার শেষে নীচের দোওয়াটি পড়া।

উচ্চারণ: আল্‌হামদো লিল্লাহিল্লাযি আত্‌আমানা অ-সাকানা অ-জা-আলনা মেনাল মোসলেমীন।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে আহার করালেন, পান করালেন এবং আমাকে মুসলমান করেছেন।

শ্রমের মর্যাদা

ইসলাম ধর্মে শ্রমের গুরুত্ব কতটা?

ইসলাম ধর্মের বিধানে নির্লিপ্ত জীবনের অনুমোদন নেই। হযরত মোহাম্মাদ (সা:) নিজে কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং ইসালাম অনুসারীদের কঠোর পরিশ্রমের আদেশ দিয়েছেন। সংগ্রামী জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রিয়নবী শ্রমের মর্যাদা দান করে নির্দেশ দিয়েছেন "শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তার পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে।" ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হয় যিনি পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি আরও বলেছেন "গরীবের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থেকো।" আল্লাহ্‌ ঐ ব্যক্তিকে কখনই ক্ষমা করবেন না যিনি শ্রমিকের হক নষ্ট করেন এবং তার অধিকার ক্ষুণ্ণ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কতিপয় সামাজিক কাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আকীকা

আকীকা বলতে কি বোঝায়? কখন ও কিভাবে করতে হয়?

পৃথিবীর সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানবই আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জন্ম, মৃত্যু, সংসার ও কর্মজীবনের জন্য বিশেষ কর্তব্য ও বিধান নির্দ্ধারণ করেছেন। এই সকল বিধান তিনি যুগে যুগে নবী ও রসূলগণের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রচলনের আয়োজন করেছেন।

মানব সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে যাতে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পন্থাদ্বারা তার জন্মানুষ্ঠান পালনের পথে না চলে এবং সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য যাতে একই নিয়ম ও প্রথা প্রচলিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সন্তানের জন্মকে কেন্দ্র করে যে আচার প্রবর্তন করেছেন তা হল 'আকীকা'। এই আকীকার মূল উদ্দেশ্য হল ইহলোক ও পরলোকে যাতে সদ্যোজাত সন্তানের কল্যাণ সাধিত হয় তার জন্য আনুষ্ঠানিক প্রার্থনাসভা করা। সন্তান যাতে পৃথিবীর জীবনে মঙ্গল, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে এক আল্লাহ্‌র উপাসনা আরাধনার মাধ্যমে ন্যায় ও সৎপথের সাধক হয় এবং অন্যায় অত্যাচারের শীকার না হয় তার জন্য সমবেতভাবে মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা। এজন্য হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তন করেছেন।

'আকীকা' করা সুন্নত। পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণের পর সাত, চৌদ্দ, একুশ বা যে কোনদিন আকীকা করা যায়। আকীকার জন্য পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে দুটি ছাগল আর কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল কোরবানীর দ্বারা আকীকা দেওয়া উত্তম। এক্ষেত্রে কোরবানীর প্রাণীর জন্য যা যা শর্ত আকীকার জন্যও

সেই একই শর্ত প্রযোজ্য। আকীকা করার দিন সন্তানের মস্তক মুণ্ডন করে ঐ চুলের পরিমাণ সোনা চাঁদি বা সর্ব্বনিম্ন দেশের প্রধান খাদ্যদ্রব্য দীন দরিদ্রদের দান করতে হয়। আকীকার জন্য জবহে করা প্রাণীর মাংসের এক তৃতীয়াংশ অনাথ আতুর দীন দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া মোস্তাহাব। আকীকার মাংস দ্বারা বাবা-মা, আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধবকে আপ্যায়ন করা দোষণীয় নয়। সন্তান সন্ততির নামকরণও এই দিন করা উচিৎ অর্থাৎ আকীকার দ্বারা নামকরণ করা উচিৎ। আকীকার জন্য সপ্তম দিন নির্বাচন করা উত্তম। অর্থাৎ কেউ শুক্রবার জন্মালে বৃহস্পতিবার তার আকীকা করা ভাল। অক্ষমতাবশতঃ আকীকা না করলে কোন দোষ হয়না।

আকীকার নিয়ত কি?

আকীকার প্রাণী জবাই করার সময় এইভাবেনিয়ত করতে হবে যথা:—

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ اِبْنِىْ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ. وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّابْنِىْ مِنَ النَّارِ.

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ *

আল্লাহুম্মা হাযেহী আকীকাতুবনী ফোলানে দামোহা বেদামেহী ওয়া লাহমোহা বেলাহমেহী ওয়া আজমোহা বে আজমেহী ওয়া জেলদোহা বে জালদেহী ওয়া শাআরোহা বে শাআরোহী। আল্লাহুম্মাজআলহো ফেদায়ান লে এবনী মেনান নারে—বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার।

দ্রষ্টব্য : প্রাণী জবাই করার আগে ছেলে বা মেয়ের নামকরণ করে নিয়ে ফোলানে শব্দের পরিবর্তে ঐ নাম বলতে হবে এবং যে দু'জায়গায় এবনি

শব্দ আছে পিতা জবাই না করে অন্য কেউ করলে এবনে বা বেনতে বলতে হবে। ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে 'এবনে' শব্দের পরিবর্তে বেনতে বলতে হবে এবং যে সকল জায়গায় "হা" শব্দ আছে সেখানে "হী" শব্দ বলতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাবাহ্ বা জবেহ্ করার নিয়ম

জাবাহ্ বলতে কি বোঝায়?

জাবাহ্ আরবী শব্দ। জাবাহ্ অর্থ কোন প্রাণীর সম্মুখভাগ থেকে গলা কাটা। ইসলাম ধর্মের নিয়ম মত যে সকল প্রাণীর মাংস ভক্ষণ বৈধ তা জাবাহ্ বা জবেহ না করে খাওয়া বৈধ নয়। তবে মাছ জাবাহ্ না করে ভক্ষণ বৈধ। যে সকল প্রাণীর মাংস খাওয়া অনুমোদিত তাদের নির্দিষ্ট নিয়মে জাবাহ্ করা হলে তবেই তার মাংস ভক্ষণ বৈধ হবে। নইলে কোন মৃত বা অনুরূপ নিয়মে জাবাহ্ করা না হলে তার মাংস ভক্ষণ হারাম বা নিষিদ্ধ।

জাবাহ্ করার মধ্যে কি কি ফরজ?

প্রথমতঃ কোন প্রাণীকে যিনি জাবাহ্ করার জন্য ধরবেন এবং যিনি জাবাহ্ করবেন উভয়েরই মুসলমান, জ্ঞানবান এবং প্রাণী অনুপাতে শক্তিমান হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ জাবাহ্ করার সময় "বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার" বলা। মনে রাখতে হবে এখানে 'বিসমিল্লাহ্ হির রহমানির রাহিম' বললে জাবাহ্ বৈধ হবেনা, 'বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবারই' বলতে হবে। তৃতীয়তঃ হলকুম অর্থাৎ গলদেশে জাবাহ্ করা। চতুর্থতঃ গলার দুপাশের দুশিরা (রগ) এবং শ্বাসনালী ও আহার নালী কেটে দেওয়া। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে যদি এই চারটি শিরার একটি কাটে তাহলে তার মাংস ভক্ষণ বৈধ নয়, কমপক্ষে দুটি শিরা না কাটলে ঐ মাংস হালাল হবেনা।

পঞ্চমতঃ জাবাহ্ করে রক্ত বয়ে যেতে দেওয়া অর্থাৎ টিপে রক্ত না আটকান। **ষষ্ঠতঃ** আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জাবাহ্ করা আর সেইমত নিয়ত করা।

জাবাহ্ করার মধ্যে কোন ওয়াজেব কাজ আছে কি ?

জাবাহ্ করার মধ্যে একটি মাত্র কাজ আছে যা ওয়াজেব যথা : যিনি জাবাহ্ করবেন জানোয়ারের ধড় তার সামনে ডানদিকে থাকবে এবং মাথা বামদিকে থাকবে অর্থাৎ জানোয়ার উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে থাকবে।

জাবাহ্-এর মধ্যে সুন্নত ক'টি ?

জাবাহ্-এর মধ্যে চারটি কাজ সুন্নত। যথা : (১) জাবাহ্ করার আগে ওজু করা। (২) জাবাহ্ করার অস্ত্র তীক্ষ্ণ ধারাল হওয়া। (৩) জাবাহ্-কারী ও জানোয়ারকে ধরে রাখার লোকেরও কেবলামুখী হওয়া এবং (৪) উভয়েরই "বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার" বলা।

জাবাহ্-এর মধ্যে মাকরূহ ক'টি ?

নিম্নলিখিত কাজগুলি মাকরূহ। যথা :—

(১) জাবাহ্ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলতে ভুলে যাওয়া (২) জবাই-এর অস্ত্র ভোঁতা হওয়া (৩) বিনা ওজুতে জবাই-এর তকবির বলে জবাই করা (৪) কাআবার দিকে মুখ না করে জবাই করা (৫) জানোয়ারের মাথা জবাইকারীর ডানদিকে অর্থাৎ মাথা উত্তর দিকে থাকা (৬) মোরগ মুরগী ইত্যাদি গলিজ বা নোংরা ভক্ষণকারী প্রাণীকে কমপক্ষে তিনদিন আবদ্ধ না রেখে জবাই করা (৭) দ্বীনদার পুরুষ থাকতে ফাসেক ও বেদাতী লোক জবাই করা (৮) বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে মাতাল ও অজ্ঞান লোকের জবাই করা (৯) হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় মহিলাদের জবাই করা (১০) নিরুপায় না হয়েও রাতের অন্ধকারে জবাই করা (১১) জবাই করার সময় স্বেচ্ছায় মাথা ধড় থেকে পৃথক করে দেওয়া (১২) কোরবানীর দিনে কোরবানীর পূর্বেই নিরুপায় না হয়েও অন্য কোন প্রাণী জবাই করা (১৩) জবাই করার পর সরদ হওয়ার পূর্বেই চামড়া ছাড়ান রগ কাটা বা হলকুমে ছুরির গোঁতা মারা ; মুরগী পাখী সরদ হওয়ার আগেই

তার পালক ছাড়ান ইত্যাদি কাজগুলি করা মাকরূহ। এগুলো করলে ত্রুটি ঘটবে তবে ঐ জানোয়ারের মাংস ভক্ষণ অবৈধ হবেনা।

জবাই করার মধ্যে কি কি করা হারাম বা নিষিদ্ধ ?

নিম্নলিখিত কাজগুলি হারাম। এগুলি ঘটলে ঐ প্রাণীর মাংস ভক্ষণ বৈধ হবেনা। যথা :

(১) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা। (২) মোশরেক মুরতেদ ও কাফেরের জবাই করা। (৩) স্মরণ থাকা সত্বেও বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার না বলা। (৪) মেহামানের উদ্দেশ্যে জবাই করার নিয়ত করলে বা পীর ইত্যাদি দরগার সম্মানার্থে জবাই করলে। (৫) উন্মাদ অপ্রাপ্ত বয়স্ক নাবালক জবাই করলে তবে যে নাবালক জবাই করার বুদ্ধি ও শক্তি রাখে তার জবাই করা জানোয়ারের মাংস হালাল।

জাবাহ্ করার নিয়ত কি ?

জাবাহ্ কবার নিয়ত হল :—

نَوَيْتُ اَنْ اَذْبَحَ هٰذَ الْحَيْوَانَ بِحَيْثُ يَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ وَتَكُوْنَ لَحْمَهٗ حَلَالًا لِّجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতো আন আজবাহা হাযাল হায়ওয়ানা বে হায়সো ইয়াখরোজো আনহুদ্দামাল মাসফুহে অতাকুনা লাহমোহু হালালাল লে জামিয়িল মুমোনিনা ওয়াল মুমেনাতে-- বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ বা নেকাহ্

বিবাহ কি ও কাকে বলে ?

স্ত্রী পুরুষের দাম্পত্য বন্ধনকে বলা হয় বিবাহ। আরবী ভাষায় একে বলে নিকাহ। বিবাহ দ্বারা স্বামী স্ত্রীর একে অপরের প্রতি অধিকার স্বীকৃত হয়। নারী পুরুষ পরস্পরের প্রস্তাব ও অনুমোদনের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়। তাঁদের মধ্যে যে কোন একজন প্রস্তাব করলেই হয়। আরবীতে প্রস্তাবকে বলা হয় ইজাব এবং অনুমোদনকে বলা হয় কবুল। ইসলাম ধর্মমতে বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়ার পর পুরুষের নারীর উপর যতটা অধিকার নারীরও পুরুষের উপর ততটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রস্তাব ও অনুমোদনের মধ্য দিয়ে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর স্বামী স্ত্রীর মিলিত যে সংসারজীবন তার নামই হলো বিবাহ।

বিবাহ কয় প্রকার ও কি কি ? কোন্ বিবাহ কিরূপ ?

বিবাহ চার প্রকার। যথা—ফরয, সুন্নত, মাকরূহ ও হারাম। বিবাহের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে এবং বিবাহ না করলে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বিবাহ ফরয। বিবাহের জন্য ইচ্ছা ও অনিচ্ছা কোনটাই তীব্র না হলে ও আর্থিক সক্ষমতা থাকলে বিবাহ সুন্নত। বিবাহের জন্য কোনপ্রকার অশান্তি বিবাদ বিসংবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে বিবাহ মাকরূহ। বিবাহের কারণে অত্যাচার কিংবা অশান্তি অবধারিত হলে বিবাহ হারাম।

ইসলামী শরীয়ত অনুসারে বিবাহের শর্ত কটি ?

শরীয়তের বিধান অনুসারে বিবাহের শর্ত পাঁচটি। যথা :—

১. ইজাব ও কবুল অর্থাৎ প্রস্তাব ও সমর্থন।

২. দেন মোহর বা স্ত্রীর সাম্মানিক (প্রদেয় স্ত্রীধন)।

৩. সাক্ষীর উপস্থিতি।

৪. উকিল বা উভয়ের সম্মতিতে পাত্র পক্ষের উকিল নির্বাচন।

৫. অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ওলি বা অভিভাবক নির্বাচন।

ইজাব ও কবুল বা প্রস্তাব ও সমর্থন : প্রস্তাব ও সমর্থন হ'ল ইসলাম ধর্মে বিবাহের স্তম্ভ স্বরূপ। প্রথমে প্রস্তাব ও তারপর তা সমর্থন করতে হয়। পাত্র বা পাত্রীর যে কোন একজন সরাসরি বা উকিল ও সাক্ষীগণের মাধ্যমে প্রস্তাব দিতে পারেন। এবং উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন ও সমর্থন করলেই বিবাহ সিদ্ধ হবে। এই প্রস্তাব ও অনুমোদনের শব্দ অধিকতর নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তা বোধক হওয়া প্রয়োজন। যে কোন ভাষায় এই প্রস্তাব ও অনুমোদন বৈধ। যেমন পাত্র বা পাত্রি কেউ যদি সরাসরি বলে যে 'আমি আমাকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম অথবা বলে আমাকে বিবাহ কর এবং অপর পক্ষ যদি সাক্ষীগণের সাক্ষাতে বলে যে আমি বিবাহ সমর্থন বা গ্রহণ করলাম অথবা আমি বিবাহ করলাম' তাহলে বিবাহ সিদ্ধ হবে। তবে যদি বিবাহের প্রস্তাব মুখে উচ্চারণ না করে কেবলমাত্র লিখিত ভাবে করা হয় তা সিদ্ধ হবে না। প্রস্তাবের শুদ্ধ নিয়ম যেমন :— "আমি·······অমুক গ্রাম নিবাসী অমুকের পুত্র····টাকা দেনমোহরের বিনিময়ে আপনাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলাম। অপর পক্ষ বলবেন আমি এই বিবাহে সম্মতি দিলাম বা কবুল করলাম।" এই প্রস্তাব পাত্র পাত্রী উভয়ের তরফ থেকে হতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়সের ক্ষেত্রে ওলি বা অভিভাবক এই প্রস্তাব দিতে পারেন। সংস্কার বশঃত আমাদের দেশে মেয়েদের পূর্ণ সমর্থন গ্রহণ করা হয় না। এটি ঠিক নয়। সংস্কার মুক্ত হয়ে পরিস্কার ভাবে "আমি সমর্থন করলাম" বলা প্রয়োজন।

দেন মোহর বা মাহর : মাহর শব্দের অভিধানিক অর্থ উপহার বা স্ত্রীর সম্মানিক অর্থাৎ প্রদেয় স্ত্রীধন। শরীয়তী অর্থে মাহর এমন ধন যা স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে প্রদান ওয়াজেব বা অবশ্য পালনীয়। মাহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দেরহাম। উর্দ্ধসীমা পাত্রের সামর্থ অনুযায়ী নির্দ্ধারণ করা চলে। এই মাহর না দিয়ে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার বর্তায় না। মাহরের কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ আছে। বিয়ের সময় মাহর উল্লেখ না

করলেও সর্বনিম্ন মাহর এমনি এমনিই প্রযোজ্য হয়ে যাবে। স্বামী স্ত্রী নির্জন বাস করার পর মারা গেলে বা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে সম্পূর্ণ মাহর স্ত্রীর প্রাপ্য।

সাক্ষী ঃ ইসলামী অনুশাসনে সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ অবৈধ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে 'তোমাদের পুরুষদের থেকে দুজন সাক্ষী ডাক. যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায় তবে একজন পুরুষ ও দুজন নারী।' সাক্ষীদের স্বাধীন, বিবেকবোধ সম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক ও মুসলমান হতে হবে।

উকিল ঃ উভয়পক্ষের অভিভাবকের সম্মতি অনুসারে পাত্রপক্ষকে একজন উকিল ঠিক করতে হয়। উকিল হতে পারবেন তিনিই যাঁর সঙ্গে উক্ত পাত্রীর বিবাহ হারাম।

ওলি বা অভিভাবক ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ওলি ওভিভাবক নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ধারাবাহিকভাবে হতে পারেন—পিতা, পিতামহ। তারপর ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র। তারপর চাচা ও চাচাতো ভাই। তারপর মাতা, দাদী, কন্যা, পৌত্রী, নাতনী, নাতনীর সন্তান, নানা, সহোদরা ভগ্নী, বৈমাত্র ভগ্নী, ভাগ্নে, মামা, খালা ইত্যাদি ব্যক্তিগণ।

কোফও কি ?

কোফও আরবী শব্দ এর অর্থ হলো সমতা। শরীয়তের মতে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কয়েকটি ব্যাপারে সমতুল্যতাকে কোফও বলা হয়। সমতুল্যতা নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচার করতে হয়। যথা—

১. উভয়ের স্বাধীন হওয়া।

২. পুরুষের মাহ্‌র দেওয়ার মত ও দৈনন্দিন জীবিকার সামর্থ থাকা প্রয়োজন। তা না থাকলে সে পুরুষ দরিদ্র নারীর জন্যও কোফও হবে না।

৪. ব্যবসায় বা পারিবারিক অর্থ নৈতিক অবস্থার সমতা থাকা।

৫. সর্বোপরি উভয়ের মুসলমান হওয়া।

ইসলাম ধর্মের বিধানে বিবাহ কি ?

ইসলাম ধর্মে কোন বৈরাগ্য নেই। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাস জীবনের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তাআলার ঘোষণার মর্মার্থ হল—'তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করা

হয়েছে এইজন্য যে এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে ভালবানা ও দয়া স্থাপিত হবে।' এর দ্বারা এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে সঙ্গিনী সহ সংসার জীবন যাপনের মাধ্যমে আরাধনা উপাসনাই আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন — বিয়ে করা আমার সুন্নত (নীতি) যে তা পালন করে না সে আমার কেউ নয়। নারী পুরুষের পরস্পরের সম্মতির ও প্রস্তাব ও সমর্থন অনুমোদনের দ্বারা পরিপূর্ণ সংসার নির্বাহের মধ্য দিয়ে জীবন নির্বাহের জন্য নারী পুরুষের এই মিলন বন্ধনই হল ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ।

কি ধরনের নারী পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন ?

বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী-পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন। পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে—বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাঁদের গ্রন্থ দান করা হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারীগণ তোমাদের বিবাহের জন্য বৈধ। ইসলাম ধর্মের বিধানে কোন বিশ্বাসী অর্থাৎ মুসলমান নরনারী অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী নরনারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন না। পবিত্র কোরআনের আলোকে—অবিশ্বাসী স্বাধীনা নারী ও পুরুষ পরস্পরকে চমৎকৃত করলেও তার তুলনায় বিশ্বাসী ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী বিবাহের জন্য উত্তম। সুতরাং নারী-পুরুষ উভয়কেই মুসলমান হতে হবে। একজন মুসলমান অন্যজন অমুসলমান হলে ইসলামের বিধানে তা কখনই বিবাহ বলে গণ্য হবে না। এ ধরনের বন্ধন ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকাশ্য ব্যাভিচার ও উপপত্নী রাখার সমতুল্য। সুতরাং কেবলমাত্র মুসলমান নরনারীই পরস্পর প্রস্তাব ও অনুমোদনের দ্বারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন।

বিবাহের পূর্বে পাত্রপাত্রীর সাক্ষাত বৈধ কি ?

ইসলামের বিধানে বিবাহের পূর্বে অর্থাৎ অভিভাবকগণ বিয়ের যোগাযোগ করার পর চূড়ান্ত ভাবে বিবাহ ধার্য করার পূর্বেই পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের সাক্ষাৎকার একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) স্বয়ং বলেছেন, "পাত্র পাত্রীকে দেখবে এজন্য যে এর দ্বারা তাদের ভালবাসা স্থায়ী হবে। তিনি নিজে পাত্রকে নির্দেশ দিয়েছেন "যাও তাকে দেখে এস হয়ত তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনীয় দোওয়া

১. প্রত্যেক মুসলমানের যে কোন ভাল কাজ শুরু করার সময় পড়ার দোওয়া :

"বিসমিল্লাহ্ হির রাহ্‌মানির রাহিম"

২. মসজিদে প্রবেশ করার দোওয়া :

"আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্ লী আবওয়াবা রাহ্‌মাতেকা"

হে আল্লাহ্, আমার জন্য তোমার করুণার দ্বার উন্মুক্ত কর।

৩. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোওয়া :

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলোকা মিন ফাদলেকা"

হে আল্লাহ্, তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি।

৪. কোন কাজ সুসম্পন্ন করলে, আল্লাহ্ কৃতজ্ঞতার জন্য ও হাঁচির সময় পড়ার দোওয়া :

"আল হামদো লিল্লাহ্"

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

৫. অন্যের হাঁচির আওয়াজ শুনলে পড়ার দোওয়া

"ইয়ার হামোকাল্লাহ্"

তোমার উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

৬. কারো মৃত্যু সংবাদ শুনলে পড়ার দোওয়া :

ইন্না লিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন

অবশ্যই আমাদের সকলকেই আল্লাহ্‌র উদ্দেশে এবং আল্লাহ্‌র নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

৭. নৌকা, জাহাজ কিংবা গাড়ীতে চড়ার দোওয়া :

বিসমিল্লাহে মাজরেহা ওয়া মুরসেহা, ইন্না রাব্বি
লা গাফুরুর রাহিম

আল্লাহ্‌র নামেই-এর গতি ও অবস্থান, অবশ্যই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

৮. শত্রুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার দোওয়া :

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলোকা ফী নোহুরেহিম ওয়া
নাউযোবেকা মিন শরুরেহীম"

হে আল্লাহ্ ! আমরা তাদের শব্দ বন্ধ করছি এবং তাদের সর্বাধিক অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি।

৯. বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দোওয়া :

বিসমিল্লাহে তাওয়াক্কালতো আলাল লাহ্

আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে তাঁরই নামে যাত্রা শুরু করছি।

১০. ঘুমানর সময়-পড়ার দোওয়া :

"আল্লাহুম্মা বে এসমেকা ওয়া আমুতো ওয়া আহ্ইয়া"

১১. স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হওয়ার দোওয়া :

"আর রাহমানো আল্লামাল কোরআন, খালাকাল
ইনসানো আল্লামাহুল বায়ান"

অসীম দয়াময়, কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাকে (মানুষকে) কথা বলতে শিখিয়েছেন।

১২. চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধি হওয়ার দোওয়া :

"ফা কাসাফ্না আনকা গেতাআকা ফা বাসারুকাল
ইয়াওমা হাদীদ"

আমি (আল্লাহ) তোমার চোখের আবরণ খুলে দিয়েছি অতএব তোমার দৃষ্টি শক্তি এখন প্রখর হয়েছে।

১৩. জ্ঞান বৃদ্ধির দোওয়া :

"রাব্বে যেদনী এলমা"

হে আমার প্রতিপালক আমার জ্ঞান বৃদ্ধিকর।

১৪. আয় বৃদ্ধির দোওয়া :

"আসতাগ ফেরুল্লাহা ইন্নাহু কানা গাফ্ফারা"

আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তিনি অত্যন্ত ক্ষমা প্রদানকারী।

আয়াতুল কুরসী

আয়াতুল কুরসীর ফজিলত কি ?

আয়াতুল কুরসী হল পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারার ২৫৫ আয়াত। এই আয়াতে আল্লাহ্‌র আকার অর্থাৎ বিশালতার বর্ণনা আছে। এই আয়াতকে আয়াতুল্ কুরসী বলে। এই আয়াত পাঠে আল্লাহ্ তাআলার বিরাজ, মানতা, অবস্থান ও সর্বত্র তার উপস্থিতি ও অস্তিত্ব স্মরণ করা হয়। এজন্য এই আয়াত পাঠের দ্বারা অসীম ফজিলত হাসেল হয়।

আয়তাল কুরসা কি ও তার অর্থ কি ?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা হির রাহমা নির রাহিম

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

আল্লাহো লা-ইলাহা ইল্লা হোয়াল হাইউল কাইয়ুম ; লা তা'খুযুহো সেনাতুওঁ ওয়ালা নাউম ; লাহু মা ফিস সামাওয়াতে ওয়ামা ফিল আরদে, মানযাললাযী ইয়াশফাও ইনদাহু ইল্লা বেইজনেহী ইয়ালামো মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহিতুনা বেশাইয়িম মিন ইলমেহী ইল্লা বেমাশা-য়া, ওয়াসিয়া কুরসিইয়াহুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদা ওয়ালা ইয়উদোহু হেফযোহোমা ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযীম।

বাংলা : আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহা নেই। তিনি

চিরঞ্জীব অনাদি, স্বাধিষ্ঠ, বিশ্বধাতা। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করেনা। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু সমস্তই তাঁর। কে সে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে ? তাদের (মানবজাতি) সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারেন। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত ; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

মোনাজাত বা প্রার্থনা

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

উচ্চারণ - রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাতাওঁ ওয়াকেনা আজাবান নার। ওয়া সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাখায়রে খালকেহী মোহাম্মাদিওঁ ওয়া আলেহী ওয়া আস্হাবিহী আজমায়িনা বেরাহ্মাতেকা ইয়া আর্হামার রাহেমীন।

মোনাজাত (২)

রাব্বানা জ্বালামনা আনফুসানা অ-ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া-তারহামনা লানাকু-নাম্না মিনাল খাসেরীন।

(৩)

রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলীম

হে আমাদের প্রভু! আমাদের তরফ থেকে কবুল (গ্রহণ) কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।

—০—